কবি-প্রণাম

হে কবি, প্রণাম,
তোমারে বরণ করি
স্মরণের দীপ জ্বালিলাম।
আমরা দিলাম আনি
আমাদের প্রাণের প্রণাম॥

সম্পাদক

নলিনীকুমার ভদ্র
অমিয়াংশু এন্দ
মৃণালকান্তি দাশ
সুধীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ

বাণীচক্র-ভবন, শ্রীহট্ট।

সাধারণ সংস্করণ :

দেড় টাকা

বিশেষ সংস্করণ :

দুই টাকা

রাজ সংস্করণ :

তিন টাকা

প্রথম সংস্করণ :

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮ বাংলা

ডিসেম্বর, ১৯৪১ ইং

জামতলা, 'বাণীচক্র-ভবন' হইতে শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং মীরাবাজার, সুরমা প্রেস হইতে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ শর্ম্মা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

অবতরণিকা

গত বৈশাখ মাসের শেষভাগে শ্রীহট্ট শহরে 'বাণীচক্রে'র উদ্যোগে কবি রবীন্দ্রনাথের একাশীতিতম জন্ম-উৎসব সম্পন্ন হবার অব্যবহিত পরেই 'বাণীচক্রে'র জন্যে কবিগুরুর আশীর্বাণী প্রার্থনা ক'রে আমি একখানা পত্র লিখি। সে-পত্রের উত্তরে শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চন্দ মহাশয় আমাকে জানালেন যে, অসুস্থতা-নিবন্ধন কবিগুরুর কলম ধরাই বারণ, তবে তিনি সুস্থ হ'লে আমাদের আশা পূর্ণ হবে।

চন্দ মহাশয়ের চিঠি পাবার পর থেকেই ভাবছিলাম, কবি সেরে উঠলেই শান্তিনিকেতনে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে আসবো।

শ্রাবণ মাসে শ্রীহট্টের পল্লী-অঞ্চলে ভ্রাম্যমান অবস্থায় যখন দিন যাপন করছি তখন অকস্মাৎ একদিন কানে এসে পৌঁছলো রবীন্দ্রনাথের লোকান্তর গমনের নিদারুণ দুঃসংবাদ। এ আঘাত যেমনি অপ্রত্যাশিত তেমনি মর্মান্তিক।

অবিলম্বে শ্রীহট্টে ফিরে এসে শোকসভার আয়োজন করলাম। মাত্র মাসকয়েক আগে আমরা যখন শহরের অন্যান্য রবীন্দ্রভক্তদের সঙ্গে একযোগে তাঁর জন্ম-উৎসব উদ্‌যাপন করি, তখন একান্ত মনে এই কামনাই তো করেছিলাম, যে, শতায়ু হোন্ কবি, তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার অজস্র অবদানে আমাদের সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ভাণ্ডার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধতর হোক্। সেদিন কি ভাবতে পেরেছিলাম যে, এত শীঘ্র শোক-সভায় সমবেত হয়ে এমনিধারা অশ্রু-জলে কবিগুরুর স্মৃতি-তর্পণ করতে হবে!

কিছুদিন পরে বন্ধু শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি দাশ কবিগুরুর বরণীয় স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবার উদ্দেশ্যে 'বাণীচক্র' থেকে বাংলা এবং শ্রীহট্টের খ্যাতিমান লেখকদের রচনা-সম্ভারে পূর্ণ একখানা পুস্তক প্রকাশের সঙ্কল্পের কথা ব্যক্ত করেন। 'কবি-প্রণাম' নামটিও তাঁরই নির্বাচিত।

'কবি-প্রণামের' কাজের সূচনাতে বন্ধুবর মন্মথকুমার চৌধুরীর সহযোগিতা আমাদের উৎসাহিত করে। এই বন্ধুকৃত্য কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একখানা পত্রও আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করে। আমাদের কাজ কিছুদূর অগ্রসর হবার পর আমি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি তথ্যমূলক প্রবন্ধ কোনো-একটি পত্রিকা থেকে সঙ্কলন ক'রে শান্তিনিকেতনের ঠিকানায় তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিই। এবং 'কবি-প্রণাম' প্রকাশের সঙ্কল্পের কথাও জানাই। তিনি আমাদের প্রয়াসের সাফল্য কামনা ক'রে এবং আমার প্রেরিত প্রবন্ধটি যে রবীন্দ্রনাথের ভাবী

...কারদের প্রয়োজনে লাগবে সে কথা জানিয়ে, অগৌণে চিঠির জবাব দেন। তাঁর ...র পর থেকেই আমরা রবীন্দ্রনাথের শ্রীহট্ট প্রভৃতি আসামের বিভিন্ন শহর পরিদর্শনের ... বিবরণ সংগ্রহে চেষ্টাবান্ হই এবং 'কবি প্রণামে' রচনা পাঠাবার জন্যে ... খ্যাতনামা লেখকদের নিকট চিঠি লেখা সুরু করি। মফঃস্বলে থেকে পরিবেশন-যোগ্য ...-সংগ্রহ যে কিরূপ আয়াস-সাধ্য তা ব'লে শেষ করা যায় না,— বিশেষতঃ যখন দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙালীরই অধ্যুষিত শ্রীভূমি সুদীর্ঘকাল ধ'রে "বাঙলার রাষ্ট্রসীমা হোতে নির্বাসিতা—"

সুখের বিষয়, আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে বাংলা ও শ্রীহট্টের বিশিষ্ট লেখকগণ 'কবি-প্রণাম'কে রচনা-সম্পদে সমৃদ্ধ করেছেন,—সেজন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। সকলের সহযোগিতায় কবিগুরুকে সুদূর মফস্বল থেকে আমরা শুধু শ্রীহট্টেরই নয়, সমগ্র বাংলা দেশের মিলিত প্রণাম জানাতে সক্ষম হয়েছি।

রচনা-সংগ্রহ ব্যাপারে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন ও বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা-সংসদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত শক্তিরঞ্জন বসু মহাশয়ের কথা। 'বাণীচক্র' এজন্যে তাঁদের কাছে ঋণী।

প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়ে শিল্পী-শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় আমাদের অনুগৃহীত করেছেন। এ ঋণ অপরিশোধ্য।

শ্রীহট্টের 'জনশক্তি' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকটও আমরা ঋণী। 'বাণীচক্র' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকেই তিনি নানাভাবে আমাদের সাহায্য করে আসছেন।

সর্বশেষে, আমাদের পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় (আসাম শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর) মহাশয়ের আনুকূল্যের কথা কৃতজ্ঞ অন্তরে স্বীকার করছি। একথা অনস্বীকার্য যে, তাঁর সাহায্য ছাড়া 'কবি-প্রণাম'কে বর্তমান আকারে প্রকাশ করা সম্ভবপর হোতো না।

কবি-প্রণামে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ ছাড়া 'মানুষ' রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও কিছু-কিছু তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে। রবীন্দ্র সাহিত্যের সমালোচনা চলবে যুগযুগান্ত ধ'রে। কিন্তু, 'মানুষ' রবীন্দ্রনাথের জীবনের তথ্যসমূহ এবং তাঁর অপ্রকাশিত পত্রাবলী আশু সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। কবি অবশ্য বলেছেন যে, তাঁকে তাঁর জীবনচরিতে পাওয়া যাবে না। কিন্তু, এতবড় একটা মহিমা-মণ্ডিত, কর্মময়, বিচিত্র জীবনের কোনো ঘটনাই যাতে চিরবিস্মৃতির অন্ধকারে বিলীন না হয় সে-বিষয়ে এখন থেকেই অবহিত হওয়া আবশ্যক। সে জন্যেই আমাদের জানা-মতে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে ছিলেন তাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে আমরা কবিগুরু সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্মৃতিমূলক কাহিনী লিখবার জন্যে অনুরোধ করেছিলাম। কেউ কেউ আমাদের অনুরোধ রক্ষা করেছেন। রবীন্দ্রজীবনের নিতান্ত সামান্য, তুচ্ছতম কাহিনীটি জানবার জন্যেও যে সাধারণ মানুষের আগ্রহের আর অন্ত নেই।

'কবি-প্রণামের' পরিশিষ্টে শ্রীহট্টের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের কতকটা ... পাওয়া যাবে। শ্রীহট্টের অনেকেই তাঁর স্নেহভাজন হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন. ... বছর আগে কবি একদা আমাদের শ্রীহট্ট শহরে এসে তিনটি দিন অবস্থান করেন। ঐ ... নরনারী তখন অনুপ্রাণিত হয়েছিল তাঁর উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতায়, মুগ্ধ হয়েছিল ... তাঁর মধুক্ষরা কণ্ঠের সুললিত সঙ্গীতে। কবির জীবনী থেকে এ তিনটি দিনের কাহিনী নিঃশেষে মুছে গেলেও তাঁর গৌরবোজ্জ্বল মহিমা কিছুমাত্র ম্লান হবে না। কিন্তু এ কাহিনী বাদ দিয়ে যদি কোনোদিন শ্রীহট্টের ইতিহাস লেখা হয় তা হ'লে তা হবে অসম্পূর্ণ। অনাগত যুগে আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা এ-কাহিনী প'ড়ে গর্ব অনুভব করবে,—যদিও ঈর্ষা করবে তারা আমাদের অপরিসীম সৌভাগ্যকে।

শ্রীহট্টের রবীন্দ্রভক্তদের অনুরাগকেই রূপায়িত করবার চেষ্টা করা হয়েছে 'কবি-প্রণামে'। সুধীজন এতে সেই ঐকান্তিক অনুরাগ এবং অকৃত্রিম শ্রদ্ধার কিছুমাত্র পরিচয়ও যদি পান তা হ'লেই আমরা আমাদের সকল পরিশ্রম সার্থক হয়েছে ব'লে মনে করব।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র
সম্পাদক, 'বাণীচক্র'

বাণীচক্র ভবন, জামতলা
শ্রীহট্ট।
১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

মমতাবিহীন কালস্রোতে
বাঙলার রাষ্ট্রসীমা হোতে
নির্বাসিতা তুমি
সুন্দরী শ্রীভূমি।
ভারতী আপন পুণ্যহাতে
বাঙালীর হৃদয়ের সাথে
বাণীমাল্য দিয়া
বাঁধে তব হিয়া।
সে বাঁধনে চিরদিন তরে তব কাছে
বাঙলার আশীর্বাদ গাঁথা হয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছড়া

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

শ্রীহট্টের "বাণীচক্রে"র "কবি-প্রণাম" নামক পত্রিকা অথবা পুস্তিকার অঙ্গপুষ্ট করবার জন্য আপনারা আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন। এর পূর্ব্বে সে অনুরোধ রক্ষা করতে পারিনি। নতুন লেখা লেখবার মত আমার এখন শক্তি নেই। দেহের শক্তি কালক্রমে ক্ষয় হয়, আর সেই সঙ্গে মনের শক্তিও।

আমি বহুকাল ধরে অনেক লিখেছি এবং এখনও মাঝে মাঝে লিখছি। কলমধারীদের ছুটিও নেই—পেনসানও নেই। তাদের আমরণ সাহিত্যের ঘানি ঘোরাতে হবে। যেমন রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্য্যন্ত ঘুরিয়েছেন। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়েরা ভুলে যান যে, আমরা লেখক হলেও রবীন্দ্রনাথ নই। তাঁর তুলনায় আমরা ক্ষুদ্র লেখক।

তাই ভেবে পাচ্ছিলাম না যে, কায়-ক্লেশে রবীন্দ্রনাথের বিষয় কি লিখব।

কাল দুপুরবেলায় তাঁর গতবৎসর লিখিত এবং সদ্যপ্রকাশিত "ছড়া" আমার হাতে এল। তাই এই 'ছড়া" সম্বন্ধে দু'কথা লিখতে বসেছি।

ছড়া বস্তু কি? রবীন্দ্রনাথ তা' নিজেই বলে দিয়েছেন। তাঁর কথা এই :

"অতএব এই কি পাগলামি
কলম উঠল ক্ষেপে,
মিথ্যে বকা দৌড় দিয়েছে
মিলের স্কন্ধে চেপে।"

এখন যদি কেউ বলেন যে, এ ছড়াগুলো আসলে এক মিছে বকুনি ও সুধু কলমের পাগলামি তার প্রতিবাদ করব না। রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তিই তাঁদের কথায় সায় দিচ্ছে। এস্থলে জিজ্ঞাসা করছি যে, আমরা অদ্যাবধি যে সব গুরুগম্ভীর কথা বলেছি, সে সবই যে মিছে বকুনি তা প্রমাণ করে দিয়েছে বর্ত্তমান যুদ্ধ। সত্য শুনতে পাই দর্শন ও বিজ্ঞানের দখলে।

এ যুগে জার্মাণদের তুল্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অন্যদেশে খুঁজে পাওয়া ভার। আর সেই জার্মাণীই আজ তাদের কথা যে সব মিছে কথা—তা হাতে কলমে প্রমাণ করেছে। ছড়ার বক্তব্য সব খাপছাড়া। এক ছত্রের সঙ্গে আরেক ছত্রের কোন মিল নেই—সুধু মিল ছাড়া।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, মিছে বকা চলেছে মিলের স্কন্ধে চেপে। আমি মিলের অর্থাৎ Rhyme এর মর্য্যাদা বুঝি। যখন আমি সনেট পঞ্চাশৎ লিখি তখন আমি আবিষ্কার করি যে, বাঙলা ভাষায় মিল কম। রবীন্দ্রনাথের ছড়া পড়ে মনে হল যে, বাঙলায় অজস্র মিল আছে—যদি তা ব্যবহার করবার কৌশল আমাদের জানা থাকে। যদি কেউ বলেন যে "ছড়া" ছেলেখেলা মাত্র—আমি বলব তথাস্তু। কিন্তু এ খেলাতে তিনি অদ্ভুত খেলোয়াড়। এসব মিলের আমি কোনও নমুনা দেবনা—কেন না—ছড়া" এই জাতীয় মিলে ভরপুর। এর কোনও মিলই মামুলি নয় এবং হবেও না। প্রতি মিলটির সাক্ষাৎ পেয়ে চমকে উঠতে হয়। মিলের নাম অন্ত্য অনুপ্রাস, এ অনুপ্রাস ছাড়া ছড়া"র ভিতরে মধ্যে অনুপ্রাস দেদার আছে।

ছড়ার জগৎ অনুপ্রাসের জগৎ। পড়ে দেখবেন এ পাগলামি সুধু কথার পাগলামি নয়। ছড়ার অন্তরে একটি ফিলজফিও আছে। তা যে আছে সে কথা তিনি, প্রথমেই বলেছেন।

"চলছে খেলা একের সঙ্গে
আর একটাকে বাঁধার॥
বাঁধনটাকেই অর্থ বলি
বাঁধন ছিঁড়লে তারা
কেবল পাগল বস্তুর দল,
শূন্যেতে দিক্‌হারা।"

এখন তারা হয়ঃ—

"এলোমেলো ছিন্ন চেতন
টুকরো কথার ঝাঁক।"

এই এলোমেলো ছিন্ন চেতনের টুকরো কথার ঝাঁকই ছড়ার কাব্য।

"বোকা মনের এই যে সৃষ্টি
আপন অনিয়মে"

ছড়া হচ্ছে তাই। ছড়া কোনও Law and Order মানে না।

রবীন্দ্র-স্মৃতি

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ এই পৃথিবীর নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করে অমরধামে চলে গেছেন। তাঁর জীবন সম্বন্ধে যেটুকু প্রত্যক্ষ দেখেছি, জেনেছি তারি দু'চারটি ঘটনা, দু'চারটি অবস্থা তাঁর জীবনের পরিচয়রূপে বর্ণনা করব।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে জীবনদেবতার কথা বলেছেন, তিনি জীবনদেবতার উপাসনা করেছেন। জীবনদেবতা শুধু রবীন্দ্রনাথের নন, তিনি সকল মানুষের। রবীন্দ্রনাথের অনুরক্ত যাঁরা তাঁরা স্বীকার করবেন যে জীবনদেবতা আমাদের প্রত্যেকের প্রাণে প্রাণে শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে জীবনের স্তরে স্তরে রয়েছেন, আমাদের সব কাজে, সব চিন্তায় জীবনদেবতাকে অন্তরের মধ্যে গড়ে তুলেছি। পরিশেষে জীবনদেবতার সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগে মিলিত হয়েছি। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা আমাদের সকলের অন্তরে থেকে আমাদের সুপ্ত আত্মাকে জাগিয়ে তুলছেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় আমাদের কাব্য, উপন্যাস, গল্প, নাটক প্রবন্ধের ভিতর দিয়ে। তাঁর সঙ্গে যে মিলন সে হল অন্তরের যোগ, নিবিড় আত্মীয়তার যোগ। আমাদের প্রাণের দেবতা যিনি আমাদের গড়ে তুলেছেন সেই দেবতাকে মর্ম্মের মধ্যে অনুভব করতে পারি। কিন্তু, যতটা অনুভব করেছি ততটা কি প্রকাশ করতে পেরেছি? ভাষাতে কি তার মূর্ত্তি দিতে পেরেছি? জীবনদেবতা অস্পষ্ট আলোকের মতন, ছায়ার মতন আমাদের কাছে প্রকাশিত হচ্ছেন;—কবি সেই রূপটি জ্বলন্ত করে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর নানা কাব্যে। এই জীবনদেবতাকে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন—

> "আমার এই দেহখানি তুলে ধর,
> তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ কর।"

রবীন্দ্রনাথের জীবন তো বিনা সাধনায় ফলে ফুলে বিকশিত হয়ে ওঠেনি। আধ্যাত্মিক জীবনের সংগ্রামের ভিতর দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছিল। তাঁর কবিতায় সেই সাধন-লব্ধ অনুভূতির প্রকাশ। তাই তাঁর মধ্যে নিজেদের জীবনদেবতার পরিচয় পাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের অন্তরের অর্গল খুলে দিয়েছেন; আমাদের অন্তর-দেবতাকে প্রকাশিত করবার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

আমার জীবনে রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে যাবার প্রথম সৌভাগ্য এসেছিল, সে আমার জীবনের বিশেষ শুভ মুহূর্ত। জীবনদেবতার বিশেষ আশীর্ব্বাদ লাভ করেছিলাম বলেই রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি বসে আলাপ করেছি। এও সেই রহস্যময় জীবনদেবতারই লীলাখেলা।

যেদিন রবীন্দ্রনাথ দেহত্যাগ করলেন, আমি সেদিন বড়পেটাতে এক সভায় শিক্ষা এবং সংস্কৃতিবিষয়ক বক্তৃতা করছি। সভা শেষ হলে একজন বললেন—"বিশ্বকবি আর মর জগতে নেই।" বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হল না। হয়ত ভুল। কিন্তু, পরদিন দেখলাম কাগজে বেরিয়ে গেছে সে বুকফাটা নিদারুণ দুঃসংবাদ। ভূমিকম্পে অট্টালিকা যেমন বিপর্য্যস্ত হয়ে যায়, তেমনি করে এ দুর্ঘটনা বিশ্বজগতকে আন্দোলিত করেছে। মানুষের চিন্তা, অনুভূতি সব যেন ওলট্‌পালট্‌ হয়ে গেছে। সমগ্র পৃথিবীতে শোকের উচ্ছ্বাস। কিন্তু এইখানেই কি শেষ? দীপ যেমন নিভে যায় উচ্ছ্বাস কি তেমনি করে থেমে যাবে? সেই মামুলি শোকসভা—তার পর সব চুপ্‌চাপ্‌,— এমন ধারা হলেত চলবে না। রবীন্দ্রনাথকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে মনের মধ্যে তরুণ, সবুজ করে; রবিচক্র গঠন করতে হবে। প্রত্যেক সপ্তাহে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে হবে।

ছাত্রজীবনে রবীন্দ্রনাথের কথা শুনেছি শ্রদ্ধাভাজন শিবনাথ শাস্ত্রী ম'শায়ের কাছে। শিবনাথ ছিলেন ধর্ম্মগুরু। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার মানসিক যোগস্থাপনের, মূলে তিনিই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন এই সংসার থেকে বিদায় নিলেন তখন মহর্ষি সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনেছি। রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবসেন সম্বন্ধে তিনি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতেন। আমার নোটবুকে, যা বক্তৃতা শুনতাম, লিখে রাখতাম। এই বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথের কথা আছে,—তা' অতি প্রয়োজনীয়। রবীন্দ্রনাথ ঋষিকবি হয়েছেন, কিন্তু তার পেছনে যে অনেক সাধনা রয়ে গেছে। মহর্ষি কি করে রবীন্দ্রনাথকে শিক্ষা দিয়েছেন, শাস্ত্রীম'শায়ের কাছে তাই শুনেছি। শিবনাথ রবীন্দ্রনাথকে ছোটবেলায় খেলা করতে দেখেছেন। হয়তো কোনদিন বাড়ীতে উৎসব,—বিপুল সমরোহ। মহর্ষি বলতেন,—"রবি, তোমার কাজ হচ্ছে সবাইকে গলায় মালা দিয়ে অভ্যর্থনা করা।" বালক রবি পিতার আদেশে অতিথিদের যথাস্থানে নিয়ে বসাতেন, গলায় মালা দিয়ে অভ্যর্থনা করতেন। কিশোর কবি গান লিখলেন—

"নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে;
হৃদয় তোমারে পায়না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।"

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র আঠারো বৎসর। এই তরুণ বয়সে ভগবানের সম্বন্ধে কী উচ্চ ধারণা। মহর্ষি গানে এত উল্লসিত হলেন যে, পাঁচশো টাকার চেক লিখে দিলেন।—"রবি, তুমি এমন সুন্দর লিখতে পারো, এই তোমার পুরস্কার।" মহর্ষি তখনই বুঝতে পেরেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের জীবন একদিন ফুলেফলে বিকশিত হয়ে উঠবে। শাস্ত্রীমশায়ের নিকট শুনেছি কেমন করে শাসন এবং প্রেমের ভিতর দিয়ে মহর্ষি ছেলেদের জীবন গড়ে তুলেছেন। শ্রীহট্ট জেলার পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব ছিলেন মহর্ষির সভাপণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে উপনিষদ্ সম্বন্ধে আলোচনা করতেন, তাঁকে পড়তে হত :—

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি উপনিষদের বাণী রবীন্দ্রনাথ পড়ে শোনাতেন পিতৃদেবকে। রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ বিনা সাধনায় হয়নি। যদি তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনা না থাকতো তা হ'লে তাঁকে ঋষি বলতাম না।

ঠিক সন তারিখটা বলতে পারবো না। তবে একথা বেশ মনে আছে যে, মহর্ষির শ্রাদ্ধবাসরে প্রথম রবীন্দ্রনাথকে দর্শন করি। সেখানে প্রথম রবীন্দ্রনাথকে এবং তাঁর ভাইদের দেখলাম;—কেউ আচার্য্যের কাজ করছেন, কেউ প্রবন্ধ পাঠ করছেন। সেই প্রথম ঠাকুরবাড়ী দেখা। যেখানে অতিথি অভ্যাগতদের সমাদর হত সেই স্থান, প্রশস্ত হল, বসবার আসন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তম্ভ, সুন্দর-করে-সাজানো ধূপগন্ধে আমোদিত কক্ষটির স্তব্ধ-গাম্ভীর্য্য, ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত, মহর্ষির জীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠ, সব কিছু আজও যেন এক সুখস্মৃতির মত মনে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথের মুখে সেদিন যে স্বর্গের জ্যোতি, গৌরবমণ্ডিত মহিমা দেখেছিলাম তা যেন আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে।

এখানে একটু ভুল হয়ে গেছে। নিকটের থেকে নয়, কিছু দূরের থেকে এর আগেও 'মিটিং' এ রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি। তখন রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার খবর বেরুলে ছাত্রদের বিপুল ভিড় হত। মনে পড়ছে যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা রাজা রামমোহনের স্মৃতি-সভায় তাঁকে প্রবন্ধ পাঠ করতে শুনেছি। তখন বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের জের চলছে; দেশে দারুণ উত্তেজনা। রাজপথ দিয়ে চলত বিরাট শোভাযাত্রা—স্বদেশী 'প্রসেশন'।

রবীন্দ্রনাথ তখন পাঠ করেছিলেন "স্বদেশী-সমাজ" নামক প্রবন্ধ। "স্বদেশী সমাজ" তরুণদের প্রাণে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। চারদিকে হৈ চৈ, এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বললেন,— "কাজ কর, পল্লী সংগঠন কর।" জাতীয় উন্নতির জন্য 'পজিটিভ্' 'কনষ্ট্রাকটিভ্' 'সাজেস্‌টিভ্' উপায় সব বাৎলে দিলেন। স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথের "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে—" "বাংলার মাটি, বাংলার জল"—ইত্যাদি গান প্রাণ স্পর্শ করত।

আরেকবার ষ্টার রঙ্গমঞ্চে সাহিত্যালোচনা সভা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাতে উপস্থিত ছিলেন। সভার পর দর্শকমণ্ডলীর মাঝখান থেকে রব উঠল, "আমরা রবিবাবুর গান শুনতে চাই।" তিনি কিন্তু কিছুতেই গাইবেন না, আমরাও যাচ্ছি না। কেউ সভা ছাড়বে না। তখন ফাঁপরে পড়ে গাইতে হল—"আমায় আর গাহিতে,—বোলোনা—"

রবীন্দ্র-সাহিত্য অধ্যয়ন করবার প্রেরণা পাই আমাদের শ্রীহট্ট-গৌরব পরলোকগত রমাকান্ত রায়ের ছোট ভাই শ্রীকান্তর নিকট থেকে। শ্রীকান্ত ছিলেন খাঁটী সাহিত্য-রসিক, বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্রদের সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর বন্ধুত্ব। তখন রবীন্দ্রনাথের বই বেরুচ্ছে,—'ক্ষণিকা,' কণিকা 'নৈবেদ্য' 'কথা' 'কাহিনী'। শ্রীকান্ত সেগুলি আনিয়ে দিতেন। আমি আকুল-আগ্রহে যতটা পারি অধ্যয়ন করতাম। শ্রীকান্তর ঠাকুর বাড়ীতে অবাধগতি ছিল। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী সম্পাদন করেছিলেন। উনিশশো ছয় থেকে উনিশশো দশের মধ্যে বহুসূত্রে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ হয়েছিল। তখন 'সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি, ধ্রুব-জ্যোতি তুমি অন্ধকারে" এই গানটি খুব বেশী গাওয়া হত। এবং 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ"—এই সকল গান আমাদের প্রাণে নবজীবনের স্পন্দন এনে দিত। আমার বিলেতে অবস্থানকালে ১৯১১ ইংরাজীতে, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে পরিচয় এবং কথাবার্ত্তা হয়। এতদিন ছিল শুধু আত্মিক মিলন এবার হল তাঁর সান্নিধ্য লাভ। রবীন্দ্রনাথ তখন গীতাঞ্জলি অনুবাদ করেছেন, চারিদিকে ধন্য ধন্য। আমেরিকা থেকে ঘুরে আবার এসেছেন লণ্ডনে। লণ্ডনের ভারতীয় ছাত্রেরা করলেন রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনার আয়োজন;— আমাকে করলেন সারথি। আমি ছিলাম একটু কুণো, নিজের লেখাপড়া নিয়ে ব্যাপৃত। রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' নামক ধর্ম্মগ্রন্থগুলো ছিল প্রতিদিনের খোরাক। বের হলেই পড়ে শেষ করে ফেলতাম। আমি ও আমার ধর্ম্মবন্ধু হিরণকুমার গুপ্ত

প্রতিদিন সকালে উপাসনার পর শান্তিনিকেতনের একএকটি উপদেশ পাঠ করতাম। 'বিশ্ববোধ' 'আত্মবোধ' ইত্যাদি শান্তিনিকেতনের কতকগুলো মূল্যবান প্রবন্ধ অনুবাদ করলাম। অবশ্য এগুলো আমার রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রথম অনুবাদ নয়। আমার সর্বপ্রথম অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের "সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন ফুল হার"—এই গানটি। সেটি রবীন্দ্রনাথকে দেখালে, তিনি উৎসাহিত করেন। একথা বলা দরকার যে, আমার পরম বন্ধু পরলোকগত কালীমোহন ঘোষ রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুবাদ করতে আমায় প্রথম প্ররোচিত করেন। তিনি তখন ছিলেন বিলেতে। বিলেতে যাবার পথে পরলোকগত অজিতকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। কলম্বোতে আমরা এক জাহাজে উঠলাম। অজিতবাবুর প্রতিভা ছিল অসাধারণ, তাঁর লেখা মহর্ষির জীবনচরিত অতুলনীয় গ্রন্থ। তাঁকে আমার সহযাত্রীরূপে পেয়েছিলাম এটাকে সৌভাগ্য মনে করি। অজিতবাবু প্রায় সারাটা রাস্তা 'সি সিকনেসে' ভুগেছিলেন, আমাকে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতে হত। জাহাজে আমরা রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করতাম।

এপ্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। ডক্টর পি, কে রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর জীবনী লেখার ভার আমার ওপর পড়ে। তাঁর চিঠিপত্রের খোঁজ করতে গিয়ে চিঠির তাড়ার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের একখানা গুরুত্বপূর্ণ পত্র পাই। ডাঃ পি, কে রায়কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন অজিতকুমারকে যাতে 'থিয়োলজি' পড়বার জন্যে বৃত্তি দেওয়া হয় সেই অনুরোধ করে। চিঠিখানাতে অজিত চক্রবর্তী সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আছে।

কালীমোহন ঘোষ বিলেতে আমাদের পাড়াতেই থাকতেন। তাঁর প্ররোচনাতেই আরম্ভ করি 'শান্তিনিকেতনে'র অনুবাদ। কালীমোহন প্রায়ই বলতেন—"রবীন্দ্রনাথের লেখা অনুবাদ করুন।" তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রদ্ধেয় রথীন্দ্রনাথ এবং শ্রীমতী প্রতিমা দেবীও বিলেতে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ডেকে পাঠাতেন, মাঝে মাঝে যেতাম তাঁর কাছে। রথীন্দ্রনাথও আমায় বলেছিলেন অনুবাদের কথা। আরো কিছু লেখা তাঁদের কথামত অনুবাদ করলাম। তাঁরা নিয়ে গেলেন সেগুলো রবীন্দ্রনাথেরকাছে। তারপর লেখাগুলো গিয়ে পৌছলো রদেনষ্টাইনের হাতে। রদেনষ্টাইনের সঙ্গে কালীমোহন ঘোষের ছিল পরিচয়। সপ্তাহে দুদিন কি তিনদিন কালীমোহন রদেনষ্টাইনের বাড়ীতে যেতন। তাঁর পরিচিত একজন আর্টিষ্টের ছিল একজন 'ইণ্ডিয়ান মডেলে'র দরকার। রদেনষ্টাইন ঠিক করে দিয়েছিলেন কালীমোহনকে। তিনি যোগী সেজে বসে থাকতেন, আর

আর্টিষ্ট ছবি আঁকতেন। কালীমোহনের চেষ্টায় রদেনষ্টাইনকে যখন লেখা দেখানো হল, তিনি প্রশংসা করলেন। আমরা আরম্ভ করলাম অনুবাদ। রবীন্দ্রনাথ নিজেও লিখতে আরম্ভ করলেন। Quest পত্রিকার সম্পাদক Rev. G. R. S. Mead 'কুয়েষ্ট সোসাইটির' অধীনে একটি ধারাবাহিক বক্তৃতামালার আয়োজন করেন। রবীন্দ্রনাথের সাধনা বা Realisation of life নামক বইখানা সেই বক্তৃতাগুলিরই সংগ্রহরূপে প্রকাশিত হল। এই বইএর ভূমিকায় আমার আর অজিত চক্রবর্ত্তীর নামের উল্লেখ আছে, মনে আছে রবীন্দ্র সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে ক্রাইটারিয়ান রেস্তোরাঁয় তিনশো কি চারশো লোককে আমন্ত্রণ করেছি; হোটেলের ভাড়া দেবার জন্যে চাঁদাও তুলেছি। মিসেস্ সরোজিনী নাইডু ছিলেন বিলেতে। তিনি রবীন্দ্রনাথকে মাল্যদান করেন এবং সুন্দর কবিত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন। সেই সম্বর্দ্ধনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"আমি কবি, সেইজন্যে সৃষ্টি করে যে আনন্দ পাচ্ছি তাই আমার ভগবানের দেওয়া পুরস্কার। কিন্তু আপনারা আমার সম্বর্দ্ধনা করে যে সম্মান দিলেন সেইটে হচ্ছে আমার উপরি-পাওনা। যেমন হোটেলে যে 'ষ্টুয়ার্ড' বা 'ওয়েইটার' চাকরী করে মাইনে পায়, অভ্যাগতদের পরিচর্য্যা করে বলে সে তাদের কাছে বখ্‌শিসও পায়। আপনারাও আমাকে তেমনি বখ্‌শিস দিচ্ছেন এবং বখ্‌শিস পেয়ে আমি আপনাদের সেলাম করে যাচ্ছি। এ হচ্ছে ঠিক 'ওয়েইটারে'র উপরি আয়েরই মতন।"

বিলেতে রবীন্দ্রনাথের ওখানে গিয়ে দার্শনিক বা 'থিয়োলজিক্যাল' বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম। এমনি করে তাঁকে ভালো করে নিকটে পেলাম। প্রধানতঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির পার্থক্য এবং ভারতের চিন্তা ও জীবনধারার বৈশিষ্ট্য নিয়েই তাঁর সঙ্গে আলোচনা হত।

বিলেত থেকে এসে প্রথম সিটি কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হলাম। তখন আমার প্রতিবেশী ছিলেন সতীশ বাগচি। এর আগে শান্তিনিকেতনে যাইনি। স্থির করলাম, আমরা দু'জনেই একসঙ্গে বোলপুর যাব। রবীন্দ্রনাথের কাছে চিঠি লিখলাম—"শান্তিনিকেতন দেখতে চাই।" আনন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সাদর আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করলেন। "ষ্টেশন থেকে নেবার জন্য লোক পাঠাবো" লিখলেন। বোলপুর ষ্টেশনে পৌঁছে দেখি, টম্‌টম্ গাড়ী নিয়ে মিঃ পিয়ার্সন নিজে ষ্টেশনে এসেছেন। শান্তিনিকেতনে গিয়ে রাজ-সমাদর লাভ করলাম।

শান্তিনিকেতনে মাঝেমাঝে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ আলোচনা হ'ত। লক্ষ্য করেছি, রবীন্দ্রনাথ 'নাটস্', 'ফ্রুটস্' এ-সমস্তই সাধারণতঃ খেতেন, ভাত-তরকারী কম খেতেন। মাঝে মাঝে একএকবার আশ্রমটা ঘুরে আসতেন, ছেলেদের

সঙ্গে কথা বলতেন; সময় সময় রঙ্গরসিকতাও করতেন। সেই সময় ফাল্গুনীর রিহার্স্যাল চলছিল পূরোদমে। ছেলেদের গাইতে শোনা যেত—

"ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া,
দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে।"

শান্তিনিকেতনে শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ম'শায়ের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। তাঁর কাছে গেলে কান্টের, বেদান্তের আলোচনা হ'ত। তাঁর হাসি ছিল অপূর্ব্ব-সুন্দর, শিশুর মত সরল। তাঁর মাথাব ওপরে, দাঁড়ির ওপরে চড়ুই পাখী গিযে বসত।

আমি তখন গীতা সম্বন্ধে আলোচনা করছি। 'রিচার্ড গার্ব্বে'র গীতা সম্বন্ধীয বইখানা সঙ্গে নিযেছিলাম বোলপুর যাবার সময। আসবার সময় ভুলে যাই সেখানা আনতে। পরের বারে শান্তিনিকেতনে গেলে শ্রদ্ধেয় বিধুশেখব শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু প্রভৃতির সঙ্গে খুব আমোদেই দিন কাটতো। কথায কথায বিধুশেখর শাস্ত্রী ম'শাযকে বললাম সেই বইখানার কথা। তিনি বললেন—"বইখানার সদ্ব্যবহার হযেছে। সেখানা আমাদের লাইব্রেরীভুক্ত হযেছে।" হেসে জবাব দিলাম—"আপনারা দেখছি, দাতার অজ্ঞাতেই দান গ্রহণ করেন।" এমনি করে, আমার অজ্ঞাতসারে আমার একখানা বই বিশ্বভারতার বিশাল গ্রন্থাগারভুক্ত হ'ল ভেবে আনন্দ ও গৌরব অনুভব করি।

ছাত্র-জীবনেব স্মৃতি মনে পড়ে,—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত আমাদেব উদ্দীপ্ত করে তুলত। ববীন্দ্রনাথ ছিলেন আমাদেব কাছে বীর, তাঁকে আমরা বীব-পূজা করেছি। কিন্তু, একবার একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল। ১৯১৬—১৭ ইংবাজীর তত্ত্বকৌমুদী ঘাঁটলেই পাওযা যাবে আমার লেখা একখানা প্রতিবাদ-পত্র। তখন ব্রাহ্মসমাজে ঝগড়ার সূত্রপাত হয রবীন্দ্রনাথকে নিযে। প্রশান্ত মহলানবিশ, সুকুমার রায় প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের 'অনারারী' মেম্বার করতে চাইলেন। সামাজিক সংস্কারের দিক দিযে ঠাকুর-পরিবার রক্ষণশীল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা হেড়ম্ব মৈত্র, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথকে 'অনাবারী' সভ্য কবার বিরুদ্ধে ছিলেন। এ নিযে যুবক এবং প্রবীণদের মধ্যে তুমুল তর্কযুদ্ধ উপস্থিত হয। রবীন্দ্রনাথকে 'অনারারী' সভ্য করেছিলেন যাঁরা তাঁদের অবৈধ ও নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য-প্রণালীর বিরুদ্ধে তত্ত্বকৌমুদীতে আমি একখানা প্রতিবাদপত্র পাঠাই। আমার জীবনের এটা একটা অবাঞ্ছিত ঘটনা। কিন্তু আমার মনে হয় যে আমি নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করিনি। কেননা রবীন্দ্রনাথ যদিও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি কেন তার চেয়েও বড় সম্মান

পাবার যোগ্য অধিকারী, তবু নিয়মতন্ত্র অনুসারে তাঁকে 'অনাবারী' মেম্বার করা হয়নি, কতকটা বিদ্রোহাচরণের ভিতর দিয়ে এ কাজটি করতে হয়েছিল। ঠাকুর-পূজো সকলেই চায়, কিন্তু তার বিধি আছে। বিধি না মানলে পূজো সুসম্পন্ন হয় না।

এ ব্যাপার তো সাময়িক একটা মতবিরোধ মাত্র। আসলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা আমার কোনোদিনই হ্রাস পায় নি। তাঁর সত্তর বৎসরের জয়ন্তী উপলক্ষে আমি "ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক দান" নামক যে প্রবন্ধ লিখেছিলাম তিনি তার প্রশংসা করেছিলেন। আমার 'অঞ্জলি' নামক বইএর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে তাঁর কবিতা ও গান উদ্ধৃত করেছি। সেতুবন্ধের সময় কাঠবিড়ালী রামচন্দ্রের যেমন সাহায্য করেছিল, আমিও তাঁর লেখার যৎসামান্য অনুবাদ করতে পেরেছি বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছি। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরুদ্ধে যখন ৺ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভক্তগণ জোর আন্দোলন চালান তখন আমি রবীন্দ্র-ভক্তদের সঙ্গেই তাঁর প্রতিভার সমর্থন করে ধন্য হয়েছি।

আরেকটি ঘটনার কথা বলব যার থেকে আমি জীবনের যাত্রা-পথে পাথেয় পেয়েছি। ১৯২৭ ইংরাজীর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে 'অলওয়ার্‌ল্ড ট্রপিক্যাল ডিজিজ্ স্পেশালেষ্ট'দের 'কনফারেন্সে'র আয়োজন হচ্ছে। প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা করবার উদ্দেশ্যে 'ঋতুরঙ্গ' অভিনয় করবার জন্যে শান্তিনিকেতনের নৃত্যগীতে দক্ষ ছাত্রছাত্রীরা ঠাকুরবাড়ীতে এলেন; রবীন্দ্রনাথ নিজে নামলেন ষ্টেজে। কবি পড়ে শোনাচ্ছেন কবিতা আর নাচে-গানে তার অন্তর্নিহিত ভাব মূর্ত্ত হয়ে উঠছে।

শেষ দৃশ্যটা মনে পড়ছে। গান চলছে—"রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও যাওগো এবার যাবার আগে।"—আর সবাই কবিকে ঘিরে নাচছে। গোপেন্দ্র বাবুর মেয়ে লীলা লিখে দিয়েছিল আমায় গানটা। যাবার আগে তিনি বাস্তবিকই যেন সমস্ত জগৎটাকে রাঙিয়ে দিয়ে গেছেন। তখন বয়স বোধ হয় তাঁর সাতষট্টি। দিনের শেষ তো আছেই,—যেতে তো হবেই। যাব তো যাবার আগে একটু রাঙিয়ে দেব।

আবার দেখা হয়েছিল শিলঙে। 'জিৎভূমি'তে থাকতেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ফণী অধিকারীর ছোট একটি মেয়ে তখন ছিল শিলঙে। তার সঙ্গে বেড়াতেন; হাসি-মস্করা, গল্প-গুজব করতেন। সত্তর বৎসরের বৃদ্ধের সঙ্গে পনেরো বছরের বালিকার একত্রে ভ্রমণের দৃশ্যটি বেশ উপভোগ্য হত।

তখন একটা ডিনার-পার্টি হয় ময়ূরভঞ্জের মাননীয়া মহারাণীর মাতার বাড়ীতে। এক সাহেব ছোকরা শিলঙে বেড়াতে এসেছিল,—সে হাইল্যাণ্ডার।

মেঝের ওপরে দুটো কাঠি দিয়ে নাচ দেখালে,—হাতে তার তরবারি; 'ওয়ার ড্যান্সে'র মত কতকটা। ডিনারে বসে রবীন্দ্রনাথ যেন হাসি-আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলেন।

আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী রেবা রায়ের নৃত্য-গীতে কলকাতায় বেশ সু খ্যাতি হয়েছিল। অনেক সময় শান্তিনিকেতনের অভিনয়ে তার ডাক পড়ত। দাদার ছেলেমেয়েরা বোলপুরে পড়ত; দাদাও সপরিবারে বাড়ী ভাড়া করে বোলপুরে ছিলেন। রেবা ইংরাজীতে 'রাইমিং' করত, কবিতা লেখবার চেষ্টা করত, আমাকেও পাঠাত। যখন অনেকগুলো জমল, 'টাইপ' করে এক কপি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। কুইনি এবং রেবা শ্রীহট্টের এ দুটি মেয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিল।

বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জানিয়ে চিঠি লিখেছিলাম। তিনি লিখেছিলেন "আপনাকে পেলে আমাদের খুব সুবিধে হয়।" বিশ্বভারতীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সংস্কৃতিবিষয়ক আলোচনাদির জন্যে 'শ্রীহট্ট-ভারতী' প্রতিষ্ঠার কল্পনা করেছিলাম। তার থেকেই শ্রীহট্টে প্রথম 'সিলেট কাল্চারেল এসোসিয়েশ্যন' ও পরে শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদের উৎপত্তি হয়।

একাশীতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে কবিগুরুকে টেলিগ্রাম করলাম। আমার বাংলা বই ক'খানা ভক্তি-উপহার স্বরূপ তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। আমি শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টারের পদ লাভ করলে পর হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁর শুভ কামনা-জ্ঞাপক একখানা পত্র হাতে এসে পৌছল।

শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদের উদ্বোধন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের কাছে বাণী প্রার্থনা করি। তিনি অসুস্থ বলে বাণী দিতে পারেন নি। তাঁর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চন্দ লিখলেন যে, কবি অসুস্থতা-নিবন্ধন বাণী দিতে পারলেন না বলে দুঃখিত।

আমাদের পরিবারের রমাকান্ত রায় জাপানযাত্রার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের নিকট থেকে আর্থিক ও অন্যান্য বিষয়ে আনুকূল্য পেয়েছিলেন, আজ কৃতজ্ঞচিত্তে তা' স্মরণ করি। রমাকান্ত জাপান থেকে কৃতিত্ব অর্জ্জন করে পড়া শেষ করে ফিরে এলে ঠাকুর পরিবারের সুসন্তানেরা—বিশেষত শ্রীমতী সরলা দেবী কলকাতার শিক্ষিত ব্যক্তিদের সহযোগিতায় টাউন-হলে তাঁর সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করেন।

স্বদেশীযুগে "অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার" এই কবিতাটি ছাত্রসমাজের প্রাণে বীরপূজার ইন্ধন যোগায়। গত ১৯৩৮ ইংরাজীতে যখন সপরিবারে

বিলাত যাত্রাপথে জাহাজে বসে 'উপনিষদের মর্ম্মবাণী' লিখতে আরম্ভ করি এবং রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মসঙ্গীতও অনেকগুলো ইংরেজীতে অনুবাদ করি। এগুলো বিশ্বকবিব চবণে উপহার দেবার আকাঙ্ক্ষা আর পূর্ণ হ'ল না।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে 'সাহিত্য সমাজ ও ধর্ম্ম, গ্রন্থখানা তাঁর নামে উৎসর্গ করেছি। দুঃখের বিষয় ছাপা শেষ হওয়াব আগেই কবির মহাপ্রয়াণ হল।

ববীন্দ্রনাথকে আবাব দেখেছিলাম; কয়েক বৎসর আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে। ডাঃ বিধান রায় ও স্যার নীলবতন সরকার দু'জনে দু'পাশে ধবে আস্তে আস্তে তাঁকে সভামণ্ডপে নিয়ে আসেন। অক্সিজেন নিঃসবণকারী যন্ত্র তাঁদেব কাছে ছিল, যাতে প্রযোজন হ'লে প্রয়োগ কবতে পারেন। সেদিনকাব তাঁব ঋষিসুলভ আকৃতি এবং চোখের সৌম্যশান্ত দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক জীবনেব ও তপস্যাব জ্যোতি ও কান্তি পরিস্ফুট হযেছিল, তাঁব বাণীটিও অতি প্রাণস্পর্শী ও উদ্দীপনাপূর্ণ হয়েছিল। শিলংএ মাননীয় রায়বাহাদুর প্রমোদচন্দ্র দত্ত ম'শায়েব সত্তর বৎসব পূর্ণ হওযা উপলক্ষে যে সম্বর্দ্ধনা-সভা হয তাতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সভাপতিত্ব কবেছিলেন। ববীন্দ্রনাথ সে-উপলক্ষে রায়বাহাদুবকে অভিনন্দিত কবে যে পত্রখানা তাঁর কন্যার নিকট লিখেছিলেন তা সভায় পাঠ করা হয়। কবিব প্রসঙ্গে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় তাঁর সম্বন্ধে বেশ চিত্তাকর্ষক একটি ঘটনা বর্ণনা কবেন। ঘটনাটি হচ্ছে এই :—

পবলোকগত দেশবন্ধু চিত্তবঞ্জন দাশ ম'শাযেব প্রতিষ্ঠিত সেবাসদনের অর্থানুকূল্যের জন্য একটি আবেদন প্রকাশ করা প্রয়োজন। ডাঃ বিধান বায এই প্রতিষ্ঠানেব প্রধান অধ্যক্ষ। তিনি ভাবলেন দেশবন্ধুর একটি ছবির নীচে রবীন্দ্রনাথে দু'টি লাইন লেখা থাকলে বেশ চিত্তাকর্ষক হ'তে পাবে ও অর্থসংগ্রহেব সুবিধা হবে। তাই তিনি গিযে ববীন্দ্রনাথকে ধরে বসলেন শীগ্‌গিব দু'টি ছত্র কবিতা লিখে দেবার জন্যে। কবি একটু রসিকতা কবে বল্লেন, "মশায়, আপনাবা ডাক্তাব মানুষ, সোঁ সোঁ করে মোটর গাড়ীতে চডে যত ইচ্ছা রোগী দেখেন, ঘণ্টাব মধ্যে পঞ্চাশখানা প্রেস্ক্রিপ্‌সন লেখেন; আমরা কবি মানুষ, আমাদের কবিতা ত আব ফরমাস দেবামাত্রই ('মেইড্‌ টু অর্ডার') কলম দিয়ে বেরিয়ে আসে না। বসুন, এত তাড়াতাড়িতে কি হয়?" বিধান রায় বল্লেন "আপনার কবিত্বও ত এমন সহজ সরলভাবে 'কনডিটে'র (Conduit) ভেতব দিয়ে গড়িয়ে পড়ে;— ঠিক যেমন হাইড্রো ইলেক্‌ট্রিকের পাইপ দিয়ে ঝর্ণার জল পাওযার ষ্টেশনে এসে বিজলীব শক্তি সঞ্চারিত করে। আপনি একটু

চোখ বুঁজে বসে কলটি টিপে দিন, আপনা থেকে 'কনডিটে'র (Conduit) মধুর রস বর্ষণ হবে, আমরা তাতে ভেসে যাব হয়ত।" কিন্তু বিধান রায় এত সহজে ছাড়বার পাত্র নন। তাঁর অনুরোধ এড়াতে না পেরে কবি তখনি এই দু'টি ছত্র লিখে দিলেন ঃ—

—"এনেছিলে সাথে ক'রে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

কবিগুরু-সম্বন্ধেও আমরা বলতে পারি, তিনি যে মৃত্যুহীন প্রাণ সঙ্গে করে এই সংসারে এসেছিলেন জীবনান্তে সেই অমরজীবনের উৎস ভারতময়, বিশ্বময় উৎসারিত করে গেছেন।

উপসংহারে একটি ব্যক্তিগত ঘটনার উল্লেখ করছি। উনিশশো তেইশ সনের চব্বিশে মে তারিখে একটি জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান হয়েছিল ডাক্তার বিধান রায়ের বাড়ীতে। আমি তখন ঢাকা থেকে গ্রীষ্মের ছুটিতে শিলঙে বেড়াতে এসেছি। সেবারে রবীন্দ্রনাথও শিলঙে এসেছিলেন। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস্ চ্যান্সেলার ডক্টর জ্ঞান চক্রবর্ত্তীও (এখন পরলোকে) তখন এখানে ছিলেন। তা' ছাড়া আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং আরো কয়েকজন বন্ধু ছিলেন। ওঁদের সকলকে নিমন্ত্রণ করি সেদিনকার টি-পার্টিতে। এতসব বিদ্যানুরাগী পণ্ডিত ও কবির শুভ উপস্থিতিতে বেশ জমেছিল হাসি ও রসালাপে মুখরিত আসরখানি। এই প্রীতি, শান্তি ও আনন্দপূর্ণ সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার মধ্যে যেন দৈব-বাণীর মত শুনেছিলাম—আমাকে আসাম প্রদেশে 'ইণ্ডিয়ান্ এডুকেশন্যাল সার্ভিসে'র একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে আসতে হবে। তার ছয় মাসের মধ্যেই আমাকে সুরমা উপত্যকা ও পার্ব্বত্য অঞ্চলের বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টারের কাজে আসামে আসতে হ'ল।

তারপর সুদীর্ঘ আঠারো বৎসর অতীত হয়ে গেছে। কিন্তু তখনকার স্মৃতি আমার মনে আজো সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। কবিগুরু আজ নেই। কিন্তু তাঁর আত্মিক সান্নিধ্য অনুভব করে তাঁরি উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম জানাচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য

বুদ্ধদেব বসু

প্রথমটায় মনে হয় পদ্যের চাইতে গদ্য লেখা সহজ। মনে-মনে নানা কথাই আমরা ভাবি, সে-সব ভাবনা মন থেকে কাগজে বদলি করা এমন আর শক্ত কী। যা ভাবছি ঠিক তা-ই লিখে যাচ্ছি, শুনতে এটা বেশ সোজাই মনে হয়। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আমরা গদ্যেই চিন্তা করি, দিনরাত কথাও বলছি গদ্যে, এমন লেখাপড়া-জানা লোক হ'তেই পারেন না যিনি জীবনে চিঠিপত্রাদির আকারে কিছু গদ্য না লিখেছেন—অতএব গদ্যে আমাদের অধিকার সহজাত।

সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেকেই এ-রকম মনে করেন বটে। পদ্যরচয়িতা কবি হ'তে পারেন কি নাও পারেন, কিন্তু যে-কোনো পদ্যরচয়িতার প্রতি সাধারণ পাঠকের কেমন একটা ভয়-মেশানো ভক্তির ভাব অনেক সময়ই ধরা পড়ে, তিনি যে মুখের কথাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে বিশেষ একটা ছন্দের মধ্যে বেঁধে দিয়েছেন, তার উপর মিলের টুংটাং বোলও শোনা যাচ্ছে—অতএব তাঁর যে কোনো অলৌকিক শক্তির উপরে দখল আছে তাতে আর সন্দেহ কী। সাধারণ পাঠক নিছক ছন্দ-মিল দেখেই তাজ্জব ব'নে যায়—কেননা ও-দুই বস্তু সাধারণের আয়ত্তের বাইরে।

গদ্য কিছু-না-কিছু সকলেই লিখে থাকেন, পদ্য অল্প কয়েকজনেরই অধিগম্য, অতএব গদ্য সোজা, পদ্য শক্ত, এই হ'লো সাধারণের ধারণা।

আসল ব্যাপারটি কিন্তু এর ঠিক উল্টো। ছন্দ-মিল বাঁচিয়ে পদ্যরচনা বালকের পক্ষে, নিতান্ত অক্ষমের পক্ষেও সম্ভব, গদ্যরচনাও অসম্ভব বলি না, তফাৎ শুধু এই যে সে-পদ্য একেবারে অপাঠ্য হয়তো ঠেকবে না, এমনকি তখনকার মতো তাক লাগানোও সম্ভব, কিন্তু গদ্যে অপটুতা একেবারেই স্বচ্ছ হ'য়ে ধরা পড়বে। পদ্যে ছন্দমিলের কৌশলটাই অনেকখানি সাহায্য করে, তার আড়ালে আপাতত চাপা পড়ে ভাষার জড়তা, ভাবের দীনতা, আরো নানারকম ত্রুটিবিচ্যুতি। কিন্তু গদ্যের সে-রকম কোনো সম্বল নেই, তাতে ফাঁকি চলে না। তার সমস্ত দোষ উগ্র হ'য়ে ফোটে, পাঠককে ত্রুটি সম্বন্ধে উদাসীন কি সহনশীল করবার কোনো ভঙ্গিমাই তার জানা নেই। যে-সব অপরিচ্ছন্নতা, অস্পষ্টতা, ভাষার বিকৃতি এমনকি ব্যাকরণের অশুদ্ধি পদ্যে আমরা হামেশাই মার্জনা করি, গদ্যে তার যে-কোনো একটি অতি অল্প মাত্রাতেও অসহ্য ঠেকে। পদ্যলেখকের স্বাধীনতা বেশি, পাঠকের কাছে ক্ষমার প্রত্যাশা বেশি, গদ্যলেখককে পদে-পদেই অবহিত হওয়া দরকার। গদ্য অনেক

বেশি আত্ম-সচেতন শিল্প। তাই তো আমরা দেখি যে মানুষের প্রাচীন যুগের সমস্ত সাহিত্যই পদ্যে গাঁথা, গদ্য আধুনিক। এও তো দেখছি যে আঠারো বছরের ছেলে এমন কবিতা লিখতে পারে যা সাহিত্যের চিরস্থায়ী সম্পদ ব'লে গণ্য হবে, কিন্তু গদ্যে কৃতী হ'তে হ'লে অন্তত মধ্যবয়সের প্রান্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। খুব অল্প বয়সে ভালো কবিতা কবিরা অনেকেই লিখেছেন, ভালো গদ্যলেখকের শ্রেষ্ঠ রচনা প্রায়ই পরিণত বয়সের সৃষ্টি।

এর অবশ্য আর-একটা কারণ আছে। তা এই যে কবিতার (অবশ্যতই পদ্যের যদিও নয়) উৎস হৃদয়াবেগ, গদ্যের উৎস বুদ্ধিবৃত্তি। আমরা যা অনুভব করি তা-ই আমরা কবিতায় লিখি, আমরা যা চিন্তা করি, তাই আমরা গদ্যে লিখি। কোনো একটা আবেগের স্রোতে কবিতা যখন আসে লেখক অনেক সময় শুদ্ধু মিডিয়মের কাজ করেন, তাঁকে দিয়ে কে যে ও-সব কথা বলাচ্ছে তা তিনিই জানেন না। কবিতায় তাই অসংযমের এত ছড়াছড়ি। যা একবার বললে চলে তা পাঁচবার বলা, যা এক কথায় বলা যায় তা পাঁচকথায় বলা—এ-সব কবিতার লক্ষণের মধ্যেই। রীতির বিচারে এগুলো দোষ বইকি, কিন্তু এ-সব দোষ সম্পূর্ণ এড়াতে গেলে বোধ হয় কবি হওয়াই চলে না। গদ্যের পিছনে আবেগের প্রবল তাগিদ্ থাকে না, তার উদ্দেশ্য কোনো অনুভূতির সংক্রামণ নয়, তার উদ্দেশ্য মনের কথা স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে বলা। গদ্য যদি স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন না হয় তাহ'লে তার না-হওয়াই ভালো, সেইজন্য গদ্যলেখককে অনেক বেশি ভাবতে হয়, খাটতে হয়, খুবই সাবধানে চলতে হয়।

স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ক'রে বলা—একি সহজ কাজ? মোটেও না। সাধারণ লোকের লেখা চিঠি দেখুন। মামুলি বাঁধা গতে ভরা; আর যেখানেই মনের কোনো কথা বলতে গেছে সেখানেই এত এলোমেলো বিশৃঙ্খল যে বলবার কথাটি আন্দাজে বুঝে নিতে হয়। এ তো জানা কথাই যে জগতের বেশির ভাগ লোক মনের কথা ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না; তা যদি পারতো তাহ'লে সাহিত্যিকের পেশাই লুপ্ত হ'য়ে যেতো, কারণ আমি যে-কথা মনে-মনে ভাবছি ঠিক সেই কথাই আর-একজন লোক চমৎকার স্পষ্ট করে বলেছে, এই আবিষ্কারের উল্লাসই তো বই পড়বার প্রধান সার্থকতা। আমরা ভাবি, অনুভব করি, সুখেদুঃখে আন্দোলিত হই, বলতে পারিনে। সেই সব অকথিত কথা হঠাৎ যখন কোনো-একজনের লেখনীতে উজ্জ্বল রঙে জ্বলে ওঠে তখনই আমরা ধন্য-ধন্য বলি। মনে-মনে আমরা সবাই বুঝি যে বলাটা সহজ নয়।

মনে-মনে অনেকদিন ধ'রেই একটা কথা ভাবছি, ভেবে-ভেবে কথাটা মনের মধ্যে বেশ থিতিয়ে গেছে, এখন কলম তুলে নিলেই হয়। কিন্তু কলম নিয়ে দু'তিন লাইন লিখেই থমকে যাই। কি হয়তো প্রথম কথাতেই আটকে গেলুম। এ কেমন ক'রে হ'লো? যখন ভাবছিলুম তখন তো অনর্গল কথা আসছিলো। তাই মনে হয় বটে, কিন্তু আসলে ঠিক তা নয়। যতক্ষণ

ভাবি ভাষা থাকে গৌণ। কথা না-জুটলে বাদ দিয়ে যাই, সেটা লক্ষ্যও করিনে। ছবিতে ভাবি, প্রতীকে ভাবি, রূপকে ভাবি। তার সবটাই ভাষা নয়। আমাদের মৌখিক আলাপেও ভাষা অনেক সময় পিছনে প'ড়ে থাকে, ভঙ্গি দিয়ে, দৃষ্টি দিয়ে, আহা-উহু দিয়ে সে-অভাব আমরা পূরণ করি। কিন্তু লেখবার বেলায় ভাষাই যে সব। কথা দিয়েই সমস্তটা বলতে হবে। অন্য কোনো অঞ্চল থেকে সাহায্যের আভাসমাত্র নেই। প্রতিটি ভাবচ্ছায়ার জন্য গাঁথতে হবে সম্পূর্ণ এক-একটি কথাগুচ্ছ। কথা হারিয়ে যায়, দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়; মনের অন্ধকার থেকে সেই পলাতকাদের খুঁজে-খুঁজে বের করা যে কী কঠিন সাধনা তা তিনিই জানেন যিনি কখনো মনের কোনো কথা ভাষায় প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন। লিখতে বসলে বোঝা যায় যে যেটা সহজ মনে হয়েছিলো সেটা কত শক্ত।

এ-কথা শুধু গদ্য সম্বন্ধেই খাটে, পদ্যের বেলায় অন্য নিয়ম। অন্তত গদ্য সম্বন্ধে যতটা খাটে পদ্য সম্বন্ধে ততটা খাটে না। এ-কথা ব'লে কাব্য-সাধনাকে আমি লাঘব করতে চাচ্ছি না, কিন্তু তার দুরূহতা অন্য ধরনের। কাব্যরচনায় স্বাভাবিক শক্তি ব'লে একটা জিনিস আছে। সেটা যার আছে, তার আছে; যার নেই তার কোনোকালেও হবে না। কিন্তু গদ্যরচনায় স্বাভাবিক শক্তি ব'লে কিছু আছে কিনা সন্দেহ। ওটা প্রায় সম্পূর্ণ চর্চার ব্যাপার। ভাষা সম্বন্ধে চেতন মন—এ ছাড়া গদ্যলেখকের অন্য কোনো মূলধন নেই। বাকিটা অধ্যবসায়। কবিতার ছন্দ তাকে একটা সুর দেয়; সেই সুরের টানে অনেক সময় তিন-চার পাঁচ-সাত লাইন একসঙ্গে কবির মনে ঝলসে ওঠে, মিলের ঝোঁকে প্রথম লাইনের পরে দ্বিতীয় লাইনটা হ'য়ে ওঠে। অনেক সময় শুদ্ধু একটা মিলের প্রেরণাতেই একটা কবিতা জন্মায়। আমি বলবোই পদ্যের এগুলো সুবিধে। কাব্যরচনার সময় আস্ত-আস্ত লাইন মনে আসে, গদ্যের বেলায় প্রত্যেকটি কথা হাৎড়ে বের ক'রে ঠেলা মেরে-মেরে এক-একটি বাক্য শেষ হয়। কবিতায় অর্ধেক বলা হয় কথায়, বাকিটা ঝঙ্কারে ও অলঙ্কারে, গদ্যে সবটাই কথা দিয়ে বলতে হয়। তাই কোনোরকম শৈথিল্য গদ্যে সয় না; তার বাঁধুনি হওয়া চাই শক্ত, তার বিন্যাস আগাগোড়াই জমাট। পদ্যে কিছু-কিছু রসের উপাদান নিজেরই মধ্যে আছে; গদ্য একেবারেই শাদা ভাত, তাকে সুখাদ্য ক'রে তুলতে হলে পাকা রাঁধুনি না হ'লে চলে না।

(২)

সুইনবর্নের অসহ্য গদ্য সত্ত্বেও এ-কথা বলা যায় যে কবিরা যখন গদ্য লেখেন ভালো গদ্যই লেখেন। কবির ভাষা-সচেতন মন গদ্যের ক্ষেত্রেও তাঁর সহায়। ভাষাব্যবহারে দক্ষতাই কবিত্বের প্রথম সর্ত, নিছক গদ্যলেখককে অনেক পরিশ্রমে যে-শক্তি অর্জন করতে হয়, কবি সেই শক্তি নিয়েই আরম্ভ করেন, ঐখানে তাঁর জিৎ। ভয়ও আছে—তা এই যে

ঐ শক্তির মত্ততায় গদ্যকে তিনি স্বধর্মচ্যুত না ক'রে ফেলেন। কবিদের হাতে গদ্য বড্ড বেশি 'কবিত্বময়' হ'যে উঠতে পারে এ আশঙ্কা অবাস্তব নয়। চরম উদাহরণ সুইনবর্ন।

'প্রথম যখন গদ্য লিখতে আরম্ভ করলুম', রবীন্দ্রনাথ একদিন বলছিলেন, 'ঠিক গদ্য হ'তো না। পদ্যের রেশ কাটাতে পারিনি। যেমন ধরো "কেকাধ্বনি" প্রবন্ধ। ও একরকম গদ্য-পদ্য মেশানো রচনা।' তারপর 'আমি অবাক হ'যে যাই গল্পগুচ্ছকে যখন তোমরা গীতধর্মী বলো। ঠিক বুঝতে পারিনে।' এ দুটি উক্তি থেকে আঁচ করা যাবে তাঁর গদ্যের পরিণতি সম্বন্ধে কবির নিজের ধারণা। রবীন্দ্রনাথের গদ্য এখন পর্যন্ত সমালোচকদের নজর খুব বেশি পাযনি, কিন্তু তাঁর গদ্যের পরিণতির ইতিহাস বিরাট ও বিচিত্র; তিনি আমাদের সবচেযে বড়ো কবি, আবার তিনিই আমাদের শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক, বাংলা পদ্যের ছন্দ ও গদ্যের ভাষা দুই-ই তাঁর সৃষ্টি। এ হিসেবে পৃথিবীর লেখকদের মধ্যে তিনি অনন্য।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যপরিণতির ধাপগুলি মোটামুটি দেখাবার চেষ্টা করছি। সাধুভাষা ও চলতিভাষা তাঁর রচনায একটি খুব বড়ো বিভাগ। অবশ্য মনে রাখতে হবে তাঁর জীবনের প্রথম গদ্যগ্রন্থ—অর্থাৎ সতেরো বছর বযেসে লেখা 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' চলতি ভাষায় লেখা। আর সে-ভাষা আশ্চর্য। সে-চিঠিগুলো বেসরকারি—অর্থাৎ মুখত্যই প্রকাশের জন্য নয - তাই ঘরোযা ভাষা ব্যবহার করতে তাঁর কুণ্ঠা হযনি। কিন্তু ওখানে প্রমাণ রইলো চলতি ভাষার উপর তাঁর সহজ অধিকারের। তার পরে শুরু হ'লো তাঁর মূল গদ্যরচনার ধারা—গম্ভীর বঙ্কিমি ভাষায। অনেকদিন পর্যন্ত বঙ্কিমের প্রভাব তাঁর উপর স্পষ্ট। প্রথম ছোটো গল্পগুলি দেখুন। 'নৌকাডুবি' পর্যন্ত উপন্যাসে কথোপকথন সুদ্ধু সাধুভাষায লিখেছেন। পদ্যে তিনি বিপ্লবী, 'মানসী'তেই আনলেন নতুন ছন্দ, নতুন ভাষা, গদ্যে রক্ষণশীল, হাৎড়ে-হাৎড়ে আস্তে-আস্তে অগ্রসর হচ্ছেন। এখানেও বোঝা যাবে পদ্যের সঙ্গে গদ্যের জাতে তফাৎ। গদ্যকে ঠিক আযত্ত করতে, ঠিক নিজের মতো ক'রে নিতে রবীন্দ্রনাথেরও অনেকগুলি বছর লেগেছিলো। এরই মধ্যে 'কেকাধ্বনি' ও সেই সময়কার অন্যান্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-রচনায বৈশিষ্ট্যের প্রথম আভাস ফুটলো। 'ঠিক গদ্য নয়…একরকম গদ্যপদ্য-মেশানো রচনা'। তার মানে, ও-গদ্য বড়োই কবিত্বময়। কিন্তু সে-কবিত্বই রাবীন্দ্রিক। গদ্যে যে-রস যে-সৌরভ আর-কোনো বাঙালি লেখক দিতে পারেননি, তিনি তা-ই দিলেন। কবিত্বের একটু বাড়াবাড়ি হযতো ছিলো— সেটুকুই কাঁচা হাতের লক্ষণ - কিন্তু এত বেশি ছিলো না যাতে সমস্ত জিনিসটা ঘোলাটে, ধোঁয়াটে হ'যে ওঠে। অলঙ্করণ একটু বেশি হযতো ছিলো, কিন্তু স্বচ্ছতা নষ্ট হযনি; 'কেকাধ্বনি' আজও মুগ্ধ করে।

তবু, আতিশয্য যেটুকু ছিলো তা থেকে তিনি মুক্ত হ'লেন গল্পগুচ্ছের শেষের দিককার— অর্থাৎ 'কাবুলিওয়ালা', 'মেঘ ও রৌদ্র,' 'ছুটি' প্রভৃতি গল্পে, অন্যদিকে 'প্রাচীন সাহিত্য' 'লোকসাহিত্যে'র প্রবন্ধে। এই সময়টা তাঁর গদ্যরচনার উজ্জ্বলতম পর্যায়ের একটি।

'কাবুলিওয়ালা' গল্পকে কি 'ছেলে-ভুলোনো ছড়া' প্রবন্ধকে গীতধর্মী বললে সুবিচার করা হয় না—কারণ কবিত্ব এখানে কঠোরভাবে সংযত, গল্পের স্বচ্ছন্দ গতি কোথাও ব্যাহত নয়, প্রবন্ধের সারবস্তু শব্দের ছটায় চাপা পড়েনি, বরং শব্দব্যবহারের নৈপুণ্যে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। আর তারই সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব মধুর হাস্যরস, কবিত্ব আর হাস্যরসের অপরূপ মিলনে দিক্‌দিগন্ত আলো হ'য়ে উঠলো। কার্তিকের 'কবিতা'য় আবু সয়ীদ আইয়ুব ঠিকই লিখেছেন—কবিত্ব আর হাস্যরস এ দুটিই রবীন্দ্রনাথের গদ্যের প্রধান গুণ। এ দুটি গুণ সর্বত্র সমানভাবে পাই না। যেখানে-যেখানে এ দুটি গুণের স্ফূর্তির সমন্বয় দেখি, সে-সব গ্রন্থ বা গ্রন্থগুলিই রবীন্দ্র-গদ্যের বিভিন্ন চূড়া।

'গল্পগুচ্ছে'র শেষ প্রান্তে পৌঁছতে-পৌঁছতে বঙ্কিমের প্রভাব থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত হলেন। বস্তুত, প্রথম দিককার কয়েকটি কাঁচা গল্প বাদ দিলে, কোনো গল্পের ভাষাতেই বঙ্কিমী ছাপ নেই। যদিও সাধু, ভাষা অনেক লঘু, অনেক সহজ হ'য়ে এসেছে। এ-ভাষার চরম অভিব্যক্তি 'চতুরঙ্গ'। 'চতুরঙ্গ' সাধুভাষায় তাঁর শেষ বই। কিন্তু সে-সাধুভাষাই যেন সাধুভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ যেন জেদ ক'রে 'চতুরঙ্গে'র কথোপকথন পর্যন্ত সাধুভাষায় লিখেছিলেন (যা তিনি 'গোরা'য় করেননি), শুদ্ধু এইটে দেখাতে যে সাধুভাষাও কতখানি চলতি ভাষার মতো হ'তে পারে। বস্তুত, 'চতুরঙ্গ' পড়তে-পড়তে মনেই হয় না যে বইটি সাধুভাষায় লেখা। সে-ভাষা এমনি দ্রুত, এমনি নির্ভার, এমন সংক্ষিপ্ত ও স্বচ্ছন্দ যে স্পষ্টই বোঝা যায় যে চলতি ভাষার সঙ্গেই তার রক্তের টান। সাধুভাষার পক্ষপাতী যাঁরা তাঁরা হয়তো বইটি এ-কথারই প্রমাণস্বরূপ দাখিল করবেন যে চলতিভাষার গুণাবলী সাধুভাষাতেই পাওয়া সম্ভব, অতএব চলতি ভাষা অনর্থক, কিন্তু কার্যত দেখা গেলো যে 'চতুরঙ্গে'র পরে রবীন্দ্রনাথ সাধুভাষায় আর একটি লাইনও লিখলেন না। সেটা অনিবার্য ছিলো ব'লেই মনে হয়, কেননা ভিতরে-ভিতরে গ্রন্থি শিথিল হ'য়ে আসছিলো, এতদিন যে-ভাষা ব্যবহার ক'রে আসছেন, তাতে আর চলছে না 'চতুরঙ্গে' তার স্বীকারোক্তি স্পষ্ট। 'চতুরঙ্গে'র সাধুভাষা সাধুভাষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

চলতি ভাষা গ্রহণে রবীন্দ্রনাথের উপর শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ও 'সবুজপত্রে'র প্রভাব স্পষ্ট, কিন্তু এ-কথাও স্পষ্ট যে তাঁর নিজের ভিতরেও তাগিদ ছিলো, 'সবুজপত্রে'র প্রেরণা সাহায্য করেছিলো নিশ্চয়ই, কিন্তু 'সবুজপত্র'ই এ-জন্য দায়ী এ-কথা বললে বেশি বলা হয়। চলতি ভাষা সম্বন্ধে উৎসাহের প্রথম ঝোঁকে 'ঘরে-বাইরে' জন্মালো। অবশ্য এর মধ্যে তিনি যে চলতিভাষা একেবারেই লেখেননি তা নয়—অনেক লিখেছেন। প্রহসনগুলি হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গকৌতুক, 'শারদোৎসব' থেকে 'ডাকঘর' পর্যন্ত নাটকগুলো—সবই চলতি ভাষায় লেখা। পরিমাণ বড়ো কম নয়। তবু 'ঘরে-বাইরে' যখন লিখলেন, তিনি যেন চলতিভাষাকে নতুন ক'রে পেলেন, কারণ চলতি ভাষায় এই তাঁর প্রথম আখ্যানরচনা—

অন্যগুলো হয় নাটক নয় নাটকীয় টুকরো। তাই প্রথম স্তবে যেমন দেখেছিলুম, তেমনি 'ঘরে-বাইরে'তেও কবিত্বের আতিশয্য ধরা পড়ে। যেন বড্ড বেশি জোর দিয়ে বলা, বড়ো বেশি ঐশ্বর্য। নতুন ভাষা তাঁর হাতে তখনো ঠিক খোলেনি, খেলেনি। হাস্যরসও ক্ষীণ। কিন্তু 'ঘবে-বাইবে'ব অব্যবহিত পরেই 'পয়লা নম্বব' 'পাত্র-পাত্রী'তে নতুন আলো ঝলসে উঠলো। দেখলুম চলতি ভাষার আশ্চর্য রূপ। আবার সেই কবিত্ব ও হাস্যরসেব সুষমিত সমন্বয়। সঙ্গে-সঙ্গে অতুলনীয় 'লিপিকা'।

এখান থেকে শুরু ক'বে 'যোগাযোগ', 'রাশিয়ার চিঠি', 'যাত্রী' পর্যন্ত রবীন্দ্র-গদ্যেব দ্বিতীয় চূড়া পবিব্যাপ্ত। জীবনেব শেষ কুড়ি বছব গদ্যেব সাম্রাজ্য ছিলো তাঁব কবতলে, অজস্র প্রবন্ধে অসংখ্য চিঠিপত্রে গদ্যেব অফুবন্ত বিচিত্র ঐশ্বর্য তিনি দু'হাতে ছড়িযে গেছেন। এব মধ্যে অনেক ছোটো-ছোটো স্তব খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু তাব বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয। মোটামুটি বলা যায, 'শেষেব কবিতা'য একটি নতুন স্তরেব সূত্রপাত, কিন্তু 'ঘবে-বাইবে'ব পূর্ণতা যেমন 'পয়লা নম্বব', 'পাত্রপাত্রী'তে, তেমনি 'শেষেব কবিতা'ব পূর্ণতা 'যোগাযোগে', 'রাশিযাব চিঠি'তে—অবশ্য নিছক ভাষার দিক থেকেই এ-কথা বলছি। মোটামুটি বলা যায, জীবনেব শেষ দশ বছবে তাঁর গদ্যেব তৃতীয় চূড়া গ'ড়ে উঠেছিলো— 'আধুনিক সাহিত্য' 'ছন্দ' প্রভৃতি প্রবন্ধে যে-সংহত মনীষাদীপ্ত বচনাভঙ্গি তিনি আরম্ভ কবেন, তাবই চবম ব্যঞ্জনা 'ছেলেবেলা'য। ইতিমধ্যে অবশ্য তিনি গদ্যকবিতাগুলো লিখেছিলেন, তার প্রভাব শেষ পর্যায়েব গদ্যে স্পষ্ট। এ-সময়ে দেখতে পাই নতুন শব্দ উদ্ভাবনে তাঁব আশ্চর্য প্রতিভা, যথাসম্ভব সংক্ষেপে বলবার দিকে ঝোঁক, তাছাড়া গদ্যের ছন্দ সম্বন্ধে নিখুঁত সচেতনতা। এ-কথা বললে বোধ হয় ভুল হয় না যে গদ্যকবিতা না-লিখলে তাঁর শেষেব দিককার গদ্য ধ্বনির দিক থেকে এমন অনিন্দ্য হ'তে পারতো না।

সাতবর্ণ মিলে যথা দেখা দেয় এক শুভ্র জ্যোতি
সব ধর্ম মিলে হোক ভারতের শক্তি ও সংহতি ।।

[illegible]

দিনান্ত

মৃণালকান্তি দাশ

পৌষের পাণ্ডুর সন্ধ্যা পাটল আকাশ।
শস্যহীন শূন্য মাঠে মাঠে
শুনি কার লগ্নহীন ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস।

বিশীর্ণ শীতের শব
ছায়া কালো কালো
দেখা দেয় পাহাড়ের প্রান্তরের পথে,
নিভে আসে সব রঙ আলো—
স্তিমিত দিগন্ত রেখা
মুছে যায় ম্লান কুয়াশায়।
তিমিরের বুকে শেষ-সবিতা ঘুমায়।

ছিন্নমেঘ মৃতদিন স্তব্ধ শালবন।
ঝিঁঝিঁদের শব্দ শুনি কান্নার মতন,
শূন্যমন মৌন গতভাষ
নির্জ্জন সন্ধ্যার ক্ষণ নিশ্চুপ উদাস,
উড়ে যায় ভ্রাম্যমান বনহংস রাত্রির কুলায়।
তিমিরের বুকে শেষ-সবিতা ঘুমায়।

★

ঝরে গেছে সবরূপ, সবআলো, অমল আকাশ।
নিথর রাতের ঢেউ মন্থর বাতাসে গেছে ছেয়ে—
—অধীর আঁধার ভরে পিপাসা আলোর
নিরুত্তর নক্ষত্রেরা—রবিহারা কাঁদিছে প্রহর।

তিন পুরুষ

জগদীশ ভট্টাচার্য

It is said that it is not the individual who makes revolutionary social and political changes, but that they are made by the progress of the age, and that he appears when the hour for him is come. If the hour makes the man, I believe the man brings about the hour.

Memoir of Dwarakanath Tagore.

মহাকালচক্রের অদৃশ্য আবর্তনে দুইটি শক্তি ক্রিয়াশীল—ব্যক্তি ও সমাজগতি। ব্যক্তিপুরুষ সমাজগতিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করেন, সমাজগতি ব্যক্তিপুরুষের জন্মদান করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব-প্রসঙ্গ আলোচনায় যেমন তাঁহার অভ্যুদয়লগ্নে বাংলার সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, তেমনি পিতৃপিতামহের শোণিত ও চরিত্র-প্রভাব তাঁহার সহস্ররশ্মি প্রাণাদিত্যের জন্মদান ও উন্মীলনকালে কি ভাবে ক্রিয়াশীল হইয়াছিল তাহার পর্যালোচনাও অপরিহার্য।

রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর যে ঠাকুরবংশে জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদের আদিপুরুষ ছিলেন 'বেণীসংহার' প্রণেতা ভট্টনারায়ণ। বাচস্পতি মিশ্রের মতে ইনি আদিশূর কর্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম। প্রাচীন কুলাচার্য হরি মিশ্রের মতে উক্ত ব্রাহ্মণপঞ্চকের পরিচয়ে পার্থক্য আছে। তিনি শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের স্থলে তৎপিতা ক্ষিতীশের নাম করিয়াছেন। 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রাচীনতর বলিয়া হরি মিশ্রের উক্তি সমর্থন করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের ব্রাহ্মণ কাণ্ড, পীরালী ব্রাহ্মণ বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ভট্টনারায়ণের পুত্র দীন মহারাজা আদিশূরের নিকট বর্তমান বর্ধমান জেলাস্থ 'কুশ'গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া কুশারী হন। দীন কুশারীর আট দশ পুরুষ অধস্তন জগন্নাথ কুশারী (মতান্তরে তাঁহার পুত্র পুরুষোত্তম) যশোহরের অন্তর্গত দক্ষিণ ডিহির পীরালী ব্রাহ্মণ শুকদেব রায় চৌধুরীর কন্যার পাণিপীড়ন করিয়া পারালী ব্রাহ্মণ সমাজভুক্ত হন।[১] পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ

---

[১] এই সম্পর্কে Memoir of Dwarkanath Tagore প্রণেতা কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেন, We next hear of Jaggarnath, said to be twenty fourth in descent from Bhatta Narayan. Following the example of his ancestor, he emigrated from Kanouj to Jessore, where he settled and married the beautiful and accomplished daughter of Sudha Ram, the Sudra Raja of Esobpore. This inter-marriage is supposed to have cast the Tagores out of the pale of caste and converted them to Peeralies. p. 3.

হইতে উর্ধ্বতন একাদশ পুরুষ। "শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে পিতৃপুরুষের নাম স্মরণ করিবার যে বিধি আছে, তাহাতে দশপুরুষের নাম পাওয়া যায় :—

ওঁ পুরুষোত্তমাদ্বলরামো বলরামাদ্ধরিহরো হরিহরাদ্রামানন্দো রামানন্দান্মহেশো মহেশাৎ পঞ্চাননঃ পঞ্চাননাজ্জয়রামো জয়রামান্নীলমণির্নীলমণে রামলোচনো রামলোচনাদ্দ্বারকানাথো নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যো নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যঃ।"[২]

পঞ্চানন যশোহর পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে গোবিন্দপুর গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার আশে পাশে জেলে, মালো, কৈবর্ত এবং পোদ জাতীয় অন্ত্যজদের বাস ছিল। ব্রাহ্মণ পঞ্চানন হইলেন এই অন্ত্যজদের 'ঠাকুর মশাই'। ক্রমে বিলাতী সাহেবদের নিকটও তিনি এই 'ঠাকুর' উপাধিতেই পরিচিত হইলেন। সেই হইতে এই বংশের উপাধি হইল ঠাকুর।[৩] পঞ্চাননের পুত্র জয়রাম সাহেব কোম্প্যানির কুঠীতে চাকুরি করিয়া পরে কলিকাতার প্রথম কালেক্টার কর্তৃক কলিকাতা জরিপ কার্যে আমীন নিযুক্ত হন। তাহাতে প্রচুর বিত্তসঞ্চয় হইলে তিনি বর্তমান গড়ের মাঠে বসতবাড়ি ও বৈঠকখানা এবং বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের জায়গায় বাগান-বাড়ি করেন। পরে ইংরেজেরা ঐ সব স্থান ক্রয় করিতে চাহিলে ক্ষতিপূরণ বাবত অনেক টাকা পাইয়া তিনি পাথুরেঘাটায় উঠিয়া যান। তাঁহার পুত্র নীলমণিও কালেক্টারের শেরেস্তাদারি করিয়া অনেক টাকা উপার্জন করেন, পরে অর্থ ও সম্পত্তি লইয়া ভ্রাতা দর্পনারায়ণের সঙ্গে কলহের ফলে নীলমণি জোড়াসাঁকোতে চলিয়া আসেন। সেই হইতে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির ইতিহাস আরম্ভ হইল। নীলমণির তিন পুত্র এক কন্যা। জ্যেষ্ঠপুত্র রামলোচন নিঃসন্তান ছিলেন। মধ্যম রামমণির দুই বিবাহ :—প্রথমা পত্নী মেনকা দেবীর গর্ভে দুই পুত্র ও দুই কন্যা, রাধানাথ, দ্বারকানাথ, জাহ্নবী ও রাসবিলাসী। রামলোচনের পত্নী অলকা দেবী মেনকা দেবীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। রামলোচন চারি-পাঁচ বৎসর বয়স্ক দ্বারকানাথকে দত্তক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন।

ঠাকুর-পরিবারের সংস্কৃতজ্ঞান, পাণ্ডিত্য এবং কবিত্বশক্তি বহু পুরুষ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ভট্টনারায়ণের বেণীসংহারের উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ অভিধান-রত্নমালা-রচয়িতা হলায়ুধ তাঁহারই অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ। ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব, ন্যায়, পণ্ডিত, শিব, মৎস্য, শাক্ততন্ত্র ও কবিরহস্য লিখিয়াও হলায়ুধ সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। জগন্নাথ 'পণ্ডিত-রাজ জগন্নাথ' বলিয়া খ্যাত ছিলেন। পুরুষোত্তম প্রয়াগরত্নমালা, ভাষাবৃত্তি, একসারকোষ

---

[২] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অজিতকুমার চক্রবর্তী, পৃঃ ৪

[৩] এই প্রসঙ্গে 'বংশ পরিচয়ে'র লেখক জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার বলেন, "তখন ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের অধীনে যে কোন ব্রাহ্মণ কার্য করিতেন, তাহাকেই 'ঠাকুর' অভিধা দেওয়া হইত। পণ্ডিত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্নও তাহার 'বংশাবলিচরিতম্' গ্রন্থিকায় লিখিয়াছেন, 'পঞ্চানন রাজসরকার হইতে 'ঠাকুর' উপাধি প্রাপ্ত হয়েন।'

গোত্রপ্রবরদর্পণ, মুক্তিচিন্তামণি, ত্রৈকাণ্ডশেষ, হারলতা ও হাবাবলী গ্রন্থনিচয়ের রচয়িতা। তৎপুত্র বলরামও প্রবোধপ্রকাশ লিখিয়া বংশের পাণ্ডিত্যখ্যাতি বর্ধন করেন। পঞ্চাননের পর হইতে এই বংশে ফার্সি ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রচলন হয়। নবাগত ইংরেজ বণিক ও শাসক সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসিয়া জয়রাম ও নীলমণি সাংসারিক অবস্থার ক্রমোন্নতি সাধন করেন—অর্থ এবং ভূসম্পত্তি উভয় দিক দিয়াই এই পরিবার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশের স্বাভাবিক অবস্থা অতিক্রম করে।

কিন্তু দ্বারকানাথই এই পরিবারকে রাজোচিত ঐশ্বর্যে বিভূষিত করিয়াছিলেন। অজিত চক্রবর্তী বলিয়াছেন, "দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইতিহাস আরব্য উপন্যাসের আলাদীনের প্রদীপের ইতিহাসের মত রোমান্সে ভরা। কেবল তফাৎ এই যে, সে প্রদীপ তিনি দৈবক্রমে পান নাই। নিজের চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। যে সকল দরিদ্রলোক নিজের চেষ্টায় ক্রোড়পতি হইয়াছে এবং তারপর লাখ লাখ টাকা ভাল ভাল কাজে অকাতরে দান করিয়াছে, যেমন একালের কার্নেগি বা রকফেলারের জীবনে দেখা যায়, ঠিক তাহাদেরি মত অসাধারণ বৈষয়িক প্রতিভা দ্বারকানাথ ঠাকুরের ছিল।" একান্ন বৎসরের অনতিদীর্ঘ জীবন তাঁহার [জন্ম১৭৯৬ মৃত্যু ১৮৪৬]। কিন্তু কি অপূর্ব বৈচিত্র্য এবং বিরাটত্বে তিনি জীবনকে উপভোগ করিয়াছিলেন তাহা ভাবিতেও বিস্মিত হইতে হয়। বস্তুত ইংরেজদের আগমনে বাঙলাদেশে জীবনের যত দিক উদ্ঘাটিত হইয়াছিল তার প্রত্যেকটিকে আত্মসাৎ করিবার কি অপ্রতিহত প্রয়াস এবং অভাবনীয় সাফল্য তাঁহার জীবনে লক্ষ্য করা যায়। একদিকে সাহেবদের মত ব্যবসাবাণিজ্য, নীল ও রেশমের কুঠী প্রতিষ্ঠা, কয়লার খনি ও চিনির কারখানা পরিচালনা অন্যদিকে এদেশীয় অভিজাতবংশীয়দের মত বিরাট ভূসম্পত্তিস্থাপন এবং বিলাসবৈভবে জীবন যাপন, একদিকে রাজকীয় কর্মে উৎসাহ এবং ইংরেজমহলে অপরিসীম সম্মানপ্রতিপত্তি অন্যদিকে শাসকগণের অন্যায় আইনকানুনের বিরুদ্ধে নির্ভীক ও তীব্র আন্দোলন, একদিকে বৈঠকখানা ও বেলগাছিয়া ভিলায় য়ুরোপিয়ানার চূড়ান্ত অন্যদিকে সমাজসংস্কারব্রতে দুর্দমনীয় নিষ্ঠা;—প্রতিমুহূর্তে উদ্যম, প্রতিমুহূর্তে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রতিমুহূর্তে জীবনরসধারা পানে আকণ্ঠ পরিতৃপ্তি;—জীবনের এমন বিচিত্র ও বিরাট উন্মেষ এদেশের সার্থকনামা পুরুষদের মধ্যেও অল্পই দেখা গিয়াছে। তাঁহার জীবনপ্রভাত ও জীবনসন্ধ্যার অবস্থাবৈষম্য লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে তিনি লক্ষ্মীর ঝাঁপি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু এই উদ্যোগী পুরুষসিংহের কাছে লক্ষ্মী আপনি আসিয়া ধরা দিয়াছিলেন। তেরো চৌদ্দ বৎসর বয়সেই পিতৃবিয়োগের ফলে দ্বারকানাথকে ভাগ্যান্বেষণে প্রবর্তিত হইতে হয়। সাহেবদের সঙ্গে পরিবারের ঘনিষ্ঠতা পূর্বেই ছিল। সেই অল্পবয়সেই কিশোর দ্বারকানাথ তৎকালীন সওদাগরি অফিস ম্যাকিন্টশ কোম্প্যানির গোমস্তারূপে [এবং পরে স্বাধীনভাবে] রেশম ও নীলের ব্যবসায়ে বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করেন। নদিয়া ও পাবনা জেলার বিরাহিমপুরে পৈত্রিক জমিদারি

পর্যবেক্ষণ করিতে আসিয়া আইনশিক্ষার আবশ্যকতার প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি পড়ে। খ্যাতনামা ব্যারিস্টার ফার্গুসন সাহেবের নিকট আইনের জ্ঞান অর্জন করিয়া অল্পদিনের মধ্যে তিনি নিজেই আইনের অভিজ্ঞ পরামর্শদাতা হইয়া উঠিলেন; এবং স্বচ্ছন্দে বাঙলা ও বাঙলার বাহিরের রাজামহারাজা ও ভূস্বামীদের হইয়া আদালতে বিচক্ষণতার সহিত মোকদ্দমা চালাইতে লাগিলেন। এই ভাবে এক হাতে আইনের এজেন্সি এবং আর এক হাতে বাণিজ্যের এজেন্সি চলিতে লাগিল। এই প্রতিপত্তির ফলে রাজদ্বারেও সসম্মান আহ্বান আসিল, ১৮২৩ সালে তিনি চব্বিশ পরগণার কালেক্টর ও নিমক-মহালের অধ্যক্ষের দেওয়ান বা শেরেস্তাদার নিযুক্ত হইলেন। ছয় বৎসর পরে শুল্ক নিমক ও অহিফেন বোর্ডের দেওয়ানগিরিতে তাঁহার পদোন্নতি হইল। ইতিমধ্যেই দ্বারকানাথ অর্থ ও ভূসম্পত্তিতে লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়া উঠিয়াছেন। এদেশীয় লোকেরা বিদেশী ব্যবসায়ীর শুধু গোমস্তা বা ভৃত্যস্থানীয় হইয়াই থাকিবে আত্মাভিমানী দ্বারকানাথের ইহা পরম লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে হইল। তিনি ১৮২৮ সালে ম্যাকিণ্টশ কোম্প্যানির অংশ ক্রয় করিয়া ইহার অংশীদার হইলেন। পর বৎসর য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ক নামে একটি ব্যাঙ্ক খোলা হইল এবং ১৮৩৪ সালে সরকারি কাজে ইস্তফা দিয়া দ্বারকানাথ ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সমানতালে চলিবার জন্য কার ঠাকুর কোম্প্যানি প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সময় হইতে ১৮৪২ সালে প্রথমবার য়ুরোপগমন পর্যন্ত সাত আট বৎসরের মধ্যে ব্যবসায়ের উত্থানপতন সত্ত্বেও দ্বারকানাথ একযোগে কার ঠাকুর কোম্প্যানি, য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ক, শিলাইদহে ও অন্যান্য স্থানে নীলের এবং কুমারখালিতে রেশমের কুঠী, রাণীগঞ্জে কয়লার খনি ও রামনগরে চিনির কারখানা চালাইতেছিলেন। জমিদারির দিক দিয়া, রাজসাহীতে কালীগ্রাম, পাবনায় শাহাজাদপুর, রংপুরে স্বরূপপুর, হুগলীতে মঙ্গলঘাট পরগনার তেরো আনা অংশ, দ্বাররাসিনী ও জগদীশপুর, যশোহরে মহম্মদশাহী এবং কটকে শবগড়া প্রভৃতি পরগণা ক্রয় করিয়া তিনি বাঙলার একজন শ্রেষ্ঠ ভূস্বামীর আসন অধিকার করিলেন। দ্বিতীয়বার য়ুরোপগমনের পূর্বে তিনি আই ডীন ক্যাম্পবেল সাহেবের সহযোগিতায় যে 'বেঙ্গল কোল কোম্প্যানি' স্থাপন করেন তাহাতে বার্ষিক ছয় কোটি মণের অধিক কয়লা তোলা হইত। দ্বারকানাথের এই অপরিমেয় সম্পত্তির কথা বলিতে গিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "তাঁহার ঐশ্বর্যের আমলে টাকার তোড়া গণিয়া না লইয়া ওজন করিয়া লওয়া হইত। এত টাকা।"

এইভাবে অর্থ, ভূসম্পত্তি এবং প্রতিপত্তির তুঙ্গশিখরে আরোহণ করার ফলে দ্বারকানাথের জীবনধারারও পরিবর্তন সাধিত হইল। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারে তাঁহার জন্ম। প্রথম জীবনে পাদ্রী উইলিয়াম অ্যাডামস এবং রামমোহন রায়ের উদার ধর্মজীবনের প্রভাব সত্ত্বেও তিনি বংশানুক্রমিক আচারনিষ্ঠাকে পালন করিয়াই চলিতেন; কিন্তু পরবর্তীকালে ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ সংস্রবের ফলে ঘনঘন পার্টি, বিলাতি খানাপিনা এবং বাগানবাড়িতে নাচগানমজলিশের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। লাট বড়লাট হইতে আরম্ভ করিয়া সাহেবদের আদর আপ্যায়নের জন্য

তিনি 'বেলগাছিয়া ভিলা'কে ইন্দ্রপুরী করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিশোরীচাঁদ বলিয়াছেন, Though situated in the eastern suburbs, the Belgatchiah Villa became the West End, the Kensington of Calcutta." দ্বারকানাথের পূর্ব পর্যন্ত ঠাকুর পরিবারে সাহেবসংস্পর্শ শুধু চাকুরিগ্রহণ ও বিত্তার্জন পর্যন্তই পর্যবসিত ছিল, দ্বারকানাথ হইতে সে সংস্রব ঠাকুরদের জীবনধারায়ও প্রভাবশীল হইতে লাগিল। শুধু 'বেলগাছিয়া ভিলা'ই নহে, জোড়াসাঁকোর বাড়ির পাশেই [বর্তমান দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের পাঁচ নম্বরের বাড়ি] বৈঠকখানা স্থাপিত হইল এবং সেখানেও বেলগাছিয়া ভিলার মত বিজাতীয় আহারবিহার এবং নৃত্যামোদ প্রভৃতি চলিতে লাগিল। এই আকস্মিক পরিবর্তনে পরিবারের চিরাচরিত ধর্মনিষ্ঠার সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি হইল। পত্নী দিগম্বরী দেবী "স্বামীর সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া, ব্রহ্মচর্য অবলম্বনে জীবন নির্বাহের ব্রত ধারণ করিয়া, মৃত্যুর দ্বারা তাহা উদ্‌যাপন" করিলেন। অপরিসীম ঐশ্বর্যের অবশ্যম্ভাবী আনুষঙ্গিক হিসাবে এই বিলাস দ্বারকানাথের জীবনের এক পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেও তিনি কখনো ইহাতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়াছেন বা অসংযত হইয়া পড়িয়াছেন এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কুহরে কুহরে তিনি জীবনের বিচিত্র রস আস্বাদন করিয়াছেন কিন্তু ঐশ্বর্য তাঁহার রসিকচিত্তকে কখনো নেশাগ্রস্ত করিতে পারে নাই।

শুধু বিত্তার্জন এবং বিলাসব্যসনই নয় জীবনের বিরাট অনুভূতিতে তিনি স্বীয় সমাজ ও দেশের দৈন্যদশা সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। রাজকার্যে লিপ্ত থাকা কালে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করিতে যেমন তিনি কার্পণ্য করেন নাই তেমনি শাসকগণের অন্যায় বিধানের তীব্র সমালোচনাও তিনি করিয়াছেন। নূতন ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারে এবং সর্ববিধ সমাজসংস্কারে তাঁহার বলিষ্ঠ সহযোগিতা এবং প্রভূত অর্থসাহায্য সে যুগের বাঙলার নবজাগরণের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। রামমোহন রায়ের জীবিতকালে এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে সতীদাহপ্রথা নিবারণ, সংবাদপত্রের মুখবন্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও তার স্বাধীনতা আনয়ন, হিন্দু কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ ও অর্থসাহায্য, মফঃস্বল পুলিসের সংস্কার এবং তার ফলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ প্রবর্তন প্রভৃতি কাজে তিনি সর্বদা অগ্রগণ্য ছিলেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন,

When Dwarakanath saw light, ignorance and superstition reigned rampant. The Hindu widows were immolated at the funeral pile of their husbands, the natives were Persecuted and proscribed as a subject race, the dark fatality of a dark skin crushed and kept them down; the crime of color was considered the most atrocious in the social and political code governing the country; the community was divided into Sahiblogues and the natives. These two classes

composing the dominant few, and the subject many, not understanding each other, were estranged and alienated. Now what did Dwarkanath leave behind? A Hindu College and a Medical College; the revolting rite of Suttee abolished and branded by law as murder; a Landholders' Society representing a most important interest in the country; steam communication; a free press, an uncovenanted judicial service a subordinate executive service, and a better understanding between the Natives and the Europeans,– being the first step to a fusion of the two races [*Memoir of Dwarkanath Tagore*, pp 23-24.]

এই সমস্ত কাজের মধ্যে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কিত আন্দোলনকে ভারতের প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন বলা যাইতে পারে। এবং এই আন্দোলনে দ্বারকানাথের স্থান সকলের পুরোভাগে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্বারকানাথ রামমোহনের ধর্ম গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু বর্তমান ভারতের জন্মদানব্রতে 'যুবরাজ' 'রাজা'র দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শাসকসম্প্রদায়ের মত পরিবর্তনে তাঁহার প্রভাব রামমোহনের চাইতেও অধিক কার্যকরী হইয়াছে। দেশহিতব্রতে দ্বারকানাথ ইংরেজদের উচ্ছেদ কামনা করেন নাই, কিন্তু কালা আদমি বলিয়া, অসভ্য বলিয়া, বিজিত জাতি বলিয়া ইংরেজ ভারতবাসীর মনুষ্যত্বের অমর্যাদা করিবে ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। ইংরেজের প্রতি ইংরেজের যে ব্যবহার, মানুষের প্রতি মানুষের যে ব্যবহার, ভারতীয় হিসাবে সেই ব্যবহারই তিনি দাবী করিতেন এবং পূর্ণমাত্রায় আদায় করিয়া লইতেন। দেশের সংস্কারকর্মেও দেশবাসী যাহাতে সেই অধিকার-লাভের উপযুক্ত হয় তার জন্য আজীবন তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও সামর্থ্যের দ্বারা দেশের আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

শুধু এদেশেই নহে, য়ুরোপেও তিনি ভারতবর্ষের মর্যাদাকে ওদেশের উচ্চতম সমাজস্তরে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতভূমির এই 'প্রিন্সে'র কুবেরের মত ঐশ্বর্য, রাজপুত্রের মত সৌন্দর্য, অসাধারণ বৈষয়িক মেধা এবং দুর্লভ কলানুরাগ ও সৌন্দর্যজ্ঞান দেখিয়া ইংলণ্ডের মহারাণী ও তাঁহার স্বামী হইতে আরম্ভ করিয়া য়ুরোপের অভিজাত ও বিলাসী সমাজের বহু নরনারী তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মনীষী ম্যাক্সমূলার যে ভাষায় তাঁহার প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা যে-কোনো অভিজাত দেশের কৃতী পুরুষের গৌরবের বিষয়। য়ুরোপের বিলাসী জীবন হয়ত দ্বারকানাথকেও বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল, এবং সেই জন্য তিনি প্রথমবার দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া আবার সেইখানে গিয়া শেষপর্যন্ত ইংলণ্ডের মাটিতেই দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি একবার বলিয়াও ছিলেন, অর্থ যার আছে তারই উপযুক্ত দেশ য়ুরোপ। বস্তুত সেখানে তাঁহার মাসিক খরচ ছিল এক লক্ষ টাকা। তথাকার ধনিক সম্প্রদায়ও তাঁহার এই বিলাসযজ্ঞে স্তম্ভিত হইয়াছিল। কিন্তু শুদ্ধমাত্র বিলাসব্যসনেরই কথা উল্লেখ করিলে তাঁহার প্রতি সুবিচার করা হইবে না। প্রকৃত কলারসিক

এবং সৌন্দর্যের পূজারীও তিনি ছিলেন। য়ুরোপের রম্যোত্থান ইতালির শহরগুলির চিত্র, ভাস্কর্য এবং নানা রকম শিল্পসৌন্দর্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার মুখে ফরাসি ও ইতালীয় সংগীত শুনিয়া য়ুরোপীয় সংগীতে তাঁহার অপ্রত্যাশিত দক্ষতায় ম্যাক্স্মূলার বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশানুরাগও সেই য়ুরোপীয় মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিল।

বস্তুত বাঙলা দেশের সামাজিক ইতিহাসে দ্বারকানাথের কাহিনী রূপকথার মতই রোমাঞ্চকর। কিন্তু, স্বাধীনতা ও সংস্কৃতিহীন মুমূর্ষু বাঙালীর সম্মুখে সার্থকভাবে বাঁচিয়া থাকার আনন্দের সন্ধান তিনি দিয়া গিয়াছিলেন। এই বিরাট পুরুষ বাঙালীর জীবনের একতারা যন্ত্রের উপর বহু বিচিত্র তারের সমাবেশ করিয়া ইহাতে যে বিভিন্ন রাগরাগিণী আলাপ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তারই পরিপূর্ণ সংগীত শুনিতে পাইলাম রবীন্দ্রনাথের জীবনবীণাযন্ত্রে।

দ্বারকানাথের জীবনে যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে [১৮১৭-১৯০৫] বিশেষভাবে তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। পিতার উদারচিত্ততা ও বদান্যতা, স্বদেশানুরাগ ও লোকহিতব্রত, সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও রসগ্রাহিতা, সংগীত ও শিল্পানুরাগ দেবেন্দ্রনাথ পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন। কিন্তু জীবনের এই সকল ভাবতরঙ্গিনী যে অধ্যাত্ম অনুভবের অকূল সিন্ধুতে মিলিত হয় সে অনুভব দ্বারকানাথের ছিল না, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ ভাবেই ছিল। এই দিক দিয়া পিতৃজীবনের পরিপূরক হিসাবে পুত্রের জীবন বিশেষ মূল্যবান। দেবেন্দ্রনাথের শৈশব হইতেই দ্বারকানাথের ভাগ্যলক্ষ্মীর অকৃপণ প্রসাদবিতরণের সূত্রপাত। সুতরাং প্রথম যৌবনে পৈত্রিক বিলাসব্যসনের প্রভাব দেবেন্দ্রনাথের উপর পড়া অস্বাভাবিক নহে। সত্যসত্যই কলিকাতার ধনীমহলে তাঁহার "বাবু" খ্যাতিও রটিয়া গিয়াছিল। উৎসবাদিতে তাঁহার সাজসজ্জা অন্যের ঈর্ষা ও অনুকরণের বিষয় হইত। একবার সরস্বতী পূজায় তিনি প্রায় একলক্ষ টাকা খরচ করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। ১৮৩৪ সালে [দেবেন্দ্রনাথের বয়স ১৭ বৎসর] দ্বারকানাথ যখন 'কার ঠাকুর কোম্প্যানি' খুলিলেন তখন হইতেই বিলাসিতা এবং আনুষঙ্গিক উচ্ছৃঙ্খলতা দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হইতে দেখা গেল। অনেক সময় সামাজিকতার অনুরোধে পিতৃপ্রদত্ত ভোজসভায় খানাপিনা, বাইনাচ ও সুরাপানের সংস্রবে দেবেন্দ্রনাথকে পিতার সঙ্গে যাইতে হইত। "কিশোর দেবেন্দ্রনাথ এইরূপে প্রলোভনের অনলে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ইহার ফলে সুরা, নাচ ও ধনীপুত্রদিগের কুসঙ্গ কিছুকালের জন্য তাঁহাকে অধিকার করিল।" কিন্তু এই উচ্ছৃঙ্খলতা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। পরবৎসর ১৮৩৫ সালে পিতামহীর মৃত্যুতে দেবেন্দ্রনাথের জীবনের আমূল

পরিবর্তন হইতে দেখা গেল। আমাদের মনে হয়, দেবেন্দ্রনাথের জীবনে এই ক্ষণবিস্মৃতির প্রয়োজন ছিল। পরমার্থের পরম তৃষা গভীর করিবার জন্য অর্থের বিকৃতরূপের গভীরতম পরিচয় বিষয়বিতৃষ্ণার চরম ভূমিকা রচনা করিয়াছে।

'ক্ষণবিস্মৃতি' বলিলাম এইজন্য যে, বাল্যে দেবেন্দ্রনাথ এই বিলাসব্যসন হইতে দূরে ছিলেন। তিনি আশৈশব পিতামহীর [রামলোচন ঠাকুরের পত্নী অলকা দেবীর] নিকট শুদ্ধাচার ও সাত্ত্বিকতার মধ্যে প্রতিপালিত। পারিবারিক বৈষ্ণব ধর্মের আচারনিষ্ঠার প্রভাব তাঁহার উপর পড়িয়াছিল। তা ছাড়া পিতা বিষয়কর্মে লিপ্ত থাকিলেও পুত্রের সুশিক্ষার প্রতি অমনোযোগী ছিলেন না। গৃহশিক্ষকগণের নিকট ইংরেজি, বাঙ্‌লা ও ফার্সি ভাষা শিক্ষার যেমন বন্দোবস্ত ছিল তেমনি নিয়মমত সংগীতশিক্ষা ও শরীরচর্চার প্রতিও মনোযোগ দিতে হইত। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, গৃহে বিদ্যার্জন, সংগীত ও শিল্পচর্চার সহিত দেহ-গঠনের প্রতি যত্নের অভাব ঠাকুর-পরিবারে কোনো দিন হয় নাই বলিয়াই যেমন দেবেন্দ্রনাথ তেমনি তাঁহার পুত্র রবীন্দ্রনাথও অসাধারণ মনীষার সঙ্গে সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম ও আয়াসসাধ্য সুঠাম দেহ, অটুট স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘজীবনের অধিকারী হইয়াছিলেন।

পারিবারিক শিক্ষা ব্যতীত বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের জন্য দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে রামমোহন রায়ের স্কুলে ভর্তি হইয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ও রামমোহনের সমপ্রাণতার ফলেই এই ব্যবস্থা হইয়াছিল ; তারপরে রামমোহন ১৮৩০ সালে যখন বিলাত যাত্রা করেন তখন তাঁহার স্কুলে সুপরিচালনার অভাব হওয়াতে দেবেন্দ্রনাথকে তৎকালীন বিশিষ্ট শিক্ষায়তন 'হিন্দু কলেজে' ভর্তি হইতে হইল। রামমোহনের স্কুলে ভর্তি হওয়ার ফলে রামমোহনের প্রভাব দেবেন্দ্রনাথের উপর সঞ্চারিত হওয়ার বিশেষ সুযোগ হইয়াছিল, সেই জন্যই যখন তিনি হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন তখন ডিরোজিয়োর শিক্ষাপ্রভাব তাঁহার উপর পড়িতে পারে নাই। হিন্দু কলেজে তিন বৎসর থাকার পর দ্বিতীয় শ্রেণী হইতেই তাঁহাকে কলেজের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পিতার বিষয়কর্মে যোগদান করিতে হইল। সতেরো বৎসর বয়সে দেবেন্দ্রনাথ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সহকারী কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন এবং পর বৎসর (১৮৩৫) পিতা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণে বহির্গত হইবার পূর্বে পুত্রের উপর গৃহসংসার পরিচালনার গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করিয়া গেলেন। এই জন্য অবশ্য পারিবারিক এবং সামাজিক আবেষ্টনীও বিশেষভাবে দায়ী ছিল। একদিকে হিন্দুপরিবারের আচারনিষ্ঠা অন্যদিকে পিতৃরচিত আমোদপ্রমোদের উচ্ছলতা, একদিকে স্বগৃহে প্রতীকোপাসনার আড়ম্বর অন্যদিকে রামমোহনের 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্মে'র উদ্বোধন—পরিবার ও সমাজের এই সন্ধিলগ্নে কিশোর দেবেন্দ্রনাথের মন আদর্শবিপর্যয়ের আলো-অন্ধকারের মধ্যে আন্দোলিত হইতেছিল। অবশেষে পিতামহীর শ্মশান-শিয়রে বসিয়া তাঁহার জীবনের অধ্যাত্ম-মহলের সিংহদ্বার উন্মোচনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। শৈশবে একদিন তিনি অনন্ত আকাশের পানে চাহিয়া যে অনন্তের আভাস পাইয়াছিলেন, পিতামহীর মৃত্যুর পূর্বরাত্রিতে নিমতলার

অভিষিক্ত হইলেন। তারপর হইতে চলিল এই আনন্দের এই অমৃতের উৎস সন্ধান। সঙ্গে সঙ্গে আসিল বিষয়কর্মে ঔদাসীন্য। আরম্ভ হইল জ্ঞানের তপস্যা। দেবেন্দ্রনাথ সংস্কৃত শিখিয়া প্রাচীন ভারতের আর্য শাস্ত্রের মধ্যে সত্যসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ইংরেজি দর্শনশাস্ত্র মন্থন করিয়া লক্ ও হিউমের চিন্তার অসারতা প্রমাণে তৎপর হইলেন। কিন্তু পরম তৃষার নিবৃত্তি হইল না। অবশেষে একদিন তাঁহার কাছে রামমোহন প্রকাশিত ঈশোপনিষদের এক ছিন্ন পত্রে সেই অমৃতলোকের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়া গেল :

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

'বিশ্বজগতে যাহা-কিছু চলিতেছে, সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত দেখিতে হইবে—এবং তিনি যাহা যাহা দান করিয়াছেন, তাহাই ভোগ করিতে হইবে—অন্যের ধনে লোভ করিবে না।' এই মহাসত্যের সঙ্গে পরিচিত হইয়া তাঁহার মনে হইল 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্—যাহা দ্বারা আমি অমৃতা না হইব তাহা লইয়া আমি কি করিব ?' সঙ্গে সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের মন বিলাসের আনন্দ হইতে দূরে সরিয়া আসিল। ধর্মজীবনে পারিবারিক সংস্কার তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, রামমোহন প্রবর্তিত পথে তিনি অবশেষে উপনিষদের মধ্যে অধ্যাত্মজীবনের সন্ধান পাইলেন। জীর্ণ বস্ত্রের মত প্রাচীন সংস্কার পরিত্যক্ত হইল। আরম্ভ হইল নবজীবনের পথে নবীনের জয়যাত্রা। দেবেন্দ্রনাথ একে একে তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯), তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা (১৮৪০) এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩) প্রতিষ্ঠিত করিয়া নূতন সত্যের পথে ধর্ম ও সমাজপরিচালনার ব্রত গ্রহণ করিলেন। শুধু তাহাই নহে, নিজে ১৮৪৩ সালের ২১শে ডিসেম্বর [৭ই পৌষ] ব্রাহ্মধর্মে আনুষ্ঠানিক ভাবে দীক্ষা গ্রহণ করিতেও পশ্চাৎপদ হইলেন না। ইহা কম সাহসিকতা ও দৃঢ়চিত্ততার নিদর্শন নহে, কারণ তখনও পিতা দ্বারকানাথ জীবিত এবং ভারতবর্ষেই ছিলেন। [প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ঐ বৎসরই ফেব্রুয়ারি মাসে মধুসূদন খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।] দ্বারকানাথ পুত্রের ধর্মান্তরবরণ কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা জানিবার মত সঠিক প্রমাণপত্র কিছু আমাদের জানা নাই। তিনি তখন য়ুরোপের স্বপ্নে মশগুল ছিলেন। তবে তার তিন চারি বৎসর পূর্ব হইতেই বিষয়সম্পত্তি রক্ষা সম্পর্কে তিনি চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক' ও 'কার ঠাকুর কোম্প্যানি'তে তাঁহার আর্থিক দায়িত্ব অপরিসীম, 'ফেল' হইলে সমস্ত সম্পত্তি বিনষ্ট হইবে এই ভাবিয়া দ্বারকানাথ ১৯৪০ সালে 'Deed of settlement' সম্পাদন করেন; তাহাতে তাঁহার অধিকাংশ সম্পত্তির উপরে ট্রাস্টি নিযুক্ত করিয়া তাহা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তারপর প্রথমবার বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তনের পর দ্বারকানাথ ১৮৪৩ সালের আগস্ট মাসে [তখনও দেবেন্দ্রনাথ ধর্মান্তর গ্রহণ করেন নাই] উইল করিয়া যান। উইলে পূর্বকৃত 'Deed of settlement' স্বীকৃত ও দৃঢ়ীকৃত হয়। এই উইলে দ্বারকানাথ তিন পুত্র দেবেন্দ্রনাথ,

গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথকে সমান ভাগে বিষয় সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। তবে জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়াই হউক, বা বিশেষ স্নেহবশতই হউক, কার ঠাকুর কোম্প্যানির যে অর্ধাংশের মালিক তিনি ছিলেন তাহা শুদ্ধমাত্র দেবেন্দ্রনাথকেই দিয়া গিয়াছিলেন। এই উইল করিয়া দ্বারকানাথ দ্বিতীয়বার য়ুরোপ যাত্রা করেন এবং সেখানে ১৮৪৬ সালের ১লা আগষ্ট তাঁহার মৃত্যু হয়। বৈষয়িক বুদ্ধিতে প্রবীণ দ্বারকানাথ বুঝিয়াছিলেন, যে সব কারণে তাঁহার সারা-জীবনের ধনসম্পদ বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের অমনোযোগ তন্মধ্যে একটি। এই লইয়া তিনি মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বেও বিলাত হইতে দেবেন্দ্রনাথকে ভর্ৎসনা করিয়া পত্রে লিখিতেছেন "Your time I am sure being more taken up in writing for the newspapers and in fighting with the missionaries.. I hear of nothing going right. We are loosing every Lawsuit." [দ্রষ্টব্য, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী, পৃঃ ২২৪]

দ্বারকানাথ যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই হইল। তাঁহার মৃত্যুর অল্প দিনের মধ্যেই, ১৮৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে প্রায় এক সঙ্গেই য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার ঠাকুর কোম্প্যানির পতন হইল। দ্বারকানাথ যে বিরাট সম্পত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তার ধ্বংসস্তূপও হইল তেমনি বিরাট। হিসাব করিয়া দেখা গেল ঋণের পরিমাণ এক কোটি টাকা। দেবেন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিলেই উত্তমর্ণগণকে অনায়াসে ফাঁকি দিতে পারিতেন, দ্বারকানাথ Deed of settlement এ যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, ট্রাষ্ট সম্পত্তির উপর পাওনাদারদের কোনো হাত ছিল না। কিন্তু 'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্'—দেবেন্দ্রনাথের মনে উপনিষদের এই বাণীই চরম হইয়া উঠিল—'অন্যের ধনে লোভ করিবে না।' তিনি পাওনাদারদিগকে আহ্বান করিয়া সমস্ত সম্পত্তির তালিকা তাঁহাদের হাতে তুলিয়া দিলেন। এই অভূতপূর্ব সততায় পাওনাদারেরা বিস্মিত এবং সন্তুষ্ট হইলেন। সম্পত্তি পরিচালনা করিয়া ঋণশোধের ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহারা এক কমিটি গঠন করিলেন, এবং পরিবারের খোরপোষের জন্য বাৎসরিক পঁচিশ হাজার টাকা দিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু পাওনাদারদের হাতে গিয়া ঋণশোধের কোনো ব্যবস্থা হইল না; তখন তাঁহারা সমস্ত সম্পত্তি ফিরাইয়া দিয়া মালিকগণের উপরই ঋণশোধের ভার প্রদান করিলেন। সেই বিরাট ঋণ শোধ করিতে একে একে সব ঐশ্বর্য হেমন্তশেষের পক্বপত্রের মত খসিয়া পড়িতে লাগিল। "দ্বারকানাথ ঠাকুরের যখন মৃত্যু হয় তখন চল্লিশ লক্ষ টাকার বিষয় ছিল। সে সমস্ত জমিদারি গিয়া তিন লক্ষ টাকার বিষয় বাকি রহিল মাত্র।" [অজিত, ১৩৮] দেবেন্দ্রনাথ এই "বিশ্বজিৎ যজ্ঞে" সমস্ত দান করিয়া রিক্ত হইলেন। ব্যক্তিগত ব্যয়-সংকোচ চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছিল। ভবসিন্ধু দত্ত 'দেবেন্দ্রনাথের জীবনী'তে লিখিয়াছেন যাঁহার পিতার ডিনার তিন শত টাকার কমে হইত না, তিনি চারি আনার অধিক ডিনারে খরচ করিতেন না। কিন্তু সর্বরিক্ত হইতে চাহিয়াও সহজে দেবেন্দ্রনাথ রেহাই পাইলেন না, সমস্ত কিছু বিক্রয় করিয়াও মাত্র অর্ধেক ঋণ শোধ হইল, বাকি অর্ধেক শোধ করিতে তাঁহার আরো চল্লিশ বৎসর লাগিয়াছিল। ইতিমধ্যে ১৮৫৪ সালে মধ্যম ভ্রাতা এবং ১৮৫৮ সালে কনিষ্ঠ ভ্রাতারও মৃত্যু হইল। যে বিষয়কর্ম হইতে দেবেন্দ্র-

নাথ মুক্তি কামনা করিয়াছিলেন তাহা হইতে মুক্তি সহজলভ্য হইল না। এমন কি মধ্যম ভ্রাতার মৃত্যুর পর, ১৮৫৫ সালে, এক পাওনাদারের চৌদ্দ হাজার টাকার ওআরেণ্টে তিনি গ্রেপ্তার পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। এইভাবে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়া পিতৃঋণের দায় হইতে দেবেন্দ্রনাথ মুক্ত হইলেন। পিতার প্রতিশ্রুত ডিষ্ট্রিক্ট্ চ্যারিটেব্‌ল্ সোসাইটিতে এক লক্ষ টাকা দানকে পিতৃঋণ মনে করিয়া তিনি তাহা সুদ সুদ্ধ পরিশোধ করিলেন।

এই বিপুল ঐশ্বর্য-বিপর্যয় দেবেন্দ্রনাথের মনের উপর কোনো হতাশার ছাপ ফেলিয়া যাইতে পারে নাই ; বরং তিনি অর্থের ভার লাঘব করিতে পারিয়া সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন। পিতাপুত্রের পার্থক্য এইখানেই। পিতা চাহিয়া ছিলেন অর্থ, পুত্রের কামনা ছিল পরমার্থ। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন, "দ্বারকানাথ সংসারের মানুষ ছিলেন, মানব প্রেমিক ছিলেন, সর্বশ্রেণীর মানুষদের লইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। দেবেন্দ্রনাথ ধর্মের মানুষ ছিলেন, ঈশ্বরপ্রেমিক ছিলেন, ঈশ্বরপ্রেমিকদের লইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। বিষয়পরিচালনে দ্বারকানাথের বুদ্ধি এবং অনুরাগ উভয়ই প্রকাশ পাইত ; দেবেন্দ্রনাথ বিষয়পরিচালনে বুদ্ধি প্রয়োগ করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণ পড়িয়া থাকিত ঈশ্বরে।" *

শেষের উক্তিটি অনুধাবন করিতে পারিলেই দেবেন্দ্রনাথের বিষয়বৈরাগ্যের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইবে। 'মহর্ষি' বিশেষণে দেবেন্দ্রনাথকে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। বিশ্বসংসারকে বর্জন করিয়া গুহাযিত সাধনা তাঁহার ছিল না। 'অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়' মুক্তির আস্বাদন তিনি পাইয়াছিলেন। সেই জন্যই সংসারকে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে রাখিয়া তিনি বাহিরে সংসারী এবং অন্তরে সন্ন্যাসী সাজিয়াছিলেন। বিশ্বের মধ্যেই বিশ্বেশ্বরের 'সত্য শিব সুন্দর' মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করিবার শিক্ষা তিনি উপনিষদ্ হইতে পাইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রের এই দিক রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্যসাধনায় সব চাইতে বেশি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

সংসারধর্ম ও সংসারকর্ম দেবেন্দ্রনাথ কর্তব্য জ্ঞানেই সমাপন করিতেন। তাহাতে তাঁহার অনাসক্তি থাকিলেও বিতৃষ্ণা ছিল না। দেবতার উপাসনার মতই তাঁহার সমস্ত কর্ম পরিপাটি ও সুশৃঙ্খল ছিল। যেমন-তেমন করিয়া কাজ করিবার মত লোক তিনি ছিলেন না। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "তাহার সংকল্পে, চিন্তায়, আচরণে ও অনুষ্ঠানে তিলমাত্র শৈথিল্য ঘটিবার উপায় থাকিত না।" সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে কর্মে পরিশৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা দেবেন্দ্রনাথের নিকট হইতে রবীন্দ্রনাথ উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন।

রামমোহন রায়ের পরলোকপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরে ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজ পরিচালনার ভার দেবেন্দ্রনাথ সানন্দে স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপনিষদের অনুবাদ ও প্রচার, সমাজে প্রকাশ্যে বেদপাঠের ব্যবস্থা, ব্রহ্মোপাসনাপদ্ধতি রচনা, ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন, বেদশিক্ষায় উৎসাহ

* শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৩০২-৩। প্রসঙ্গক্রমে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই প্রবন্ধ রচনায় আমি গ্রন্থকারের 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন চরিত ও পত্রাবলী' নামক এখনো অপ্রকাশিত বিরাট গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠেও বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

বাঙলা ও বাঙলার বাহিরে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার প্রভৃতির দ্বারা তিনি রামমোহনের মানস-সন্তানের পরিচর্যা ও প্রতিপালন করিয়াছিলেন। প্রধানত ধর্মান্দোলনে নিযুক্ত থাকিলেও তৎকালীন বিভিন্ন সমাজসংস্কার কার্যে তাঁহার আর্থিক ও আত্মিক সহযোগিতা সব সময়ই ছিল। পিতৃ-সম্পত্তি জীর্ণ হইলেও পিতার দানবৃত্তি তিনিও পাইয়াছিলেন। অজিত চক্রবর্তী লিখিয়াছেন, "শোনা যায় যে, জীবনে সব সুদ্ধ তিনি ২২ লাখ টাকা দান করিয়াছিলেন।" তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিগত শতাব্দীর পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে বাঙলার প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করিয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন, বিধবাবিবাহ প্রচলন প্রভৃতিতে তিনি কাহারো পশ্চাতে ছিলেন না। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের তিনিই ছিলেন প্রথম সম্পাদক। বিখ্যাত 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্র তাঁহারই অর্থে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালেও কংগ্রেসি আন্দোলনে তাঁহার আর্থানুকূল্যের কখনো অসদ্ভাব ঘটে নাই। অবশ্য তাঁহার সংস্কারের আদর্শ বিপ্লবমূলক ছিল না, সমাজ সংস্কারেও বার্কের মত রক্ষণশীল পন্থারই তিনি পক্ষপাতী ছিলেন।

পরিবারের প্রতি কর্তব্যপালনেও তাঁহার কখনো ত্রুটি হয় নাই। বিষয়লিপ্সা না থাকিলেও বৈষয়িক জ্ঞান তাঁহার বৃদ্ধ বয়সেও প্রখর ছিল। জীবিত ও মৃত পনোরোটি সন্তানের তিনি জনক ছিলেন। যখনই যেখানে থাকুন না কেন, সন্তানদের প্রতি, পরিবারের প্রতি তাঁহার সর্বদা দৃষ্টি থাকিত। পরিণত বয়সেও হিসাব পত্রের প্রতি তিনি লক্ষ্য রাখিতেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন; "তখন তিনি পাক ষ্ট্রীটে থাকিতেন। প্রতি মাসের ২রা ও ৩রা আমাকে হিসাব পড়িয়া শুনাইতে হইত। তখন তিনি নিজে পড়িতে পারিতেন না। গত মাসের ও গত বৎসরের সঙ্গে তুলনা করিয়া সমস্ত আয়ব্যয়ের বিবরণ তাঁহার সম্মুখে ধরিতে হইত। * * যেখানে ছিদ্র পড়িত সেই খানেই তিনি ধরিতে পারিতেন। এই কারণে মাসের ঐ দুটা দিন বিশেষ উদ্বেগের দিন ছিল।"

শুধু বৈষয়িক জ্ঞানই নহে, জাগতিক এবং পারমার্থিক জ্ঞানমাত্রেই তাঁহার গভীর অনুরাগ ও প্রবল উৎসাহ ছিল। ইংরেজি, ফার্সি, সংস্কৃত ও বাঙলা ভাষা তিনি শুধু আয়ত্তই করেন নাই, মাতৃভাষার মত আত্মসাৎ করিয়া লইয়া ছিলেন। হিন্দিতে তিনি বক্তৃতা দিতে পারিতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি মূল ফরাসি হইতে ভিক্টর কুজ্যাঁর সত্য শিব সুন্দরের আলোচনাগ্রন্থ অধ্যবসায়ের সঙ্গে পাঠ করিয়াছেন। সংস্কৃতের মধ্য দিয়া প্রাচীন ভারতের ঋষিগণের সঙ্গে যেমন তাঁহার গভীর একাত্মতা জন্মিয়াছিল তেমনি ফার্সি ভাষার ভিতর দিয়া তিনি সুফী সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ কবি হাফেজের গজলে ভগবৎপ্রেমামৃতের আস্বাদন পাইয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যাত্মজ্ঞানের উৎস যেমন ছিল উপনিষৎ তেমনি তাঁহার ভগবৎ প্রেমোন্মাদনার অনুক্ষণ সঙ্গী ছিল হাফেজের সংগীত। ধর্মজীবনে রবীন্দ্রনাথ পিতার এই উভয় দিকেরই উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, তবে প্রেমভক্তির দিক দিয়া তিনি হাফেজের চাইতে মধ্যযুগের ভারতীয় মরমী ভক্তদের সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠতা অর্জন করিয়াছিলেন।

ঐহিক জ্ঞান সঞ্চয়েও দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহ ছিল অসাধারণ। রবীন্দ্রনাথকে লইয়া যখন তিনি হিমালয়ে বেড়াইতে গিয়াছেন তখনও গিবনের দ্বাদশখণ্ড 'ডিক্লাইন এণ্ড ফল্ অব রোমান্ এম্পায়ার' তাঁহার সঙ্গী। তাঁহার বৃদ্ধবয়সে 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি' পত্রে টেনিসনের নূতন কবিতা প্রকাশিত হইলে তিনি তাহা পড়িয়া তরুণ বন্ধুদিগকে পড়িতে অনুরোধ করিতেন। আমিয়েলের জার্নাল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অনেক স্থান তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। হেকেলের বিবর্তনতত্ত্ব, হার্বার্ট স্পেন্সারের 'প্রাথমিক সূত্রাবলী' প্রভৃতি তিনি মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করিতেন। একবার দার্জিলিং বাস কালে নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সন্ধান পাইয়া তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবার জন্য তিনি জগদীশচন্দ্রকে সেখানে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি' বিষয়ে তিনি যে উপদেশগুলি দিয়াছিলেন তাহাতে জ্যোতির্বিজ্ঞান ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁহার অসাধারণ অধিকারের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার এই জ্ঞানতপস্যা রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও আজীবন উজ্জীবিত ছিল।

পিতার পূতচরিত্রের এই সব গুণাবলীর নিঃশব্দ প্রভাব শোনিতসূত্রে সন্তানগণের উপর পতিত হওয়া যেমন স্বাভাবিক তেমনি বাল্যে ও যৌবনে সন্তানগণের চরিত্রগঠন ও জীবন-বিকাশের জন্য দেবেন্দ্রনাথ পিতৃকৃত্যেরও ত্রুটি করেন নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে তাঁহার ভগবদ্মুখিনতা তাঁহাকে সংসারবিমুখী করে নাই। পরিবারের সর্ববিধ কলাচর্চায় কখনোই তাঁহার অনুৎসাহ ছিল না। ঠাকুর পরিবারে সাহিত্যসাধনার প্রধান উৎস ছিলেন তিনি নিজে। প্রথম জীবনে তত্ত্ববোধিনী পরিচালনে অক্ষয় দত্তের ভাষাগঠনে তাঁহার হস্তক্ষেপ অল্প ছিল না। বাঙলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার আত্মজীবনীর স্থানও নগণ্য নহে। সন্তানগণের সাহিত্যচর্চায় দূর হইতে উৎসাহ দিয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন না, তাহাদিগকে পরিচালিতও করিতেন। সংস্কৃত শ্লোকের বিশুদ্ধ উচ্চারণে তিনি তাহাদিগকে শৈশব হইতেই অভ্যস্ত করাইতেন। তাহার প্রিয় জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে তিনি যে উপদেশ প্রদান করিতেন তাহাদিগকে সেগুলি লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইতে হইত, লেখা ভালো হইলে তিনি উৎসাহদানে কার্পণ্য করিতেন না। এই ভাবেই হিমালয় ভ্রমণকালে বারো বৎসর বয়সে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যরচনা 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে'র গোড়াপত্তন হইয়াছিল। পরে একবার স্বরচিত গান পিতৃদেবকে শুনাইয়া পারিতোষিক স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ পাঁচশত টাকা পাইয়াছিলেন। পুত্রকন্যাদের উৎসাহে 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশিত হইলে দেবেন্দ্রনাথ তাহা শুধু পাঠই করিতেন না, দাগ দিয়া পার্শ্বে মন্তব্য করিয়া সেগুলি তাহাদিগকে ফেরৎ পাঠাইতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববিদ্যা' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তিনি আগাগোড়া সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকাবলী প্রকাশিত হইলে তিনি যত্নের সহিত সেগুলির সমালোচনা করিয়া দোষগুণের প্রতি পুত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। সংগীতের দিক দিয়াও দেবেন্দ্রনাথের অনুরাগ স্বল্প ছিল না। 'মনে কর শেষের সে দিন ভয়ংকর' এর

মত মোহমুদ্গর জাতীয় ভয়ংকর ব্রহ্মসংগীতের মধ্যে তাঁহারই ঐকান্তিকতায় প্রথম প্রেমমন্দাকিনী উৎসারিত হইয়াছিল। ঠাকুর পরিবারে নাট্যচর্চার কথা বাংলাদেশে সুবিদিত। পরিবারে নাট্যচর্চার সূত্রপাতে দেবেন্দ্রনাথ নিরুৎসাহ প্রদান করেন নাই। ১৮৬৭ সালে যখন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ রামনারায়ণের 'নব-নাটক' বাড়িতে অভিনয় করিবার ব্যবস্থা করেন তখন দেবেন্দ্রনাথ নাটোর হইতে তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করিয়া লিখিয়াছিলেন,

"প্রাণাধিক গণেন্দ্রনাথ, তোমাদের নাট্যশালার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, সমবেত বাদ্য দ্বারা অনেকের হৃদয় নৃত্য করিয়াছে, কবিত্বরসের আস্বাদনে অনেকে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। নির্দোষ আমোদ আমাদের দেশের যে একটি অভাব, তাহা এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে। পূর্বে আমার সহৃদয় মধ্যম ভায়ার উপরে ইহার জন্য আমার অনুরোধ ছিল, তুমি তাহা সম্পন্ন করিলে। কিন্তু আমি স্নেহপূর্বক তোমাকে সাবধান করিতেছি যে, এ প্রকার আমোদ যেন দোষে পরিণত না হয়। সদ্ভাবের সহিত এ আমোদকে রক্ষা করিলে আমাদের দেশে সভ্যতার বৃদ্ধি হইবে তাহার সন্দেহ নাই।"

এই পত্রে একটি কথা লক্ষ্য করিবার বিষয় :—এ প্রকার আমোদ যেন দোষে পরিণত না হয়।—এই আশঙ্কা দেবন্দ্রনাথের ছিল। পিতা দ্বারকানাথের পরে দেবেন্দ্রনাথ পরিবারে শুদ্ধাচার অনয়নে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার অবর্তমানে তিনি পারিবারিক উপাসনার ভার জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবীর উপর দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে পরিবারের লোকের উৎসাহের অভাবই পরিলক্ষিত হইত।

সন্তানগণের এই মনোভাব দেবেন্দ্রনাথের দুঃখের কারণ হইলেও তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া কাহারো ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে জানিতেন না। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "তিনি আমাদের সম্মুখে জীবনের আদর্শ ধরিয়াছিলেন কিন্তু শাসনের দণ্ড উদ্যত করেন নাই।"

জীবিত সন্তানগণের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বলিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের স্নেহদৃষ্টি সর্বাধিক থাকা অস্বাভাবিক নহে। সৌদামিনী দেবী লিখিতেছেন, "রবির অন্নপ্রাশনের যে পিঁড়ির উপরে আল্পনার সঙ্গে তাহার নাম লেখা হইয়াছিল, সেই পিঁড়ির চারিধারে পিতার আদেশে ছোট ছোট গর্ত করানো হয়। সেই গর্তের মধ্যে সারি সারি মোমবাতি বসাইয়া তিনি আমাদের তাহা জ্বালিয়া দিতে বলিলেন। নামকরণের দিন তাহার নামের চারিধারে বাতি জ্বলিতে লাগিল। রবির নামের উপরে সেই মহাত্মার আশীর্বাদ এই রূপেই ব্যক্ত হইয়া ছিল।" [পিতৃস্মৃতি, প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩১৮] অবশ্য রবীন্দ্রনাথের শৈশবে দেবেন্দ্রনাথ বেশির ভাগ সময়ই হিমাচল ভ্রমণে তন্ময় থাকিতেন। রবীন্দ্রনাথের বারো বৎসর বয়সে দেবেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসার পর রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পিতার হিমালয় ভ্রমণ প্রভৃতির কথা 'জীবনস্মৃতি'তে সবিশেষ বর্ণিত আছে। ঐ সময়ে [২৫ এপ্রিল, ১৮৭৩] বাক্রোটাশেখর হইতে দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লিখিতেছেন, "রবীন্দ্র এখানে ভাল আছে এবং আমার নিকট সংস্কৃত ও ইংরেজি অল্প অল্প পাঠ শিখিতেছে। ইহাকে ব্রাহ্ম ধর্ম ও পড়াইয়া থাকি।" প্রায় চারিমাস পিতার সঙ্গে থাকিবার

পর পিতৃঅনুচর কিশোরী চট্টোপাধ্যায়ের সহিত রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়ে থাকিলেও পুত্রের শিক্ষার প্রতি যে তাঁহার দৃষ্টি আছে তার প্রমাণ রাজনারায়ণকে লিখিত আরেকখানি পত্রে পাওয়া যায়। বাক্রোটাশেখর হইতেই ২৬শে জুলাই ১৮৭৪ সালে তিনি লিখিতেছেন, "রবীন্দ্রের ইংরেজি পড়া যে ভাল হইতেছে আমার এমন বোধ হয় না। তুমি তাহাকে শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবিদিগের এক ফর্দ করিয়া দিয়াছ। তাহা কি রবীন্দ্র আপনা আপনি পড়িয়া বুঝিতে পারিবে?" তারপর ১৮৭৫ সালের মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথের মাতা সারদা দেবীর মৃত্যু হয় তাঁহার যখন সতেরো বৎসর বয়স তখন মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের প্রস্তাবক্রমে তাঁহার বিলাত যাওয়া স্থির হইল। মাসকয়েক তাঁহার সঙ্গে আমেদাবাদে থাকিয়া ১৮৭৬ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তাঁহার সঙ্গেই বিলাত যাত্রা করেন। কিন্তু ১৮৮০ সালের মার্চ মাসে সত্যেন্দ্রনাথ যখন সপরিবারে বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন তাঁহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে ফিরিতে হইল। কেন রবীন্দ্রনাথ অকস্মাৎ ফিরিয়া আসিলেন তাহা জানা যায় নাই।

যাই হউক, দেশে ফিরিয়া আসিয়া রবীন্দ্রনাথ কয়েকমাস পরে, ব্যারিষ্টারি পড়িতে আবার বিলাত যাইবার জন্য পিতার আদেশ প্রার্থনা করিয়া পত্র লেখেন।

রবীন্দ্রনাথের অবশ্য সেবার বিলাত যাওয়া হয় নাই। কিন্তু সে প্রসঙ্গ উত্থাপনের স্থান ইহা নহে। এবিষয়ে সন্দেহ নাই যে, পুত্রের সম্পর্কে পিতার কর্তব্য করিতে দেবেন্দ্রনাথ সম্ভবমত কখনো শৈথিল্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার মহৎ চরিত্রই যেমন সন্তানদের সম্মুখে এক বিরাট আদর্শের মত ছিল, তেমনি তাঁহার অধ্যাত্মরসিক মনও তন্ময় তত্ত্বচিন্তার অবসরে তাহাদের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে কার্পণ্য করিত না। এবং এই জন্যই 'প্রবর্তিতো দীপ ই'ব প্রদীপাৎ' এক বিরাট জীবনের অনুভব জ্ঞানে ও সাধনায়, দেশহিতৈষণায় ও সমাজকল্যাণে, শিল্পে ও সৌন্দর্যবোধে, সাহিত্যে ও সংগীতে ক্রমবর্ধমান ভাস্বরতা লইয়া দ্বারকানাথ হইতে দেবেন্দ্রনাথে এবং দেবেন্দ্রনাথ হইতে রবীন্দ্রনাথে সঞ্চারিত হইয়াছে।

বস্তুত ঠাকুর পরিবারের এই তিন পুরুষের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট হইবে যে, দ্বারকানাথ মহালক্ষ্মীর মন্দিরে যে আলোকবর্তিকা প্রোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে ঘৃতপ্রদীপের মহিমা প্রদান করিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ সেই পুণ্য-প্রদীপের আলোকেই ষোড়শোপচারে কলালক্ষ্মীর পূজারতি করিয়া গেলেন।

ভারতের সাধনা ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

প্রায় ২৭ বৎসরের কথা। শীতকাল। কয়েকজন আশ্রমবাসী কবিগুরুর সঙ্গে আলোচনা করিতেছিলেন, কিসে আমাদের দেশের সাধনার সমস্যার সমাধান হয়। নানা কথা হইল। এই প্রসঙ্গে কবিগুরু তখন বলিলেন, "আমাদের দেশের জ্ঞানে সাধনায়, সামাজিক জীবনে সর্বত্রই ক্ষুদ্রতা ও বিচ্ছিন্নতাকে দূর করতে হবে। আমাদের বুদ্ধির অভাব নেই। অভাব আমাদের চরিত্রের দৃঢ়-নিষ্ঠার, যার জন্য আমাদের সাধনার সংহতি দেখা দেয় না। বুদ্ধিমান গ্রীকরাও এই রোগেই একদিন মরতে বাধ্য হয়েছে। জ্ঞানে কর্মে প্রেমে ভূমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে কিছুতেই মানবাত্মার সার্থকতা নেই, আমাদের পরস্পরের মধ্যে যোগ যতই আচারে বিচারে স্বার্থবুদ্ধি ও অভিমানে বাধাগ্রস্ত হবে ততই নিরানন্দ অক্ষমতা ও দারিদ্র্য বেড়েই চলবে। ঐক্যবোধের সুযোগ রচনা করতে না পারলে কিছুতেই আমাদের কল্যাণ নেই। মহত্ত্বের সব তপস্যা তা হলে নিষ্ফল হবে।

আমরা যে কোনো কাজে হাত দেই তাতে দিনে দিনে বিশ্লিষ্টতা এসে পড়ে। এর মূলে ধর্মবুদ্ধির দুর্বলতা, সত্যের অভাব, ইচ্ছার জড়তা ও ত্যাগের কার্পণ্য। আমাদের শ্রদ্ধার বল নেই, তাই প্রত্যেকেই আত্মাভিমানবশে নিজের জন্য বৃহৎ অংশ চুরি করতে চেষ্টা করে। পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা আছে, ক্ষমা নেই, মঙ্গলবুদ্ধির উপর আমাদের দৃঢ়-নিষ্ঠার অভাব।

তাই সাবধান হতে হবে। ব্যর্থতা ঘটলে নির্বাক উপকরণগুলির উপর যেন অন্যায় রকমে দোষারোপ করে নিশ্চিন্ত না থাকি। যতদিন আমাদের জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান, প্রাণের সঙ্গে প্রাণ, চেষ্টার সঙ্গে চেষ্টা সম্মিলিত না হবে ততদিন সেই বিরাট পুরুষের আশীর্বাদ কেমন করে দাবী করতে পারবো? তা' হলে দিনে দিনে দুঃখদুর্গতি ও বিনাশের মধ্যে ক্রমেই ভীষণভাবে ডুবতে থাকবো, কেউ আমাদের বাঁচাতে পারবে না।"

ভারতীয় নৃত্য-কলার পুনরুজ্জীবনে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

আমাদেব দেশের নাচেব সম্বন্ধে আলোচনা করলে একটা প্রশ্ন বিশেষভাবে মনে জাগে। সেইটে হচ্ছে এই যে-নৃত্যকলাব চর্চ্চা এক সময়ে আমাদেব দেশে বহুল পরিমাণে হ'ত এবং যা' ছিল বাস্তবিকই আমাদের আনন্দ এবং গর্ব্ব কববাব জিনিষ তাব অধঃপতনেব হেতুটা কি ? অনেকে একথার জবাবে বলে থাকেন, মুসলমান সভ্যতার সংযোগই ভাবতীয় নৃত্যকলাকে ধ্বংসেব পথে টেনে এনেছিলো। কেননা, মুসলমান সভ্যতা নাকি খাঁটি ভাবতীয় নৃত্যেব আদর্শকে ঠিকমত গ্রহণ করতে পাবেনি। কিন্তু, স্থিব-চিত্তে বিচার করলে দেখতে পাবো যে কথাটা আংশিকভাবে সত্য হ'তে পাবে, সম্পূর্ণ সত্য নয। ভাবতীয় নৃত্যকলাব অধঃপতনেব জন্যে কেবলমাত্র মুসলমান সভ্যতাকেই দায়ী করা অসঙ্গত। মুসলমান সভ্যতাব সংযোগে ভাবতীয প্রাচীন নৃত্যাভিনয-পদ্ধতিব এবং আদর্শেব অনেক অদল-বদল হয়েছিল বটে কিন্তু পল্লীপ্রাণে নৃত্যেব যে প্রবল স্পন্দন চলেছিলো তা একটুও ব্যাহত হযনি। সেখানে মুসলমান সভ্যতা কোন ক্ষতি করেছিল বলে অন্তত ইতিহাসে আমরা নজীব পাই না। ববং দেখা গেছে কোন কোন-ক্ষেত্রে মুসলমানবাই সেই সব লোকনৃত্যে প্রধান অংশ গ্রহণ কবেছে। উত্তব ভাবতেব উচ্চশ্রেণীব নৃত্য "কথক" এব কথা এখানে উল্লেখ কবা যেতে পাবে,—যা' এক সময মুসলমানদেব পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কবেছে বলে শুনেছি। যদিও শ্রীকৃষ্ণেব প্রেমলীলাব কাহিনীই এ-নাচেব বিষয-বস্তু এবং হিন্দু নাচিয়েদেবই বেশী দেখা যেত এতে, তবুও মুসলমানেবা এই নৃত্যকে বর্জ্জন কবেনি, তাদেবও এ-নাচেব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ কবতে দেখা যেত। আজো বহু প্রকার লোকনৃত্য দেখি যা' মুসলমানদেব মধ্যেই প্রচলিত।

স্বীকাব করতে হবে, মুসলমান সভ্যতা ভাবতীয সংস্কৃতিব সকল বিভাগেই যুগান্তব এনেছিলো। সুতবাং একথা মনে করা অস্বাভাবিক যে মুসলমান সভ্যতার সংস্পর্শে ভাবতীয নৃত্যকলাব বেলায় কোনই পবিবর্ত্তন হযনি। এ সম্বন্ধে স্থিবচিত্তে পর্য্যালোচনা কবলে আমরা দেখতে পাই যে, মুসলমান সভ্যতাই প্রাচীন নৃত্যাভিনযকে কঠোব নিয়মের নিগড় থেকে মুক্তি দিযেছিল। যে-উদ্দেশ্য নিয়ে প্রাচীন হিন্দু নৃত্যে কড়াকড়ি নিযমেব জাল রচনা কবা হযেছিল, তা' সাধাবণ নাচিয়েদের অনুভবগম্য হল না, ফলে নৃত্যেব অবস্থা দাঁড়ালো খুবই শোচনীয় হয়ে। অর্থাৎ সেই অভিনযের সঙ্গে আব শিল্পীর প্রাণের যোগ লক্ষিত হ'ত না। তাতে দেখা গেল শুধু প্রাণহীন পদ্ধতির প্রতি অত্যধিক

আকর্ষণের মনোবৃত্তি। এই জন্যে সেখানে দুঃখ, শোক, বেদনা, ক্রন্দন সব-কিছুরই প্রকাশ একই রকমের। বিভিন্ন অনুভূতির প্রকাশ-ভঙ্গীতে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন আমরা কথাকলি নৃত্যে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করি। উপরোক্ত বিভিন্ন মনোভাবের স্বাভাবিক প্রকাশ যে বিভিন্ন রকমের সে বোধ নাচিয়েরা প্রায় হারিয়ে বসেছে।

মুসলমান সভ্যতা ভারতীয় নৃত্যে পরিবর্ত্তন এনেছিলো এই দিক দিয়ে অর্থাৎ নৃত্যকলায় চিত্তের স্বাভাবিক অভিব্যক্তিকে স্বাধীনতা দেবার পন্থা মুসলমান আমলে আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই যে পরিবর্ত্তন সে হ'ল যুগোপযোগী পরিবর্ত্তন,—যুগধর্ম্মের প্রভাবেই তা হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়—আজ আমরা কথাকলি নৃত্যকে প্রশংসা করি প্রাচীন লুপ্তপ্রায় নাচের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে। প্রায় সব বড়-বড় প্রতিষ্ঠানে এ-নাচের প্রচলনও হয়েছে কিন্তু, হুবহু অনুকরণ কোনখানে, হচ্ছে না, নাচিয়েরা ইচ্ছা করেই তা' করছেনা। এ ক্ষেত্রে এই মনোবৃত্তির স্বপক্ষে যুক্তি এই,— যুগধর্ম্মে এ বদল স্বাভাবিক, তা' না হলে চলে না। সুতরাং এইটেই ত সঙ্গত যে, আমরা প্রাচীনকে নিয়ে যা করবো তা হুবহু অনুকরণ নয়, তা' হবে সে-নাচকে অবলম্বন করে যুগোপযোগী নূতন সৃষ্টি।

মুসলমান সভ্যতাও ঠিক তাই করেছিল। এত বড় একটা সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ভারতীয় নৃত্যের যদি কোনো রূপান্তরই না হোতো তা হলে বলতাম ভারতীয় নৃত্য প্রাণহীন, নূতনকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা তার নেই, তার নিজস্ব সত্তাই নেই। কিন্তু ভারতীয় নৃত্য প্রাণধর্ম্মী ছিল বলেই নিয়মের অচলায়তন রচনা করে মুসলমান সভ্যতার সংস্পর্শ থেকে আত্মরক্ষা করবার উদ্দেশ্যে আত্মঘাতী পন্থা অবলম্বন করেনি। এক কথায় বলা যেতে পারে, মুসলমান সভ্যতা আমাদের দেশের নৃত্যে কৃত্রিমতার স্থলে স্বাভাবিকত্ব আনতে সক্ষম হয়েছিল। পরিবর্ত্তন যেটুকু হয়েছিল তা' প্রয়োজনের খাতিরেই। তখনকার মানুষ যা' চেয়েছিল তৈরি হয়েছিল তাই। সুতরাং মুসলমান-সভ্যতাকে ভারতীয় নৃত্যকলার অধঃপতনের জন্যে দায়ী করা অন্যায়।

ভারতীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে মুসলমান সভ্যতার অবদান অতুলনীয়। মুসলমানরা নিজেদের বা প্রিয়জনের স্মৃতিমন্দির রচনায় উৎসাহিত হয়ে নিজেদের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাই নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে তৈরি করতে চেয়েছে সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নৃত্যকলার বেলায়ও তা'রা এই আদর্শকেই গ্রহণ করেছে। হিন্দু বা বৌদ্ধ সভ্যতা যা কিছু সুন্দর বা শ্রেষ্ঠ তাকেই দেবতার ভোগের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতো, মুসলমান সভ্যতা করতো মানুষের ভোগের জন্যে। এই উভয় সভ্যতার মধ্যে কলাবিদ্যা এবং সংস্কৃতির দিক দিয়ে মূল পার্থক্য এইখানেই। তা' সত্ত্বেও মুসলমানরা ভারতীয় নৃত্যকলার বিকাশের পথে সহায়তাই করেছিল —সমাজের মর্ম্মমূলে আঘাত করে সমাজকে এদিক থেকে নির্জ্জীব করে দেয় নি।

ভারতীয় নৃত্যের সর্ব্বনাশ যদি কোন সভ্যতা করে থাকে তবে সে হচ্ছে এই দু'শো বৎসরের বিদেশী সভ্যতা। তারা আমাদের ভুলিয়ে দিয়েছিলো যে, আমরা নাচিয়ে-জাত, আমাদের উন্নত নৃত্যকলা আমাদের অমূল্য সম্পদ। কি উচ্চ শ্রেণীর নাচ, কি লোক-নৃত্য সবকিছুরই প্রতি বর্ত্তমান সভ্যতা আমাদের মনে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি করেছিল। ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের এতবড় সর্ব্বনাশ-সাধন আর কোনো সভ্যতার দ্বারা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু আমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে, এযুগে প্রথম রবীন্দ্রনাথ এই চেষ্টাই সুরু করেন বোঝাতে যে, সঙ্গীত এবং চারুকলার মত নৃত্যকলাও একটা নির্ম্মল আনন্দের জিনিষ এবং একে আমরা সে ভাবে গ্রহণ করে আবার আমাদের নিরানন্দময় সমাজকে প্রাণবান করে তুলতে চেষ্টা করবো। নৃত্যকলার পুনরুজ্জীবনে এইটেই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য, এবং এ কথা অনস্বীকার্য্য যে, তাঁর ইচ্ছা অনেকটা সফল ও হয়েছে। শিক্ষিত ভদ্র সমাজে নৃত্য আজ আর অপাংক্তেয়, অশ্রদ্ধেয় নয়। সুদূর আসামের মণিপুরী নৃত্য আর দক্ষিণী কথাকলি নৃত্যের অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় নৃত্যে যে যুগান্তর সৃষ্টি করেছেন, তা' শুধু তাঁর মত বিরাট প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব। "নটরাজ", "চিত্রাঙ্গদা", "নটীর পূজা", "শাপমোচন", প্রভৃতি নৃত্য-নাট্য রবীন্দ্র,-প্রতিভার অনবদ্য সৃষ্টি।

রবীন্দ্র-প্রয়াণে

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

জানি তুমি নাই আর এ মব জগতে ।
সব জেনে শুনে তবু বোঝে না যে প্রাণ;
তোমার জীবন দীপ হয়েছে নির্বাণ।
অশ্রুসিক্ত অন্তরেব পবতে পবতে
এখনো যে সমুজ্জল মূরতি তোমাব,
এখনো ধ্বনিছে কর্ণে সে অমিয় বাণী,
হে বিদেহী, দেহলোকে আছো তাই মানি
এখনো ঘোচেনি চিত্তে মায়াব বিকার।

ক্রমশ চেতনা জাগে, তুমি নাই বুঝি।
আব দেখিব না চোখে শুনিব না কানে,
তোমাব সোনাব বাংলা কী শূন্য শ্মশানে
পবিণত হেবি আজ। নিজ মনে যুঝি
আঁখি মুদি নিবখিতে চাই অন্তর্লোকে,
চিত্ত উদ্‌ভাসিত অস্ত ববিব আলোকে।

রবীন্দ্রকাব্যে ভূলোক ও দ্যুলোক

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-জীবনের সাধনা এক কথায় পূর্ণের সাধনা বা "ভূমার" সাধনা। বিশ্ব-প্রকৃতির থেকে, বিপুল মানবলোক থেকে বিচ্ছিন্ন খণ্ডিত হয়ে পূর্ণের সাধনা যে সম্ভব নয়, একথা বারে বারেই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে :

"বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।"

অসংখ্য বন্ধনের পথে, প্রেমের পথে কবি, চির জীবন চলেছেন 'মহানন্দময় মুক্তির' সন্ধানে। এ-পথ সহস্র মানবের স্নেহ-প্রীতি সুখদুঃখবেদনা-সমাকীর্ণ শ্যামলা ধরিত্রীর ধূলিময় পথ। মাটির সঙ্গে যোগহীন কোনো স্বপ্নস্বর্গের সন্ধানী নন বলেই নিয়ত ম্লান হয়েছে কবির কণ্ঠে 'মন্দার মালিকা'। "শোকহীন হৃদিহীন উদাসীন সুখস্বর্গভূমি"র প্রতি প্রাণের কোনো আকর্ষণ অনুভব করেন নি বলে সে-স্বর্গলোক থেকে অনায়াসে তিনি বিদায় নিয়েছেন এবং ফিরে এসেছেন হৃদয়ের নিবিড়তম আবেগে 'অশ্রুজলে চিরশ্যাম' আমাদের এই মর্ত্যে। তিনি জানেন :

"মর্ত্য ভূমি, স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি,—"

সেখানে

"স্নেহের ছায়ায়
দুঃখে সুখে ভয়ে ভরা প্রেমের সংসারে —"
(স্বর্গ হইতে বিদায়, চিত্রা)

মানবের গৃহেই তাঁর চির পরিচয়ের স্থান।

"এই যে কালো মাটির বাসা
শ্যামল সুখের ধরা —
এইখানেতে আঁধার আলোয়
স্বপন মাঝে চরা।
এরি গোপন হৃদয়-'পরে
ব্যথার স্বর্গ বিরাজ করে
দুঃখে-আলো-করা।"

স্বর্গের অন্বেষণে ঘুরে মরার আর কোন্ প্রয়োজন ?

তাঁর কাব্যে রবীন্দ্রনাথ নিয়ত ঘোষণা করছেন—তাঁর জীবনের চরমতম গৌরব—মানব-জন্মের গৌরব :

"লভিয়াছি জীবলোকে মানব-জন্মের অধিকার,
ধন্য এই সৌভাগ্য আমার।"

সেই ঈশ্বরদত্ত গৌরবের সার্থকতা কোথায় তারো সুনিশ্চিত নির্দেশ লাভ করি তাঁর ভাষায় :

"ধূলির আসনে বসি' ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে
আলোকের অতীত আলোকে।"
(বর্ষশেষ, পরিশেষ)

ইংরাজ কবির 'True to the kindred points of heaven and home' হবার সাধের এ কী সাধনা—গভীর বাঙ্‌ময়ী অভিব্যক্তি।

এই 'ধূলির আসনে' তিনি আসীন বলেই রবীন্দ্রনাথকে আমরা এত আপনার বলে অনুভব করি এবং তাঁর কাব্যে ভূমার যে প্রেরণা আমাদেরো তা এত অনুপ্রাণিত করে। বাস্তবিক রবীন্দ্রকাব্যে 'সুদূরের ডাক' বা 'অসীমের ডাক'ই একমাত্র সত্য নয়, কারণ সে আহ্বান 'নিকটে'র থেকে বা 'সীমা' থেকে বিযুক্ত হলে হবে একান্তই অসম্পূর্ণ আহ্বান। 'মাটি'র যে ডাক তাঁর কাব্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিহিত তার ঐকান্তিক আবেদন আমাদের হৃদয়ে রবীন্দ্রকাব্যের 'অনন্তের আহ্বান'কেই সম্পূর্ণতা দান করে এবং সার্থক ক'রে তোলে।

পৃথিবীর যে-সন্তান কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে এবং তাঁর হৃদয়ে হৃদয় মিলিয়ে বলতে পেরেছে

"আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে,
বিপুল অঞ্চল তলে। ওগো মা মৃণ্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হ'য়ে রই,—"
(বসুন্ধরা, সোনার তরী)

অথবা

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,—"

অথবা

"আজকে খবর পেলেম খাঁটি—
মা আমার এই শ্যামল মাটি,

অন্নে ভরা শোভায় নিকেতন ;
অভ্রভেদী মন্দিরে তার
বেদী আছে প্রাণ-দেবতার
ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন।"

(মাটির ডাক ; পূরবী)

তারই কণ্ঠে সার্থক সুরে ধ্বনিত হয় কবির গান

"আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী।"

তার প্রাণের সেই সুরে সুর মিলিয়ে তখন বুঝতে পারি

"সুদূর, বিপুল, সুদূর। তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই,
সে কথা যে যাই পাশরি'॥"

(উৎসর্গ, নং ৮)

এই সূত্রে 'উৎসর্গে'র ১৪ নং কবিতাটি—'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া'—মনে পড়ে। 'সোনার তরী'র 'বসুন্ধরা' কবিতায় মাটির সঙ্গে ও জীবজগতের সঙ্গে বিচিত্র ভঙ্গিতে কবির এক হয়ে মিশে যাবার আকাঙ্খার মূলে যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত পূর্বজন্মস্মৃতি নিহিত আছে এখানেও সেই স্মৃতি কবিকে আগ্রহে চঞ্চল করে তুলেছে

"তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা
লুটায় আমার সামনে;—
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
কেন যে ক'ব তা কেমনে ?
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি, কবে কোন্ ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে।
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে
লুটায় আমায় সামনে॥"

এই মূক মাটীর বন্ধন পরিপূর্ণ প্রাণের স্বীকার লাভ করেছে যার জীবনে, যে বলতে পেরেছে :

"এ সাত-মহলা ভবনে আমার
চির-জনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।

তার অন্তরেই অনায়াসে, ক্রমপরিণতির এক সুস্থ পরিবেশে এসে পৌঁছায় সমগ্র বিশ্বলোকের আহ্বান :

"বিশাল বিশ্বে চারি দিক হতে
প্রতি কণা মোরে টানিছে।
আমার দুয়ারে নিখিল জগত
শত কোটি কর হানিছে।"

সার্থক হয়ে ওঠে তার জীব জন্ম ; স্থান কালের বিপুল বিস্তৃত ক্ষেত্রে স্পন্দিত হ'তে থাকে সার্থকতার সে-বাণী :

"ধন্য রে আমি অনন্ত কাল,
ধন্য আমার ধরণী,
ধন্য এ মাটি, ধন্য সুদূর
তারকা হিরণ বরণী।
যেথা আছি আমি আছি তাঁরি দ্বারে,
নাহি জানি ত্রাণ কেন বলো কারে।
আছে তাঁরি পারে তাঁরি পারাবারে
বিপুল ভুবন তরণী।
যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি
ধন্য এ মোর ধরণী॥

(উৎসর্গ ; ১৪নং)

রবীন্দ্রকাব্য পাঠের সময় 'পৃথিবী'র এই ডাক এবং তারিপাশে অনন্ত বিশ্বের ডাক সর্বদাই আমার কাছে ধ্বনির পাশে প্রতিধ্বনির মতই প্রতিভাত হয়েছে। 'নিকটের' সঙ্গে 'সুদূরে'র আপাত যে-বিরোধ তাদের অন্তরের ঐক্যটিকে ঢেকে রাখে, সে-আবরণ মোচনের নিগূঢ় বাণীই রবীন্দ্রকাব্যের মূল বাণী বলে আমি বিশ্বাস করি। এই বোধ নিয়ে যখন রবীন্দ্রকাব্য পাঠ করি তখন 'চিত্রা' বা 'চৈতালি'র পাশে 'খেয়া' বা 'বলাকা' পড়তে আর কোনো দ্বিধা বোধ করি না।

এই সত্য সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের শেষ যুগের কবিতায়, বিশেষ করে 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য' 'জন্মদিনে' ও 'শেষ লেখার' অনেকগুলি কবিতায়। প্রথম শুনে বিস্ময় বোধ হলেও এ সত্যটিকে শেষ পর্য্যন্ত অস্বীকার করা অসম্ভব।

রোগশয্যায় শুয়ে কবি দেখেছেন 'ভোরের চড়ুই পাখি'টিকে—সে যেন প্রত্যূষের আলোর বাণীবহ। অথচ সে একান্ত করেই 'মাটি'র দোসর। একদিকে তার :

'মাটির পরে টান,
ধুলায় করো স্নান,"

অন্যদিকে সে-ই এনে দেয় প্রত্যূষের প্রথম আলোর আহ্বান ;

"অভীক তোমার চটুল তোমার
সহজ প্রাণের বাণী
দাও আমারে আনি,
সকল জীবের দিনের আলো
আমারে লয় ডাকি,
ওগো আমার ভোরের চড়ুই পাখি ॥"

(রোগশয্যায়, ৬ নং)

'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থে পৃথিবীর আহ্বান আরো গভীর, আরো উদার হয়ে জেগেছে। "মধুমৎ পার্থিবং রজঃ" স্বর্গে পৃথিবীতে বিভেদ যেন কবির অন্তরে মিলিয়ে একাকার হয়ে গেছে। এখন তাই 'স্বর্গ হইতে বিদায়ে'র সে যৌবনসুলভ অভিমান আর নেই। উদাত্ত কণ্ঠে প্রাচীন ঋষিদের মতো কবি গেয়েছেন।

"এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি,
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্র খানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।"

ধূলিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানিয়েছেন এই সুগভীর বিশ্বাসে :

"সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি ॥"

(আরোগ্য, ১ নং)

এই সূত্রে 'পত্রপুটের' 'আমার প্রণতি গ্রহণ করো পৃথিবী' কবিতাটি 'সোনার তরী'র 'বসুন্ধরা' কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে আমাদের দৃষ্টি আরো উদারতা লাভ করে কবির চিত্তের ক্রমবিকাশ দেখে।

সুনীল আকাশ যে শ্যামল পৃথিবীর বুকে কত বিচিত্র রূপে পুঞ্জিত বিকশিত হয়ে রয়েছে কবির পরিণত জীবনের অন্তর্দৃষ্টির সাহায্য বিনা আমরা তা কেমন করে দেখব ?—

"মিলিয়া শ্যামলে নীলিমায়
ধরণীর উত্তরীয়
বুনে চলে ছায়াতে আলোতে।
আকাশের হৃৎস্পন্দন
পল্লবে পল্লবে দেয় দোলা।
প্রভাতের কণ্ঠ হতে মণিহার ঝরে ঝিলিমিলি
বন হতে বনে।"

(আরোগ্য , ২ নং)

আকাশ ও পৃথিবীর, স্বর্গ ও মর্ত্যের বিরোধ বা বিচ্ছেদ যেখানে অবলুপ্ত উপলব্ধির সেই গভীর লগ্নের বাণীই রবীন্দ্রকাব্যের শেষ বাণী। সে-বাণী শুনতে হয় অন্তরের গভীরে, একাগ্রচিত্তে স্তব্ধ সমাহিত হয়ে। 'ধ্বনি খুঁজে মরে প্রতিধ্বনি'—এও যেমন সত্য, সকল খোঁজার অবশেষে ধ্বনির অন্তরেই প্রতিধ্বনি যে আপনার পূর্ণ অবসান লাভ করে—এও তেমনি সত্য। রবীন্দ্রনাথের সদ্যপ্রকাশিত 'শেষ লেখা' কাব্য-গ্রন্থে তাই দেখি একদিকে যেমন কবি গাইছেন মোহমুক্ত কণ্ঠে

"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি'
বিচিত্র ছলনা জালে,
হে ছলনাময়ী।
* * *
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার॥"

(শেষ লেখা ; ১৫ নং, কবির শেষ কবিতা)

অন্যদিকে রূপদর্শীর অনন্ত বিস্ময় অন্তরে নিয়ে সেই কবি-ই কী দৃঢ়তার সঙ্গে মন্ত্রচ্ছন্দে আবৃত্তি করেছেন .

"রূপ নারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।

সৃষ্টির এই 'রূপ-নারানে'র কূলে, তীর্থ-পরিক্রমণ যে-কবি ইহ জীবনে পূর্ণ আয়োজনে উদ্‌যাপন করেছেন 'দুঃখের আঁধার রাত্রে' জীবনের চরমতম লগ্নে একমাত্র তিনিই 'স্বপ্নভাঙ্গা চোখে' ভেদ করেন জীবনের যা কিছু 'মিথ্যা কুহক' এবং নির্বিকল্প দিব্য দৃষ্টিতে দেখেন—

"মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।"
(শেষ লেখা, ১৪ নং)

যে কবি একদিন গেয়েছেন

"বর্ণ সমারোহে দীপ্ত মরণের দিগন্তের সীমা,
জীবনের হেরিনু মহিমা।"
(বর্ষশেষ , পরিশেষ)

মৃত্যুর এ 'নিপুণ শিল্প' একমাত্র তাঁরি প্রসন্ন দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়।

'রূপনারানে'র কূলের সে তীর্থপথিক 'বাহিরের দীর্ঘ কুটিল পথ' অতিক্রম করে অবশেষে শুভলগ্নে অন্তরের আলোকসমুজ্জ্বল 'ঋজু পথটি'র মুখে এসে উপস্থিত হন। জীবনের দীর্ঘ সঙ্গীত এসে পৌঁছায় যেন সমে। হয়ত বা

"লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত"

কিন্তু

"সত্যের সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।"
(শেষ লেখা, ১৫ নং)

পৃথিবীর প্রণয়ধন্য কবির দীর্ঘ এই পথচলার আনন্দ বেদনাময় দুর্লভ মুহূর্তগুলির সুর ভেসে বেড়াবে যুগে যুগান্তরে শত সহস্র নাম-না-জানা ক্লান্ত পথিকের কানে। আভাস পাবে তারা তাদের সেই ভুলে-যাওয়া কবির ধূলি-ধূসর মানব জীবনের, আর আভাস পাবে ধূলার আসন থেকে—সেই কবির দূরের আকাশকে হাত ছানি দিয়ে একান্ত করে ডাকা :

আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু
মিশাইলে মূলতানে,
গুঞ্জন তা'র র'বে চিরদিন
ভুলে যাবে তা'র মানে।

কর্মক্লান্ত পথিক যখন
বসিবে পথের ধারে,
এই রাগিণীর করুণ আভাস
পরশ করিবে তা'রে ;
নীরবে শুনিবে মাথাটি করিয়া নিচু,
শুধু এইটুকু আভাসে বুঝিবে
বুঝিবে না আর কিছু—
বিস্মৃত যুগে দুর্লভ ক্ষণে
বেঁচেছিল কেউ বুঝি
আমরা যাহার খোঁজ পাই নাই
তাই সে পেয়েছে খুঁজি ॥"

(রোগশয্যায় , নং ১০)

গুরুদেব

সৈয়দ মুজতবা আলী

প্রমথ চৌধুরীর মত মনীষী যখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা অনবদ্য ভাষায় লেখেন, তখন তা পড়ে আমরা বুঝতে পারি, রবীন্দ্রনাথের বিপুল ব্যক্তিত্বের গৌরব এবং মহিমা তিনি পরিপূর্ণ ভাবেই উপলব্ধি করেছেন। তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভাবের গভীরতা, চিন্তার ঐশ্বর্য্য এবং রবীন্দ্র-জীবনের বৈচিত্র্যের সঙ্গে আমরা নিবিড়ভাবে পরিচিত হতে পারি।

আমার লেখাও সফল হত যদি আমি কবি বা স্রষ্টা হতুম। কবির দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনাই হোক, আর তাঁর কাব্যালোচনাই হোক কিঞ্চিৎ সৃজনী-শক্তি না থাকলে সে-রচনা কবির বিরাট ব্যক্তিত্বের পট-ভূমিতে প্রক্ষিপ্ত হয়ে শুধু বৈচিত্র্য-হীনতার পরিচয়ই দেয়। তাই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু লিখতে আমার বড় সঙ্কোচ বোধ হয়। ভয় হয়, যত ভেবেচিন্তেই লিখিনা কেন বিদগ্ধজনেরা পড়ে বলবেন, দীর্ঘ পাঁচবৎসর রবীন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষালাভ করেও এই ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিত্বের যথার্থ পরিচয় পেল না। এই অভিমত যে নিদারুণ সত্য তা আমি জানি; তাই স্থির ক'রেছিলুম যে, কয়েক বৎসর রবীন্দ্রনাথকে যে তাঁর প্রাত্যহিক জীবনে সহজ, সরলভাবে পেয়েছিলুম, সে-কথা একেবারে অপ্রকাশিতই রাখব।

কিন্তু, মুস্কিল হ'ল এই যে, কবি-প্রণামের রচনা-সংগ্রাহকগণ ও আমার নিজের দেশ 'শ্রীহট্টে'র অনেকেই জানেন যে, আমি শান্তিনিকেতনে শিক্ষা লাভ করেছি। এই সঞ্চয়িতার মধুকর যে আমার লেখা চেয়ে আমাকে পরম সম্মানিত করেছেন, তার একমাত্র কারণ তিনি জানেন যে, আমি রবীন্দ্রনাথের শিষ্য, তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। কিন্তু আমার দেশবাসী প্রিয়জনকে কি করে বোঝাই যে, রবীন্দ্রনাথের ঘরের দেয়াল, আসবাব, তাঁকে আমার চেয়ে ঢের বেশী দেখেছে। আপনারা বলবেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তোমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা বাদ দাও, তাঁর কাব্য আলোচনা কর। উত্তরে আমি বিনীতভাবে বলতে চাই—সে তো সহজ কর্ম নয়। তবে আর কিছু না হোক্, এ আমি নিশ্চয় করে জানি যে, আমার মনোজগৎ রবীন্দ্রনাথের গড়া। প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বলুন, দর্শন, কাব্য, ধর্মের ভিতর দিয়ে বহুর মধ্যে একের সন্ধান বলুন, কালিদাস, শেলি, কীট্সের কাব্যের ভিতর দিয়ে বিশ্ব-সাহিত্যের রসাস্বাদই বলুন—আমার মনোময় জগৎ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। জানা-অজানায় গঠিত—আমার চিন্তা, অনুভূতির জগতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সব চেয়ে বেশী।

জীবনের ক্রমবিকাশ-পথে নানাদিক থেকে রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। কিন্তু, সেই কাব্য-সৌন্দর্য্যের, বিশ্লেষণ কতটুকুই বা আমি করতে পারি? তাই এতদিন সে চেষ্টা করিনি। কিন্তু 'দেশে'র ডাকে তো নীরব থাকতে পারলাম না। তাই রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় আমার অক্ষমতা-নিবন্ধন যা আমি করতে পারি নি, আজ তাঁর জীবনান্তে সেই ব্রত উদ্‌যাপনে করতে ব্রতী হয়েছি।

একথা তো ভুলতে পারিনে যে, একদিন তাঁর চরণপ্রান্তে বসে আশীর্বাদ লাভ করেছি, তাঁর অজস্র অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ধন্য হয়েছি—সেই অপরিমেয় স্নেহের ঋণ অপরিশোধ্য। তাই আজ অশ্রুসজল চিত্তে সকলের সঙ্গে কবিগুরুকে আমারও সম্মিলিত প্রণাম নিবেদন করছি।

* * *

১৯২৯ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দর্শন' পড়তে যাই। বিদ্যালয়ের বিশাল প্রাসাদে পথভুলে 'ফনেটিক ইনস্‌টিটুটে'র বক্তৃতাগৃহে উপস্থিত হই। বহু ছাত্রছাত্রী ভিড় করে বসে আছে—বক্তৃতা সুরু হবার দেরি নেই। চারদিকে তাকিয়ে দেখি দেশবাসী কেউ নেই। ভয়ে ভয়ে বসে পড়লুম। প্রোফেসার বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে বললেন, "অদ্যকার বক্তৃতা ফনেটিক বিজ্ঞানের অবতরণিকা। নানা ভাষায় নানা দেশের লোকের নানা উচ্চারণ আজ শোনানো হবে।" ঘরের সব আলো নিভিয়ে দিয়ে দেয়ালে ম্যাজিক লেণ্টর্নে'র ছবি ফেলা হল।··রবীন্দ্রনাথ।··সঙ্গে সঙ্গে কলের গানে বেজে উঠল সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর

Through ages India has sent her voice—অন্ধকার ঘরে রবীন্দ্রনাথের ঋজুদীর্ঘ মূর্তির আলোকোদ্ভাসিত প্রতিচ্ছবি। কণ্ঠস্বর রবীন্দ্রনাথের- না তপোবনের ঋষির—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে', —ভারতবর্ষের সেই চিরন্তন বাণী।

আবার আলো জ্বলল। অধ্যাপক বললেন, এমন গলা, ঠিক জায়গায় জোর দিয়ে অর্থ প্রকাশ করার এমন ক্ষমতা শুধু প্রাচ্যেই সম্ভব। পূর্বদেশে মানুষ এখনো "বর্ট" কে (শব্দব্রহ্ম) বিশ্বাস করে। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরে তারই পূর্ণতম অভিব্যক্তি। কণ্ঠস্বরের এমন মাধুর্য্য, বাক্যের এমন ওজস্বিতা, পশ্চিমে কখনও শুনিনা।

গর্বে আমার বুক ভরে উঠল। ডাইনে তাকালুম, বাঁয়ে তাকালুম। ভাবটা এই, "আলবৎ, ঠিক কথা, ভারতবাসীই শুধু এমন ধ্বনির ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতে পারে।" ক্লাসের বহু ছাত্রছাত্রী সে সন্ধ্যায় আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। আমি মাথা উঁচু করে বসেছিলুম। আমার গুরুদেব ভারতবর্ষের, আমিও ভারতবাসী।

* * *

তার চেয়েও আশ্চর্যা হয়েছিলুম ১৯২৭ সালে—জর্মনী যাওয়ার দুইবৎসর পূর্বে —কাবুলে।

ইউরোপ যাওয়ার জন্য অর্থ-সংস্থান করতে গিয়েছিলুম কাবুলে। ফরাসী ও ফারসী জানি বলে অনায়াসে চাকরী পেয়েছিলুম। তখনকার দিনে বিশ্বভারতীই ছিল একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে ফরাসী, ফারসী জর্মন একসঙ্গে শেখা যেত।

দু'শো টাকা মাইনেতে গিয়েছিলুম, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই কাবুল সরকার আবিষ্কার করলেন যে আমি জর্মনও জানি। মাইনে ধাঁ করে একশো টাকা বেড়ে গেল। পাঞ্জাবী ভায়ারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওজীরে মওয়ারীফের (শিক্ষামন্ত্রী) কাছে ডেপুটেশন নিয়ে ধরণা দিয়ে বললেন, সৈয়দ মুজতবা এক 'অনরেকগনাইজড্' বিদ্যালয়ের ডিপ্লোমাধারী। আমরা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, এম, এ। আমাদের মাইনে শ দেড়শো, তার মাইনে তিনশো, এ অন্যায়।

শিক্ষামন্ত্রীর সেক্রেটারী ছিলেন আমার বন্ধু। তিনি আমার কাছে ঘটনাটা বর্ণনা করেছিলেন ফার্সীতে।*—"জানো, বন্ধু, শিক্ষামন্ত্রী তখন কি বললেন?" খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। শিক্ষামন্ত্রী বললেন—বিলকুল ঠিক। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই, তোমাদের ডিগ্রীতে দস্তখত রয়েছে পাঞ্জাবের লাটসাহেবের। তাঁকে আমরা চিনি না, দুনিয়াতে বিস্তর লাটবেলাট আছেন—আমাদের ক্ষুদ্র আফগানিস্তানে ও গোটা পাঁচেক লাট আছেন। কিন্তু মুজতবা আলীর সনদে আছে রবীন্দ্রনাথের দস্তখত,—সেই রবীন্দ্রনাথ যিনি সমগ্র প্রাচ্যের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।"

* * *

এসব অভিজ্ঞতা যে কোনোদিন হবে সে তো স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, যখন ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনে পড়তে যাই। বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগ তখনও খোলা হয়নি। ছ'মাস পরে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পৌরহিত্যে তার ভিত্তি পত্তন হয়। বিশ্বভারতীতে তখন জনদশেক ছাত্রছাত্রী ছিলেন, তাঁরা সবাই শান্তিনিকেতন স্কুল থেকেই কলেজে ঢুকেছেন—শ্রীহট্টবাসীরূপে আমার গর্ব এই যে বিশ্ব-ভারতীর কলেজ বিভাগে আমিই প্রথম বাইরের ছাত্র।†

প্রথম সাক্ষাতে গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, কি পড়তে চাও?

আমি বল্লুম, তা তো ঠিক জানিনে তবে কোনও একটা জিনিষ খুব ভাল করে শিখতে চাই।

তিনি বল্লেন, নানা জিনিষ শিখতে আপত্তি কি?

আমি বললুম, মনকে চারদিকে ছড়িয়ে দিলে কোনও জিনিষ বোধ হয় ভাল করে শেখা যায় না।

---

* ("খী দানীদ আগাজান, ওজীরে মওয়ারিফ্ চি গুফতন্দ")

† রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখি ১৯১৯ ইংএ শ্রীহট্ট সহরে। পূজ্যপাদ ৺ গোবিন্দনারায়ণ সিংহের আমন্ত্রণে তিনি শ্রীহট্টের আতিথ্য স্বীকার করেছিলেন।

গুরুদেব আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, একথা কে বলেছে ?

আমার বয়স তখন সতেরো,—থতমত খেয়ে বললুম, কনান ডয়েল।

গুরুদেব বল্লেন, ইংরেজের পক্ষে এ বলা আশ্চর্য্য নয়।

কাজেই ঠিক করলুম, অনেক কিছু শিখতে হবে। সম্ভব অসম্ভব বহু ব্যাপারে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। গুরুদেবের সঙ্গে তখন সাক্ষাৎ হত ইংরেজি ও বাংলা ক্লাসে। তিনি শেলি, কীটস আর 'বলাকা' পড়াতেন।

তারপর ১৯২২ এর কাছাকাছি শান্তিনিকেতনে টলষ্টয়ের ভাবধারা হঠাৎ ছাত্রছাত্রীদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করল। আমরা বললুম, শান্তিনিকেতনে আমরা যে জীবন যাপন করছি সেটা বুর্জুয়া জীবন, বিলাসের জীবন। তাতে সরলতা নেই, সাম্য নেই, স্থৈর্য্য নেই। আমাদের উচিত সেই সহজ সরল জীবনকে ফিরিয়ে আনা, মাটীর টানে প্রকৃতির কোলে ফিরে গিয়ে ক্ষেতকরা, ফসল ফলানো। আমাদের মতবাদ যখন প্রবল হয়ে বিদ্রোহের আকার ধরেছে, তখন একদিন গুরুদেব আমাদেরে ডেকে পাঠালেন। আমাদের মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি তর্ক করলেন। নাস্তানাবুদ হয়ে আমরা আধঘন্টার ভেতর চুপচাপ। সব শেষে তিনি বললেন, আমি জানি একতারা থেকে যে সুর বেরোয় তাতে সরলতা আছে কিন্তু সে সরলতা একঘেঁয়েমির সরলতা। বীণা বাজানো ঢের শক্ত। বীণাযন্ত্রের তার অনেক বেশী, তাতে জটিলতাও অনেক বেশী। বাজাতে না জানলে বীণা থেকে বিকট শব্দ বেরোয় কিন্তু যদি বীণাটাকে আয়ত্ত করতে পার তবে বহুর মধ্যে যে সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয় (হারমনি ইন্ মলটিপ্লিসিটি) তা একতারার একঘেঁয়েমির সরলতার (মনটনস্ সিমপ্লিসিটি) চেয়ে ঢের বেশী উপভোগ্য। আমাদের সভ্যতা বীণার মত, কিন্তু আমরা এখনও ঠিকমত বাজাতে শিখিনি। তাই বলে সে কি বীণার দোষ; আর বলতে হবে যে একতারাটাই সবচেয়ে ভালো বাদ্য যন্ত্র।

আমার মনে হয় এইটেই ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনের মূল সুর। চিরজীবন তিনি বহুর ভেতর একের সন্ধান করেছিলেন। তাঁর সে সাধনা আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি। সৌভাগ্যক্রমে প্রায় একবৎসর শান্তিনিকেতনে আমি ছিলুম এক ঘরের নীচের তলায়। সেখানথেকে জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালেই দেখতে পেতুম, গুরুদেব তাঁর জানালার পাশে বসে লেখাপড়া করছেন। সকালে চারটার সময় দুঘন্টা উপাসনা করতেন। তারপর ছটার সময় স্কুলের ছেলেদের মত লেখাপড়া করতেন। সাতটা, আটটা, নটা, তারপর দশমিনিটের ফাঁকে জল খাবার। আবার কাজ—দশটা, এগারোটা, বারোটা। তারপর খেয়েদেয়ে আধঘন্টা বিশ্রাম। আবার কাজ—লেখাপড়া, একটা দুটো, তিনটে, চারটা, পাঁচটা—কাজ, কাজ, কাজ। পাঁচটা থেকে সাতটা ছেলেমেয়েদের গান শেখাতেন—বা দিনুবাবুর আসরে বসে গান শুনতেন, অথবা গল্প-সল্প করতেন। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে আবার লেখাপড়া, মাঝে মাঝে গুণ গুণ করে গান—আটটা থেকে এগারোটা পর্য্যন্ত। কী অমানুষিক কাজ করার ক্ষমতা। আর কী অপরিসীম জ্ঞানতৃষ্ণা! আমি তখন

ইতিহাস জানেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের নানা সৃষ্টির নানা আলোচনা করবেন। তাঁর সৃষ্টির অনেক কিছু অমর হয়ে থাকবে, অনেক কিছু লোপ পাবে।

কিন্তু, এ বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, চিরন্তন হয়ে থাকবে রবীন্দ্রনাথের গান। জার্মানীর 'লীডর' গান য়ুরোপের গীতিকাব্যের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ একথা বললে, অত্যুক্তি করা হয় না। এমন সব গান 'লীডরে' আছে যার কথা দিয়েছেন গ্যেটের মত কবি আর সুর দিয়েছেন বেটোফেনের মত সুনিপুণ সুর-শিল্পী। আমার মনে হয়, তার চাইতেও শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের গান। কারণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল একাধারে গীতিকার এবং সুরস্রষ্টার প্রতিভা। রবীন্দ্রনাথের গান বাঙালীর কণ্ঠে চিরকাল বেঁচে থাকবে। কেউ যদি বলেন, না, চিরস্থায়ী তা হবেনা,—আমি তর্ক করব না। কারণ আর যা নিয়ে চলুক; গান নিয়ে, গীতি-কবিতা নিয়ে তর্ক চলে না। গানের আবেদন সরাসরি একেবারে মানুষের মর্ম্মস্থলে গিয়ে পৌঁছায়। গান হৃদয়কে দোলা দেয়, অন্তরে জাগায় অনির্বচনীয় অনুভূতি; —যুক্তিতর্কের অপেক্ষা রাখে না।

প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বললাম। সে-বিপুল সাহিত্যের খানিকটা বুঝেছি, বেশীর ভাগই বুঝি নি। কিন্তু, তাঁর সাহিত্যালোচনার দিন আজ নয়। আজ শুধু আমার স্নেহপ্রবণ গুরুদেবের সংবেদনশীল অন্তরটির পরিচয় দেবার জন্যেই আরো কয়েকটি কথা বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করব। কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, ধরা-ছোঁয়ার অতীত, সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। কিন্তু আমাদের কাছে তিনি যে ছিলেন স্নেহাসক্ত গুরু, নিতান্তই মাটির মানুষ। কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করাও যে দুঃসাধ্য। হিমালয়ের পাদমূলে বসে বিচিত্র পুষ্প চয়নকালেও ক্ষণে ক্ষণে গৌরীশিখরের বিরাট, বিশাল, গম্ভীর-মহিমা হৃদয়কে নির্বাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিয়েছে।

শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীতে অবসর সময়ে ক্যাটালগ তৈরি করতুম। তখন প্রতিদিন দেখতুম পাঠান্তে নূতন পুরাতন বই তিনি লাইব্রেরীতে ফেরৎ পাঠাতেন। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, কাব্য, কত বলব। এমন বিষয় নেই যাতে তাঁর অনুসন্ধিৎসা ছিল না।

এদিক দিয়ে তিনি ছিলেন আজীবন জ্ঞান-সাধক। কিন্তু, তাই বলে জীবনকে সকল দিক থেকে বঞ্চিত করে কঠোর জ্ঞানমার্গ তিনি অবলম্বন করেন নি। তিনি তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় বলেছেন—"ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার"—পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ উপভোগের আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন কঠোর সংযমী। এক হিসেবে তিনি ছিলেন প্রকৃত তপস্বী। তপস্যা;—সে তো শক্তি সঞ্চয়ের জন্যেই। তাঁর একটি কবিতায় আছে—

"জানি জানি এ তপস্যা দীর্ঘ রাত্রি
করিছে সন্ধান,
চঞ্চলের মৃত্যুস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান।"

আমার দৃঢ় বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ জীবনে অতীন্দ্রিয় সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁর ঋষি-দৃষ্টির সমক্ষে সত্যের স্বরূপটি উদ্ঘাটিত হয়েছিল পরিপূর্ণ মহিমায়। তারি পরিচয় তাঁর অজস্র গানে, কবিতায়, 'ধর্ম্ম' এবং 'শান্তিনিকেতনে'র নিবন্ধগুলোতে। রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান শুধু পুঁথি-পড়া জ্ঞান নয়, তা সম্পূর্ণই অনুভূতির।

'মহুয়া' প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ নিজে চয়ন করে 'সঞ্চয়িতা' প্রকাশ করেন। তাতে 'মহুয়ার' অতি অল্প কবিতা স্থান পায়। তখন রব উঠেছে 'মহুয়াতে' কবির সৃজনী-শক্তির অপ্রাচুর্য্যের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। ভয় হল, রবীন্দ্রনাথও বুঝি তাই বিশ্বাস করে 'মহুয়ার' যথেষ্ট কবিতা 'সঞ্চয়িতা'য় স্থান দেন নি। কলকাতায় থাকতুম; শান্তিনিকেতনে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি 'সঞ্চয়িতাতে' 'মহুয়ার' আরো কবিতা দিলেন না কেন? আমাকে যদি 'সঞ্চয়িতা' সম্পাদন করার ভার দেওয়া হত, আমি তাহলে 'মহুয়া'র মলাট ছিঁড়ে 'সঞ্চয়িতা' নাম দিয়ে প্রকাশ করতুম। বলতুম, এতেই সব চাইতে ভালো কবিতা সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

গুরুদেব হেসে বললেন, ভাগ্যিস্ তোমাকে 'সঞ্চয়িতা' তৈরি করবার ভার দেওয়া হয়নি। আমি 'মহুয়ার' কবিতা 'সঞ্চয়িতাতে' যে বেশী পরিমাণে দিইনি, তার কারণ এই যে 'মহুয়া'র কাব্য-সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আমি সন্দিহান। আসলে 'মহুয়ার' কবিতাগুলি মাত্র সেদিনের লেখা। কবিতার ভালোমন্দ বিচার করার জন্য যে দূরত্বের প্রয়োজন সেটা 'মহুয়ার' বেলায় এখনও যথেষ্ট হয়নি।

ঠিক সেই কারণেই, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আলোচনা করার দিন বোধ হয় এখনও আসেনি। যে পৃথিবীকে তিনি দীর্ঘকাল ধরে অতি নিবিড়ভাবে ভালোবেসেছিলেন সেই পৃথিবী ছেড়ে তিনি মাত্র সেদিন চলে গেছেন। শোকে বাংলাদেশ মুহ্যমান। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য-সমালোচনার জন্য যে পরিমাণ সময়ের ব্যবধান প্রয়োজন তা আমরা এখনও পাইনি।

১৯৩৯ সালে গুরুদেবের সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় শান্তিনিকেতনে।

তাকিয়ে বললেন, লোকটা যে বড় চেনা চেনা ঠেকছে। তুই নাকি বরোদার মহারাজা হয়ে গেছিস?

আমি আপত্তি জানালুম না। তর্কে তাঁর কাছে বহুবার নাজেহাল হয়েছি। আপত্তি জানালে তিনি প্রমাণ করে ছাড়তেন, আমিই বরোদার মহারাজা, নয়তো কিছু একটা জাঁদরেল গোছের।

নিজেই বললেন, না না। মহারাজা নয়, দেওয়ান-টেওয়ান কিছু একটা ?

আমি তখনও চুপ। 'মহারাজা' দিয়ে যখন আরম্ভ করেছেন, কোথায় থামবেন তিনিই জানেন।

তারপর বল্লেন, কি রকম আছিস ? খাওয়া-দাওয়া ?

আমি বল্লুম, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

আরে না, না, আজকালকার দিনে খাওয়া-দাওযা জোগাড় করা সহজ কর্ম্ম নয। তোকে আমি একটা উপদেশ দি'। ওই যে দেখতে পাচ্ছিস 'টাটা ভবন' তাতে একটী লোক আছে, তার নাম পঞ্চা ; লোকটী রাঁধে ভাল। তাব সঙ্গে তুই যদি যোগাযোগ স্থাপন করতে পারিস তবে এখানে তোর আহারের দুর্ভাবনা থাকবে না।

আমি তাঁকে আমার খাওযা-দাওযা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে অনুরোধ জানালাম।

তখন বললেন, তুই এখনও বরোদা কলেজে ধর্ম্মশাস্ত্র পড়াস না ?

আমি জানতুম, তিনি ঠিক জানেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রেরা কে কি করে। তাই মহারাজা বা দেওয়ান আখ্যায় আপত্তি জানাই নি।

তাবপর বল্লেন, জানিস, তোদের যখন রাজা মহারাজারা ডেকে নিযে সম্মান দেখায় তখন আমার মনে কি গর্ব হয, আমায় কী আনন্দ হয। আমাব ছেলেবা দেশে বিদেশে কৃতী হযেছে।

তারপর খানিকক্ষণ আপন মনে কি ভেবে বল্লেন, কিন্তু জানিস, আমাব মনে দুঃখও হয। তোদের আমি গড়ে তুলেছি এখন আমার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাব জন্য তোদেব প্রযোজন। গোখলে, শুক্ল, তোরা সব এখানে থেকে আমাকে সাহায্য কববি। কিন্তু তোদের আনবার সামর্থ্য আমার কোথায ?

তা যাক্। বলতে পারিস্ সেই মহাপুরুষ কবে আসছেন কাঁচি হাতে করে ?

আমি অবাক। মহাপুরুষ ত আসেন ভগবানের বাণী নিয়ে, অথবা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম নিযে। কাঁচি হাতে করে ?

হাঁ, হাঁ কাঁচি নিযে। সেই কাঁচি নিয়ে সামনেব দাড়ি ছেঁটে দেবেন, পেছনের টিকি কেটে দেবেন। সব চুরমার করে একাকাব করে দেবেন। হিন্দুমুসলমান আর কতদিন এরকম আলাদা হয়ে থাকবে।

তারপর আধঘণ্টা ধরে অনেক কিছু বললেন হিন্দু-মুসলমানেব কলহ নিয়ে। তাঁকে যে এই কলহ কত বেদনা দিত সে আমি জানি। আমাকে যে বলতেন তার কারণ বোধ হয় আমি তাঁর মুসলমান ছাত্র। বোধ হয় মনে করতেন আমি তাঁকে ঠিক বুঝতে পারব।

গুরুদেব তখন বেশী কথা বললে হাঁপিযে উঠতেন। আমি তাই তাঁর কথা বন্ধ করার সুযোগ খুঁজছিলুম। তিনিই হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, আমার জামাব পকেটে ছোট্ট ক্যামেরা।

বললেন ছবি তোলার মৎলব নিয়ে এসেছিস বুঝি। তোল্, তোল্। ওরে সুধাকান্ত পর্দাগুলো সরিয়ে দে তো। কি রকম বসব বল্।

আমি বললুম, আপনি ব্যস্ত হবেন না; আমি ঠিক তুলে নেব।

তোর বোধ হয় খুব দামী ক্যামেরা, জার্মানী থেকেনিয়ে এসেছিস, সব কায়দায় ছবি তোলা যায়। অন্যেরা বড় জ্বালাতন করে; এরকম করে বসুন, ওরকম করে বসুন। কত কী।

ছবি তোলা শেষ হলে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি দেখে বল্লেন কি রে, কিছু বলবি নাকি?

আমি বল্লুম, একটা কথা বলতে চাই যদি কিছু মনে না করেন। তিনি ক্লাসে যে-রকম উৎসাহ দিতেন ঠিক সেই রকম ভাবে বল্লেন,

বল, বল, ভয় কি?

আমি বল্লুম, এই যে আপনি বললেন, আপনার সামর্থ্য নেই আমাদের এখানে নিয়ে আসবার, সেই সম্পর্কে আমি শুধু আমার নিজের তরফ থেকে বলছি যে, বিশ্বভারতীর সেবার জন্য যদি আমাকে প্রয়োজন হয় তবে ডাকলেই আসব। যা দেবেন হাত পেতে নেব।

গুরুদেব বল্লেন সে কি আমি জানিনেরে, ভালো করেই জানি। তাই তো তোদের কাছে আমার সামর্থ্যহীনতার কথা স্বীকার করতে সঙ্কোচ হয় না।

মনে হল গুরুদেব খুশী হয়েছেন।

গুরুদেব আজ নেই।

কিন্তু সেই হারাণো দিনের স্মৃতি আজো আমার মনে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

কীর্ত্তির জাল জড়ায়ে তোমাবে যতই ভুলিতে চাই,—
সেই এককথা জাগে শুধু মনে—তুমি নাই, তুমি নাই !
যত বলি, এই মবণে কি ক্ষতি,
দেহেব বিনাশ জানা কথা অতি,
বিশ্বব্যাপিনী প্রতিভাব জ্যোতি,—
খাঁটি সেই কথাটাই ;
উপনিষদেব যুক্তি প্রমাণ,
যেমন কবেই কবি পবিমাণ,
গীতার 'জীর্ণ বসন' সমান
দিই যত উপমাই,—
মন ভুলাইতে যত কিছু বলি, শেষ কথা তুমি নাই ;
মনেব বেদনা কথাব আড়ালে থেকে যায় বেদনাই !

গুণীব জ্ঞানীর আদব বাড়াতে
নাই তুমি আব বিশ্বসভাতে,
সাহিত্যে-গীতে—নাট্যশালাতে
কোনোখানে নাহি পাই।
বিশ্বভাবতী কাঁদে নতমুখে,
সাধেব শ্যামলী শুকায় সমুখে,
চিবশান্তিব নিকেতন দুখে
স্তম্ভিত আজি তাই ;
ঘবে বা বাহিরে চাহি ফিবে-ফিবে'—কোনোখানে তুমি নাই।

নাই আমাদের কোনো সুখেদুখে,
নাই আঁখিজলে, নাই হাসিমুখে,
নাই চোখেমুখে, নাই কোলে বুকে
শূন্য—যে দিকে চাই ;

নাইক বেদীতে, নাই বাহুপাশে,
নাই দেশে, নাই সুদূর প্রবাসে,
নাই স্থলে জলে, ঊর্দ্ধ আকাশে,
যেথায় খুঁজিতে যাই ;

দীপ্তি-মুকুট পরাইয়া শিরে যত গুণই তব গাই,—
শুধু আঁখিজল ঝরে অবিরল, হায় কবি, তুমি নাই।

রবীন্দ্রবাণী

অমিয় চক্রবর্ত্তী

১

বহু মাঠ, গাছ, ঘর, বাংলার বিচিত্র ভুবন
সমাজসংস্কৃতিধান্য ঃ বন্দীর নয় তো জীবন।
বাংলার মন তবু স্বর্ণভূমে
ঘুরেছে দিনের ঘুমে, বিস্মরণে।
কত কাল জানি
জীবন্ত অতীত হ'তে বাণী
পায় নি মাটির যোগে নবীন যুগের ধ্যানাসনে ;
মেশে নি জাগ্রত ধারা দু-হাতে, মননে, শক্তি হয়ে।
চিত্তধারা গেছে ব'য়ে
পৌরাণিক আর্য্যস্বপ্নে, একালে, পশ্চিমী ঝড়ে দুলে
আত্মগতি গেছে ভুলে।
বন্দীর জীবন সেই। গ্রামে ঘরে ঘোরে প্রাণচাকা
কভু শান্তি, কভু ক্লান্তি, আকস্মিকে বেঁচে-থাকা,
আশ্চর্য্য প্রাণেরে ঢালা দৈবাধীন, অবিদ্রোহে,
দুর্য্যোগেরে দোষী ক'রে দুঃখের সাধনা মোক্ষ-মোহে—
অভাবের কান্না ওঠে, সূর্য্যাকাশ নিরুত্তর,
ধূসর অভ্যাসমরু, দিগন্তে মৃত্যুর গুপ্তচর ॥

২

এলে তুমি বাণী।
পত্রে পত্রে তব রুদ্রপাণি
রৌদ্রে নেয় ভ'রে,
বাংলার প্রাণ ফোটে বন্ধভাঙা পুষ্পের নির্ঝরে।

শৃঙ্খচেরা শ্যামল চেতন
তব মুক্ত শাখার স্পন্দন
মহান্ যুগের স্রোতে
বৃহৎ মানব সংঘ হ'তে
মর্ম্মবর্ণি
দিল জাগরণী।
চমকেব নেশাচূর্ণ চোখে
আজ মাঠে শস্য নেই, দেখে লোকে,
দিন গেছে ঘরে ক্ষুধা, শত শত্রু ফিবে
অশক্তিব নাট্যমঞ্চ ঘিবে।
শক্তি এল সত্যের প্রত্যয়ে।
ভোবে উঠে জনে জনে পরম বিস্ময়ে,
মহাবাণী, শুভ্র পটে জেনেছে তোমায, মর্ম্মমাঝে
পেযেছে সত্তার স্পর্শ দিনকাজে
বিদ্যালয, কৃষি, শিল্প, সাহিত্য সমাজে জাগে ভাষা।
প্রোজ্জ্বলন্ত আশা
মধ্যাহ্নে তোমার ছন্দে গ্রামে গ্রামে নবীন সংগ্রাম
কবিছে প্রণাম।

সায়াহ্নেব আলো লাগে গভীর আকাশ হ'তে যবে
তবু, তব ধ্যানাবিষ্ট পল্লবে পল্লবে
মর্ত্ত্য জ্যোতিষ্কের সুর মেশে ;
বঙ্গদেশে
মানবেবে দিলে অঙ্গীকাব,
অস্তিত্বের অধিকাব
যেখানে সুন্দর দিনাকাশে
সত্তাব সমগ্র তব আপনা বিকাশে ॥

রবীন্দ্র-পরিক্রমা

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারংবার।"

—রবীন্দ্রনাথ।

"Thy voice is on the rolling air ;
I hear thee where the waters run ,
Thou standest in the rising sun,
And in the setting thou art fair.
What art thou then ? I cannot guess ,
But though I seem in star and flower
To feel thee some diffusive power,
I do not therefore love thee less
My love involves the love before ,
My love is vaster passion now ,
Though mix'd with God and Nature thou,
I seem to love thee more and more
Far off thou art, but ever nigh ,
I have thee still, and I rejoice ,
I labour, circled with thy voice ,
I shall not lose thee though I die."

—Tennyson.

১৭৮৩ শকাব্দে, বাংলা সন ১২৬৮ সালে, ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতায় তাঁর জোড়াসাঁকোর পৈত্রিক ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমান ১৮৬৩ শকাব্দে, বাংলা সন ১৩৪৮ সালে ২২শে শ্রাবণ তিনি দেহত্যাগ করেছেন।

তাঁর এই দীর্ঘ জীবন মানবজাতির পরম সৌভাগ্যের বিষয়। সত্য বটে, কোন মানুষের জীবন যদি শুধু দীর্ঘই হয়, তা হ'লে শুধু সেই কারণেই তাকে মূল্যবান্ মনে করা যেতে পারে না। যোগবাশিষ্ট গ্রন্থে আছে :—

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥

"গাছপালাও বেঁচে থাকে, পশুপক্ষী বেঁচে থাকে, কিন্তু তাঁর বেঁচে থাকাই সত্য বেঁচে থাকা যাঁর মন মননের দ্বারা জীবিত।"

মনন ও আনন্দানুভূতি এবং সাহিত্যে ও কাজে তাঁর জীবনব্যাপী প্রকাশ লোকোত্তর বিরাট পুরুষ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের একটি অংশ মাত্র। তাঁর সঙ্গে খুব দীর্ঘকালের পরিচয় সত্ত্বেও তাঁকে ভাল ক'রে চিনেছি বুঝেছি, এ অহংকার আমাদের নেই। যে নিজেই জানে না, সে কেমন ক'রে অন্যকে জ্ঞান দিবে? এই প্রবন্ধে তাঁর নানাবিধ কৃতির সামান্য পরিচয় দেওয়া হচ্ছে বটে; কিন্তু তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব কৃতিগুলির সমষ্টি নয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব সে-সকলের ঊর্দ্ধে অবস্থিত একটি অখণ্ড সত্তা, এই কথা মনে রাখতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ শুধু যে খুব দীর্ঘকাল বেঁচেছিলেন, তা নয়; তিনি তাঁর লোকোত্তর প্রতিভা ও অসাধারণ কর্মশক্তির দ্বারা মানুষকে আনন্দ দিয়েছেন এবং নানা প্রকারে মানুষের কল্যাণ করেছেন।

"লুকায়ে আছেন যিনি জগতের মাঝে,
আমি তাঁরে প্রকাশিব সংসারের কাজে।"

তাঁর এই বাণী তাঁর জীবনে উদাহৃত হ'য়েছে। তাঁর অন্য কাজ ছেড়ে দিলেও, তিনি যে ৯ (ন') বৎসর বয়সে শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ অনুবাদ ক'রেছিলেন তা ছেড়ে দিলেও, তিনি লিখেছেনই তো ৬৭।৬৮ বৎসরের অধিক কাল। লিখেছেন আনুমানিক মুদ্রিত বৃহৎ রয়্যাল আটপেজি আকারের ১৭।১৮ হাজার পৃষ্ঠা।

রবীন্দ্রনাথের কবি-পরিচয়ই শ্রেষ্ঠ পরিচয় হ'লেও তিনি কাব্য ছাড়া অন্য রকম পুস্তকও লিখেছেন বিস্তর। তাঁর কবিত্বের উন্মেষ হয় প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে, তাঁর শৈশবে বললেও চলে। পদ্যে তিনি যে-সব কবিতা ও কাব্য-গ্রন্থ লিখেছেন, তা ছাড়া তাঁর গদ্য কবিতা গদ্য কাব্যও বহুসংখ্যক আছে। তাঁর উপন্যাস, নাটক ও গল্প — সবগুলিই কাব্য।

কাব্য ভিন্ন তিনি ধর্ম, অধ্যাত্মতত্ত্ব, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ, দর্শন, ছন্দ, গ্রন্থসমালোচনা, বিদেশভ্রমণ প্রভৃতি বিষয়ে এত প্রবন্ধাদি লিখেছেন ও বক্তৃতা ক'রেছেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলির নাম করাও সোজা নয়। তা ছাড়া, তাঁর পত্রাবলী আছে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-কৌতুক-পরিহাসাত্মক লেখা আছে, হেঁয়ালী-নাট্য আছে, গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য আছে, "পঞ্চভূতের ডায়্যারী" নামক পুস্তক আছে যাকে কোনশ্রেণীতে ফেলা সুকঠিন। তিনি যেমন প্রাপ্তবয়স্কদের, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের, জন্যে লিখেছেন, তেমনি ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যেও গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ছড়া—এমন কি বর্ণপরিচয়ের বহিও, লিখেছেন। বাস্তবিক, বই লিখে, গল্প ব'লে, গান বেঁধে, গান গেয়ে, ছবি এঁকে, অভিনয় ক'রে এবং আরও নানা রকমে ছোট ছেলেমেয়েদিগকে আনন্দ তিনি যত দিয়ে গেছেন, এবং ভবিষ্যতেও দেবার উপায় ক'রে রেখে গেছেন, এমন আর কেও নয়। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যই তো তাদিগকে আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া। এই বিদ্যালয়ের প্রথম অবস্থায় তিনি তাদের জন্যে কত নূতন খেলার সৃষ্টি ক'রে তাদের খেলার সঙ্গী হয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিকদের তাঁরই কাছে

তাঁরই বিরুদ্ধে একটি নালিশ ছিল, যে, তিনি বৈজ্ঞানিক কিছু লেখেন নি। চার বৎসর পূর্বে "বিশ্বপরিচয" লিখে তিনি তাঁদের সে ক্ষোভ দূর ক'রে গেছেন। এসব ছাড়া তাঁর নিজের লেখা ইংরেজী বইও অনেকগুলি আছে যেগুলি তাঁর বাংলা বইয়ের অনুবাদ নয়। তাঁর বাংলা অনেক বইয়ের অনুবাদ পৃথিবীর পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য যত অধিক ভাষায় হয়েছে, ভারতবর্ষের আর কোন লেখকের তা ত হয়ই নাই, অন্য কোন দেশেরও আধুনিক কোনও লেখকের হয়েছে ব'লে আমি জানি না। তাঁর কোন কোন বইয়ের জার্মান অনুবাদ এত বেশী বিক্রী হয়েছিল যে, মার্কের দর বিষম প'ড়ে না গেলে তিনি বহু বহু লক্ষ টাকা প্রকাশকদের কাছ থেকে পেতে পারতেন এবং বিশ্বভারতীর জন্যে তাঁকে কোন উদ্বেগ সহ্য করতে হ'ত না।

ইয়োরোপের অনেক বিখ্যাত লোকের লেখা পত্রাবলী আছে। আমরা যতটা জানি, তাঁদের কারোও পত্রাবলী সাহিত্যিক উৎকর্ষে এবং বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীকে অতিক্রম করে নাই। তাঁর লেখা একখানা পোষ্টকার্ডও সাহিত্যরসাপ্লুত।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে কবি ও দার্শনিক দুই পৃথক্ শ্রেণীর মানুষ ব'লে পরিগণিত হয়। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে একই মানুষকে কবি ও দার্শনিক রূপে—এমন কি, বৈজ্ঞানিক ও কবি রূপে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় সেই প্রাচীন ধারা রক্ষিত হয়েছে। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম-ভারতীয়-দার্শনিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় এবং পরে বিলাতে হিবার্ট লেক্‌চার্স্ দিতে আহূত হওয়ায় তাঁর দার্শনিকত্ব প্রকাশ্য ভাবে স্বীকৃত হয়।

তিনি অনেক মাসিকের সম্পাদকের কাজ ও সাংবাদিকের কাজ দীর্ঘকাল অসামান্য প্রতিভা ও দক্ষতার সহিত করেছিলেন, এবং ভবিষ্যতে-প্রসিদ্ধ অনেক লেখকের লেখা সংশোধন ক'রে তাঁদিকে সাহিত্যিক কৃতিত্ব লাভে সমর্থ করেছিলেন।

তাঁর বহুমুখী প্রতিভার প্রশংসা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

টেনিসন ভিক্টর হিউগোকে বলেছেন,—

"Victor in Drama, Victor in Romance, Cloud-weaver of phantasmal hopes and fears," "Lord of human tears," "Child-lover,"
"Weird Titan by thy winter weight of years as yet unbroken."

আমরা রবীন্দ্রনাথকে এই সব এবং আরও অনেক বিশেষণে ভূষিত ক'রে সত্য বিজয়শ্রী-মণ্ডিত ব'লে অনুভব ক'রতে পারি।

তিনি কোনো মহাকাব্য রচনা করেন নাই। মহাকাব্য সাধারণতঃ কোনো প্রসিদ্ধ রাজবংশ কোনো মহাযুদ্ধ কোনো বড় রাজা মহারাজা সম্রাটকে অবলম্বন ক'রে লিখবার রীতি সর্বদেশপ্রচলিত। কিন্তু রাজতন্ত্রের ও রাজা মহারাজা সম্রাটদের যুগ চলে গেছে, যুদ্ধ ঘৃণ্য বিভীষিকা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর অতিকায় জীবজন্তুর যুগ যেমন এখন আর নাই,

মহাকাব্যের যুগও তেমনি অতীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা গীতিকবিতাতেই সমধিক ভাস্বর হয়েছে। তিনি "ক্ষণিকা"য় রহস্য ক'রে লিখেছেন :—

"আমি নাব্‌ব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে,—
ঠেক্‌ল কখন তোমার কাঁকন-
কিঙ্কিণীতে
কল্পনাটি গেল ফাটি'
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।
আমি নাব্‌ব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে।
হায় রে কোথা যুদ্ধকথা
হৈল গত
স্বপ্ন মত।
পুরাণ-চিত্র বীর-চরিত্র
অষ্ট সর্গ,
কৈল খণ্ড তোমার চণ্ড
নয়ন খড়্গ।
রৈল মাত্র দিবারাত্র
প্রেমের প্রলাপ,
দিলেম ফেলে ভাবী কেলে
কীর্তি কলাপ।
হায় রে কোথা যুদ্ধকথা
হৈল গত
স্বপ্ন মত।

তাঁর গান ও গীতরচনা তাঁর প্রতিভা ও শক্তির আর একটি দিক্। ধর্ম, দেশভক্তি, প্রেম, প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি দু-হাজার বা আরো বেশী বহু ও বিচিত্রভাবোদ্দীপক গান বেঁধেছেন ও তাতে সুর দিয়েছেন। ছয় শত গানের রচয়িতা শুবার্টকে পাশ্চাত্য মহাদেশের

লোকেরা পৃথিবীর সবচেয়ে অধিক গানের রচয়িতা মনে করে। রবীন্দ্রনাথ তার প্রায় চারগুণ গান বেঁধেছেন। বয়সকালে তাঁর গলাও ছিল চিত্তহারী, চমৎকার ও বিস্ময়কর। তিনি চলতি অর্থে ওস্তাদ নন—যদিও ওস্তাদী গানের শিক্ষা তাঁর হয়েছিল ও ওস্তাদী তিনি বুঝেন। গানের কথা সৃষ্টি, সুর সৃষ্টি, এবং কণ্ঠে কথা ও সুরের সাহায্যে বহু বিচিত্র ধ্বনিরূপের সৃষ্টি—এই ত্রিবিধ কৃতিত্বের সমাবেশে এদেশে তাঁকে অদ্বিতীয় সংগীতস্রষ্টা ব'লে মনে করি।

আমরা অনেকেই কেবল নয়নগোচর রূপ দেখি, রবীন্দ্রনাথ অধিকন্তু শ্রবণগোচর রূপও দেখেন। তাঁর গানগুলির দ্বারা তিনি বাংলা দেশকে বহুপরিমাণে গ'ড়েছেন। তাঁর অনেক গানে ভগবদ্ভক্তি ও দেশপ্রীতির অপূর্ব মিশ্রণ দেখা যায়; যেমন নিম্নলিখিত গীতাংশে।

"পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী
হে চির সারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব মাঝে, তব শঙ্খধ্বনি বাজে,
সংকটদুঃখত্রাতা।
জনগণদুঃখ-ত্রায়ক জয় হে, ভারতভাগ্যবিধাতা।

তিনি ছিলেন সুনিপুণ অভিনেতা এবং অভিনয়ের সুদক্ষ শিক্ষক। কবিতার আবৃত্তিতে এবং প্রবন্ধ, গল্প, নাটক ও উপন্যাসের পঠনে তিনি সুদক্ষ ছিলেন। সাধারণ কথাবার্তায় তিনি সুরসিক ছিলেন। তাঁর সাধারণ কথাবার্তাও ছিল। সাহিত্যধর্মী ও সুরসাল। ভাব ও চিন্তার ব্যঞ্জক বহুবিধ সুরুচিপূর্ণ কলাসম্মত মনোজ্ঞ নৃত্যের তিনি স্রষ্টা ও শিক্ষক। দৈহিক সামর্থ্য যত দিন ছিল, নিজেও নৃত্যনিপুণ ছিলেন।

প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে তাঁর প্রতিভার একটা নূতন দিক্ খুলে যায়। তা চিত্রাঙ্কন। তাঁর চিত্র পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য কোন শ্রেণীতে পড়ে না, কারো কাছে শেখা নয়। এ তাঁর নিজস্ব। তাঁর চিত্রাবলী সাধারণতঃ কোন গল্প বলে না ব'লে সর্বসাধারণের বোধগম্য ও উপভোগ্য না-হ'লেও বিদেশে ও এদেশে সমঝদারেরা এর অসাধারণ গুণ মানেন।

বঙ্গের আধুনিক চিত্রকলার উৎপত্তি যে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রাণনা থেকে, সে সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বাংলার কবি (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ) আর্টের সূত্রপাত কল্লেন, বাংলার আর্টিস্ট (অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথ) সেই সূত্র ধরে একলা একলা কাজ করে চল্লো কত দিন।"

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্যে তিনি যা করেছেন, অন্য কোন লেখক তা করেন নি। তাঁর লেখায় বাংলা সাহিত্য প্রাদেশিকতা ও দেশিকতা অতিক্রম ক'রে সমগ্র বিশ্বের দরবারে পৌঁছেছে। তার মধ্যে সমগ্রজাগতিক ভাব ও চিন্তার ধারা খেলছে, অথচ যা একান্ত বঙ্গের ও ভারতের, তাও তাতে আছে।

যদি কোন বিদেশী কেবল তাঁর লেখা পড়বার জন্যেই বাংলা শেখেন, তা হ'লেও তাঁর শ্রম সার্থক হবে।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পর স্বদেশী আন্দোলনে তিনি রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে কর্ম্মী রূপে নেমেছিলেন। যখন সন্ত্রাসনবাদ মূর্ত্ত হ'ল, তখন তিনি তার প্রকাশ্য প্রতিবাদ ক'রলেন। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে কর্মী তিনি বেশী দিন থাকেন নাই, কিন্তু তাতে বরাবর অন্যতম চিন্তানায়ক ছিলেন—এ বৎসরও মৃত্যুর কিছুদিন আগেও ছিলেন। জালিয়ানওয়ালা-বাগের কাণ্ডের প্রতিবাদ তিনিই প্রথমে করেন এবং তার কার্যতঃ প্রতিবাদস্বরূপ নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। যে-সব সভায় তাঁর অধিনায়কত্বের প্রয়োজন হয়েছে, তাতে অল্প দিন আগেও তিনি সভাপতি হয়েছেন। সম্প্রতিও তাঁর বাণী, উপলক্ষ্য ঘটলেই, সকল দেশভক্তকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছে।

রাষ্ট্রকে অবস্থাবিশেষে কর দেওয়া বা না-দেওয়ার প্রজাদের অধিকার এবং স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব ও বন্ধন বরণ এবং তার গৌরব ও আনন্দ, তিনি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকে প্রথম এবং পরে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে "পরিত্রাণ" নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর মুখে ব্যক্ত করেন। 'মুক্তধারা" নাটকেও ধনঞ্জয় বৈরাগী এই রকম কথা ব'লেছেন।

তাঁর "প্রায়শ্চিত্ত" নাটক তাঁর "বৌ ঠাকুরাণীর হাট" নামক আরও কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত উপন্যাসের গল্প অবলম্বন ক'রে লিখিত। এই নাটকটির বিজ্ঞাপনের তারিখ ৩১শে বৈশাখ, সন ১৩১৬ সাল।

"প্রায়শ্চিত্ত" নাটক থেকে কিছু উদ্ধৃত কচ্ছি।

পথপার্শ্বে ধনঞ্জয় বৈরাগী ও মাধবপুরের এক দল প্রজা।

তৃতীয় প্রজা। বাবা, আমরা রাজাকে গিয়ে কী বলব?

ধনঞ্জয়। বলব, আমরা খাজনা দেব না।

তৃ প্র। যদি শুধোয়, কেন দিবি নে?

ধনঞ্জয়। বলব, ঘরের ছেলেমেয়েকে কাঁদিয়ে যদি তোমাকে টাকা দিই, তা হ'লে আমাদের ঠাকুর কষ্ট পাবে। যে অন্নে প্রাণ বাঁচে, সেই অন্নে ঠাকুরের ভোগ হয়; তিনি যে প্রাণের ঠাকুর। তার বেশি যখন ঘরে থাকে তখন তোমাকে দিই—কিন্তু ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খাজনা দিতে পারব না।

চতুর্থ প্রজা। বাবা, একথা রাজা শুনবে না।

ধনঞ্জয়। তবু শোনাতে হবে। রাজা হয়েছে বলেই কি সে এমন হতভাগা যে ভগবান তাকে সত্য কথা শুনতে দেবেন না। ওরে, জোর করে শুনিয়ে আসব।

পঞ্চম প্রজা। ও ঠাকুর, তাঁর জোর যে আমাদের চেয়ে বেশি—তাঁরই জিত হবে।

ধনঞ্জয়। দূর বাঁদর, এই বুঝি তোদের বুদ্ধি। যে হারে তার বুঝি জোর নেই। তার জোর যে একেবারে বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত পৌঁছয় তা জানিস্।

ষষ্ঠ প্রজা। কিন্তু ঠাকুর, আমরা দূরে ছিলুম, লুকিয়ে বাঁচতুম—একেবারে রাজার দরজায় গিয়ে পড়ব, শেষে দায়ে ঠেক্‌লে আর পালাবার পথ থাকবে না।

ধনঞ্জয়। দেখ পাঁচকড়ি, অমন চাপাচুপি দিয়ে রাখলে ভাল হয় না। যতদূর পর্যান্ত হবার তা হতে দে, নইলে কিছুই শেষ হতে চায় না। যখন চূড়ান্ত হয়, তখনি শান্তি হয়।

আর এক অঙ্কের আর একটি দৃশ্য থেকে কিছু উদ্ধৃত করি।

প্রতাপাদিত্য। দেখ বৈরাগী, তুমি অমন পাগ্‌লামি ক'রে আমাকে ভোলাতে পারবে না। এখন কাজের কথা হোক্। মাধবপুরের প্রায় দু-বছরের খাজনা বাকি —দেবে কি না বল।

ধনঞ্জয়। না মহারাজ, দেব না।

প্রতাপ। দেবে না। এত বড় আস্পর্দ্ধা!

ধনঞ্জয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

প্রতাপ। আমার নয়!

ধনঞ্জয়। আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কি ব'লে।

প্রতাপ। তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে!

ধনঞ্জয়। হাঁ মহারাজ, আমিই ত বারণ করেছি। ওরা মুর্খ, ওরা ত বোঝে না—পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমিই বলি, আরে আরে এমন কাজ করতে নাই—প্রাণ দিবি তাঁকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি- তোদের রাজাকে প্রাণহত্যার অপরাধী করিস্ নে।

ধনঞ্জয় বৈরাগী যখন বললেন তিনিই প্রজাদিগকে খাজনা দিতে বারণ করেছেন, তখন প্রতাপাদিত্য ক্রুদ্ধ হ'যে বললেন, "দেখ ধনঞ্জয়, তোমার কপালে দুঃখ আছে।" ধনঞ্জয় যথাযোগ্য উত্তর দিবার পর—

প্রতাপ। দেখ বৈরাগী তোমার চাল নেই চুলো নেই—কিন্তু এরা সব গৃহস্থ মানুষ, এদের কেন বিপদে ফেলতে চাচ্ছ? (প্রজাদের প্রতি) দেখ বেটারা, আমি বলচি তোরা সব মাধবপুরে ফিরে যা। বৈরাগী, তুমি এইখানেই রইলে। (ধনঞ্জয় বন্দী হইলেন)

আগুন লেগে কারাগার ভস্মসাৎ হওয়ায় ধনঞ্জয় বৈরাগী বাইরে এসেছেন।

ধনঞ্জয়। জয় হোক্ মহারাজ। আপনি ত আমাকে ছাড়তেই চান না, কিন্তু কোথা থেকে আগুন ছুটীর পরোয়ানা নিয়ে হাজির। কিন্তু না বলে যাই কি করে? তাই হুকুম নিতে এলুম।

প্রতাপ। ক'দিন কাট্‌ল কেমন?

ধনঞ্জয়। সুখে কেটেছে—কোন ভাবনা ছিল না। এ সব তার লুকোচুরি খেলা—ভেবেছিল গারদে লুকবে, ধরতে পারব না—কিন্তু ধরেছি চেপে ধরেছি, তার পর খুব হাসি, খুব গান। বড় আনন্দে গেছে আমার গারদ ভাইকে মনে থাকবে।

(গান)

(ওরে) শিকল, তোমায় কোলে করে
দিয়েছি ঝঙ্কার।
(তুমি) আনন্দে ভাই রেখেছিলে ভেঙে অহঙ্কার।
তোমায় নিয়ে ক'রে খেলা
সুখে দুঃখে কাটল বেলা,
অঙ্গ বেড়ি, দিলে বেড়ি
বিনা দামের অলঙ্কার।

তোমার পরে করি নে রোষ,
দোষ থাকে ত আমারি দোষ,
ভয় যদি রয় আপন মনে
তোমায় দেখি ভয়ঙ্কর।
অন্ধকারে সারা রাত্তি
ছিলে আমার সাথের সাথী
সেই দয়াটি স্মরি তোমায়
করি নমস্কার।

প্রতাপ। বল কি বৈরাগী, গারদে তোমার এত আনন্দ কিসের ?

ধনঞ্জয়। মহারাজ, রাজ্যে তোমার যেমন আনন্দ, তেমনি আনন্দ, অভাব কিসের ? তোমায় সুখ দিতে পারেন, আর আমাকে সুখ দিতে পারেন না ?

"অস্পৃশ্যতা"র বিরুদ্ধে আন্দোলন ব্রাহ্মসমাজের জাতিভেদবিরোধী আন্দোলনের অন্তর্গত। এই প্রেরণা স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে ত্রিশ বৎসর পূর্বে রচিত "গীতাঞ্জলি"র অন্তর্গত সেই কবিতায় যার গোড়ায় আছে,

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হোতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান
অপমানে হোতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

"গীতাঞ্জলি"র ইংরেজি অনুবাদ দ্বারাই তিনি বিশ্ব-সাহিত্যিকবাঞ্ছিত নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। এত বড় ইংরেজি লেখক তিনি ছিলেন এবং ইংরেজি লেখার জন্যে ১৭।১৮ বৎসর বয়সেই বিখ্যাত অধ্যাপক হেনরি মর্লির ছাত্র হিসাবে তাঁর প্রশংসা পেয়েছিলেন, কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত নিজের ইংরেজি লেখার ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। কী আলোকসামান্য নম্রতা!

দীনদরিদ্র নিরক্ষর লোকদের প্রতি তাঁর প্রীতি শ্রদ্ধা সমবেদনা করুণা যে তাঁর কত রচনাতে আছে, তা সংক্ষেপে উল্লেখ করাও কঠিন। ঐ "গীতাঞ্জলি"তেই আছে,

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব হারাদের মাঝে।"

আরো আছে,

"তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।"

গত ফাল্গুনের "প্রবাসী"তে প্রকাশিত তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ "ঐকতান" কবিতাতে আছে ঃ—

"চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি ব'সে তাঁত বোনে জেলে ফেলে জাল,
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।"

সাধারণ লোকদের সম্বন্ধে তাঁর এই রকম নানা কথা শুধু পুঁথিগত নয়। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ" ইত্যাদি লম্বাচৌড়া রব দেশে উঠবার অনেক আগে থেকেই তাঁর পরিবারে ও শান্তিনিকেতনে 'অস্পৃশ্য" পাচক ও অন্যান্য ভৃত্য বরাবর নিযুক্ত হযে আসছে অবাধে।

যে-সকল নারীকে সমাজ পতিতা বলে (কিন্তু দুশ্চরিত্র পুরুষকে পতিত বলে না) তাদের প্রতি কবির করুণার অন্ত নাই। তার পরিচয় তাঁর "চতুরঙ্গ" গ্রন্থের ননীবালার কাহিনীতে পাই, আর পাই "কাহিনী" গ্রন্থের 'পতিতা' কবিতায় এবং "চৈতালী"র 'করুণা' ও 'সতী' কবিতা দুটিতে। আরো দৃষ্টান্ত আছে।

রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য ও পরিচালনা নিরপেক্ষ ভাবে দেশের—বিশেষ ক'রে পল্লীর, হিতকর কাজ করবার প্রয়োজন ও পদ্ধতি তিনি অসহযোগ আন্দোলনের বহু পূর্বে নির্দেশ ক'রে নিজের জমিদারীতে ও সুরুলে তদনুসারে কাজ করিয়ে এসেছিলেন। সরকারী রিপোর্টে পর্যন্ত তাঁর জমিদারী ব্যবস্থার প্রশংসা বেরিয়েছিল। তিনি রেযৎ প্রজাদের খুব প্রিয় ছিলেন। তার একটা সত্যি গল্প বলি। একবার এক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর সঙ্গে তাঁর জমিদারী দেখতে যান। তাঁর যে প্রজার উপরে তাঁদের যানবাহনের ব্যবস্থা করবার ভার ছিল, সে একখানি মাত্র পাল্কি এনে হাজির করে। তার ধারণা তাদের রাজার সঙ্গে যে যাবে সে হেঁটে যাবে, হোক্ না কেন সে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট্। রবীন্দ্রনাথ অনেক বলা-কওয়ায় সেই প্রজা সাহেবের জন্য শেষ পর্যন্ত একটা বেতো ঘোড়া এনেছিল।

পাবনার যে প্রসিদ্ধ প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে তিনি সভাপতির কাজ করেন এবং বাংলা ভাষায় সভাপতির অভিভাষণ রচনা ও পাঠের প্রথম দৃষ্টান্ত দেখান, তাতে তাঁর কর্মপদ্ধতি তিনি সভার সম্মুখে উপস্থিত করেন। তার পরও তাঁর অনেক বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে তিনি এই সব কথা বলেছেন। বিশ্বভারতীর একটি প্রধান বিভাগ শ্রীনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত গ্রামোন্নয়ন বিভাগ। কৃষি, পল্লীস্বাস্থ্য, পল্লীশিল্প গ্রামে দরকারমত কৃষকদের মূলধন সরবরাহ, ইত্যাদি কাজ এই বিভাগ ক'রে থাকেন।

তিনি অসহযোগ আন্দোলনের, এবং ছাত্রদের স্কুল-কলেজ বর্জনের সমর্থন কখনও করেন নি।

অন্তর্জাতিকতা নামে অভিহিত তাঁর বিশ্বমানবপ্রেমের আভাস তাঁর অনেক আগের রচনাতেও পাওয়া যায়, কিন্তু স্পষ্ট পাওয়া যায় "প্রবাসী"র প্রথম সংখ্যার জন্যে প্রায় এক চল্লিশ বৎসর আগে লিখিত সেই কবিতায় যার গোড়ায় আছে,

"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া,
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।"

তিনি তাঁহার "ন্যাশন্যালিজ্‌ম্‌" নামক ইংরেজী গ্রন্থে সেই স্বাজাতিকতাই গর্হিত বলেছেন যা বিদেশ ও বিজাতির ধন গ্রাস করতে ও তাদের উপর প্রভুত্ব করতে চায়। সব সাম্রাজ্যবাদ এর অন্তর্গত এবং নাৎসিবাদ সর্বাধম সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত। পরদেশদ্রোহিতা না-ক'রে যে স্বাজাতিকতা স্বদেশের কল্যাণ করতে চায়, কথায়, কাব্যে, বক্তৃতায়, গানে ও কাজে চিরদিনই তিনি তার সমর্থক ও অন্যতম প্রধান অনুপ্রাণক। তাই তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে "নৈবেদ্য" গ্রন্থে প্রার্থনা করতে পেরেছিলেন,

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়;
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করে নি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।"

তিনি ভারতকে সেই স্বর্গে জাগরিত দেখার আনন্দ সম্ভোগ ক'রে যেতে পান নাই, একথা আমরা যেন কখনো না ভুলি।

বাহ্য রাষ্ট্রনৈতিক বন্ধন হ'তে মুক্তি তাঁর স্বাধীনতার আদর্শের নিশ্চয়ই অন্তর্গত; কিন্তু সামাজিক ও আন্তরিক সর্ববিধ দাসত্ব হ'তে মুক্তি এর অস্থিমজ্জা। দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা তিনি সর্বান্তঃকরণে চাইতেন।

ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের যে যে ব্যবহার নিন্দনীয় তিনি তার তীব্র নিন্দা করেছেন, কিন্তু ইংলণ্ডের ও ইংরেজ জাতির গুণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

সেইরূপ পাশ্চাত্য দেশসমূহের এবং তাঁদের রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির নিন্দনীয় দিক্‌গুলির নিন্দা তিনি করেছেন, কিন্তু তাদের বিজ্ঞানের ও জিজ্ঞাসুতার, জনসেবার ও সংস্কৃতির এবং মনুষ্যত্বকে সম্মানদানের যথাযোগ্য গুণগ্রাহীও তিনি ছিলেন।

পাশ্চাত্যের নিকট হ'তে তিনি নিতে রাজী—ভিক্ষুকের মত নয়, কিন্তু মিত্রের মত—ভারতবর্ষ তাদিগকেও কিছু দিতে পারে ব'লে।

পাশ্চাত্য 'সভ্যতা' সম্বন্ধে তাঁর শেষ উক্তি গত ১লা বৈশাখের অভিভাষণ "সভ্যতার সংকট" সাতিশয় বেদনাপূর্ণ; কিন্তু তিনি তাতেও মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্যের কথা বলেন নাই। তাতে বলেছেন ঃ—

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা এক দিন না এক দিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে! একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষে করব। আশা করব, মহা প্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর এক দিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম ব'লে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ ব'লে যাব প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারি প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে,

'অধর্মেণৈধতে তাবৎ, ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥"

তিনি ছিলেন সমুদয় বিদেশীবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে। তাঁর এই উদার ভাব তাঁর নানা রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। তার মধ্যে তাঁর "ভারত-তীর্থ" নামক কবিতাটি সুবিদিত। তার দুটি কলি উদ্ধৃত ক'রব।

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হোল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন—
শক হুন-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হোলো লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে,
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর তীরে।
এসো হে আর্য, এসো অনার্য,
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খ্রীষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি কবি' মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক অপনীত
সব অপমান-ভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা।
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র-করা
তীর্থ নীরে।
আজি ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে।

তিনি চীন জাপান জাভা বালী ও ভারত-মহাসাগরের অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতির সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ পুনঃস্থাপনের যথাসাধ্য চেষ্টা কায়মনোবাক্যে ক'রে গেছেন।

অনেক বৎসর আগে তিনি শান্তিনিকেতনে যে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম স্থাপন করেন, তাই পরে বিশ্বভারতীতে পরিণত হ'য়েছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন আশ্রমসমূহের আদর্শের ভিত্তির উপর এর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। এখানে শিক্ষালাভ আনন্দে হবে; অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীরা

সরল, অনলস, বিলাসিতাবিহীন জীবন যাপন করবেন; অধ্যাপকদের প্রভাব বিদ্যার্থীদের উপর ও বিদ্যার্থীদের প্রভাব অধ্যাপকদের উপর পড়বে; সকল ঋতুতে প্রকৃতির প্রভাব তাঁরা অনুভব করবেন; ভারতের ও অন্য সকল দেশের জ্ঞানের ও ভাবের নানা প্রবাহ এখানে অবাধে প্রবাহিত হবে; সকলে শ্রদ্ধাবান্ ও শুচি থাক্‌বেন এক ও অসীমের চরণে মাথা নত ক'রে; এখানকার শিক্ষা শুধু পণ্ডিত প্রস্তুত করবে না, আত্মনির্ভরশীল উপার্জ্জকও প্রস্তুত করবে; শুধু জ্ঞানের চর্চ্চা এখানে হবে না, সঙ্গীত-চিত্রকলা-আদি সুকুমার কলার অনুশীলনও হবে; আবার, বস্ত্রবয়ন-আদি নানাবিধ কারুশিল্প ও কৃষি শিক্ষা দেওয়া হবে এবং গ্রামগুলিকে স্বাস্থ্যে সচ্ছলতায় সৌন্দর্যে আবার আনন্দের নিলয় করবার চেষ্টা হবে; অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীরা কেবল জ্ঞাতা ও জিজ্ঞাসু হবেন না, কর্ম্মী ও স্রষ্টাও হবেন; বিদ্যার্থীরা ব্যষ্টি-ও-সমষ্টি-গত ভাবে যথাসম্ভব স্বশাসক হবেন;—সংক্ষেপে বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য এইরূপ।

এখানে ছাত্রছাত্রীরা পৃথক্ পৃথক্ আবাসে থেকে শিক্ষা লাভ করেন একত্র। ভারতবর্ষের সকল প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ের সংস্কৃতির অনুশীলন এখানে হয়, চীন তিব্বত প্রভৃতি বিদেশের সংস্কৃতির অনুশীলনও হ'যে থাকে। এখানে ছাত্রছাত্রীদের নানা রকম ব্যায়াম ও খেলার ব্যবস্থা আছে, গ্রামসেবার সুযোগ আছে।

১৯২৪ সালে বিশ্বভারতীর অন্যতম অঙ্গ রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষাসত্র" নামক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ইহার একটি প্রধান মন্ত্র—

> প্রথম হইতেই শিশু কারুশিল্পে ও গৃহশিল্পে শিক্ষানবীশ রূপে শিক্ষাসত্রে প্রবেশ করিবে। শিল্পশালায় সে শিক্ষিত-উৎপাদক ও সম্ভাব্য-স্রষ্টারূপে দক্ষতা অর্জ্জন এবং নিজের হাত দুটির স্বাধীনতা লাভ করিবে, , আবার, যে বাসগৃহ ও তাহার আসবাব প্রস্তুত করিতে ও তাহার ঘরকন্না চালাইতে সে সাহায্য করিবে, তাহার অধিবাসীরূপে সে চিত্তের প্রসার এবং শিক্ষাসত্ররূপ ক্ষুদ্র পুরীর পৌরজনের অধিকারও সে অর্জ্জন করিবে। (অনুবাদ)।

বিশ্বভারতীর ৯-সংখ্যক বুলেটিনে শিক্ষাসত্রের সমুদয় বৃত্তান্ত আছে। তাতে দেখা যায়, গৃহকর্ম ও নানাবিধ শিল্পের ভিতর দিয়ে বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয় শিখবার ব্যবস্থা আছে। ছোট শিশুদিগকে ও অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেমেয়েদিগকে কি কি শিল্প শিখান যেতে পারে, তার তালিকা আছে। সুতা কাটা, কাপড় বোনা, ছুতরের কাজ, প্রভৃতি তার অন্তর্গত। লেখাপড়া শিখাবার ব্যবস্থাও অবশ্য আছে। যাঁরা শিক্ষাসত্র সম্বন্ধে সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জানতে চান, তাঁরা বিশ্বভারতী বুলেটিনের ৯ ও ২১ সংখ্যা দেখবেন।

বিশ্বভারতীর বুলেটিন দুটিতে, শিক্ষাসত্র স্থাপন কেন করা হ'য়েছে, তা, এবং এর মূলগত শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপ্রণালী যা লিখিত হ'য়েছে, তাতে শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং শিশুস্বভাব, বালস্বভাব ও মানব-মন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় আছে। তা সত্ত্বেও এইরূপ প্রতিষ্ঠান দেশের লোকদের ও নেতাদের দৃষ্টি কেন আকর্ষণ করে নাই,

কেন এর আদর্শ বহু স্থানে অনুসৃত হয় নাই, তা চিন্তনীয়। এ বিষয়ে আমাদের একটা অনুমান লিখছি।

এর পশ্চাতে কোন রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও আন্দোলন এবং বড় কোন রাজনীতিকের নামের প্রভাব নাই ;—এতে বলা হয় নাই, যে, শিক্ষাসত্রের অনুযায়ী শিক্ষা দিলে পূর্ণস্বরাজ পাওয়া যাবে ও দেশ স্বাধীন হবে। মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পিত ওআর্ধা স্কীমের উক্ত সুবিধাগুলি আছে—যেমন তাঁর চরখা ও খাদি প্রচারের সমর্থক অর্থনৈতিক যুক্তির সঙ্গে চরখা ও খাদি দ্বারা দেশ স্বাধীন হবে, এই রাজনৈতিক উক্তিও আছে।

বিশ্বভারতীতে ছাত্র ও ছাত্রীরা কেন গীতবাদ্য, নৃত্য ও অভিনয় করে এবং সেখানে এইগুলি শিখাবার ব্যবস্থা কেন করা হয়েছে, সে-বিষয়ে অনেকের স্পষ্ট ধারণা নাই। এ বিষয়ে কবি চীনদেশের অন্যতম প্রধান নেতা মহামান্য তাই চি তাও মহাশয়কে একটি পত্রে লিখেছিলেন :—

Tonight we shall present before you another aspect of our ideal where we seek to express our inner self through song and dance. Wisdom, you will agree is the pursuit of completeness ; it is in blending life's diverse work with the joy of living. We must never allow our enjoyment to gather wrong associations by detachment from educational life, in Santiniketan, therefore, we provide our own entertainment, and we consider it a part of education to collaborate in perfecting beauty We believe in the discipline of a regulated existence to make our entertainment richly creative.

In this we are following the ancient wisdom of China and India, the *Tau*, or the True Path, was the golden road uniting arduous service with music and merriment. Thus in the hardest hours of trial you have never lost the dower of spiritual gaiety which has refreshed your manhood and attended upon your great flowerings of civilisation Song and laughter and dance have marched along with rare loveliness of Art for centuries of China's history In India Sarasvati sits on her lotus throne, the goddess of Learning and also of Music, with the Golden Lyre—the *Veena*—on her lap. In both countries, the arcana of light have fallen on divinity of human achievements And that is Wisdom

দৈহিক আত্মরক্ষা বিষয়ে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা এবং পরোক্ষ ভাবে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্কেরাও যাতে অন্য যে-কোন দেশের লোকদের সমকক্ষ হয়, রবীন্দ্রনাথের সে দিকে দৃষ্টি ছিল। তিনি স্বয়ং ছেলেবেলা ও কৈশোরে বাড়ার পালোয়ানদের সঙ্গে কুস্তি করতেন। বিশ্বভারতীতে ছেলেমেয়েদের জাপানী জিউজিৎসু শেখাবার জন্যে তিনি জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক জন জিউজিৎসু-ওস্তাদ আনিয়েছিলেন। তাঁর কাছে অনেক ছেলেমেয়ে বেশ জিউজিৎসু শিখেছিল। অধ্যাপকেরাও ২।১ জন, যেমন স্বর্গগত গৌরগোপাল ঘোষ, বেশ শিখেছিলেন। আমরা কবিকে দুঃখ করতে শুনেছি যে, বিশ্বভারতীর বাইরে স্বদেশবাসীরা

এত বড় জাপানী জিউজিৎসুবিদের কাছে আত্মরক্ষার নানা কৌশল শিখতে আগ্রহ দেখান নাই।

লাঠি খেলা, ছোরা থেকে আত্মরক্ষা, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদির কৌশল কবির সামনে ছাত্রছাত্রীদিগকে দেখাতে আমরা দেখেছি। শান্তিনিকেতনই তাদের এ সকলের শিক্ষার স্থান। বিশ্বভারতীর কোন কোন ছাত্রকে সার্কাসের শক্ত শক্ত ব্যায়াম ও দুঃসাহসের কাজ করতে আমরা দেখেছি। শান্তিনিকেতনের ফুটবল খেলোয়াড়রা মফস্বলের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের অন্যতম। শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক খেলাধূলার মধ্যে নানা রকম দৌড় এবং তীর দিয়ে লক্ষ্যভেদের প্রতিযোগিতা হ'য়ে থাকে।

আগে আগে কবি শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের থাকবার ঘরে তাদিগকে গল্প বলতেন; তা ছাড়া কিছু দূরের খোলা মাঠে বা স্বাভাবিক কোন কুঞ্জেও বলতেন। সেখান থেকে ফিরবার সময় ছেলেরা কখন কখন তাঁকে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় আহ্বান করত। এ ৩০।৩৫ বৎসর আগেকার কথা। দৌড়ে তিনিই সব বারেই জিততেন। তিনি তখন বলিষ্ঠ, কর্মিষ্ঠ পুরুষ, বোলপুর ষ্টেশন থেকে হেঁটে শান্তিনিকেতন যাতায়াত করতেন।

ছাত্রদের মধ্যে স্বশাসন তিনি প্রবর্তিত করেন। তাদের নিজেদের নায়ক ও অধিনায়ক এবং তাদের দোষত্রুটির বিচারের জন্যে তাদেরই দ্বারা তাদেরই মধ্য থেকে বিচারক নির্বাচন প্রথা তিনি প্রবর্তিত করেন। ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার সময় তাদের উপর কোন পাহারা না রেখে তাদের সততা ও আত্মসম্মানের উপর নির্ভর করার প্রথাও তিনি প্রবর্তিত করেন।

ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির রূপ পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে তাঁর প্রভাব অনুভব সম্বন্ধে সকলকে জাগরিত করবার জন্যে কবি ঋতু-উৎসবগুলি প্রবর্তন করেন,—যেমন বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্ত-উৎসব।

আর্তের সেবা, রোগীর সেবাশুশ্রূষা তিনি শুধু বাক্যে প্রচার ক'রে ক্ষান্ত হন নি, কাজেও করেছেন। তার একটি অনুপ্রাণনাপূর্ণ আখ্যান এই মাসের প্রবাসীর কষ্টিপাথরে দেওয়া হয়েছে।

তাঁকে "গুরুদেব" সম্বোধন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় আরম্ভ করান, ও সতীশচন্দ্র রায় প্রচলিত করেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রত্যহ একা একা ১৫ মিনিট ধ্যানের এবং সকালসন্ধ্যা সম্মিলিত স্তবগান দ্বারা উপাসনা রবীন্দ্রনাথ নিজের বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত করেন।

বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের জন্য কবি "লোকশিক্ষা-সংসদ" স্থাপন ক'রে গেছেন। এর জন্যে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়েছে। এর অশেষ সম্ভাব্যতা আছে।

কবি বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা শুধু এ অর্থে নয়, যে, এর আদর্শ ও পরিকল্পনা তাঁর, এবং তিনি এর জন্যে যথাসাধ্য টাকা দিয়েছেন, টাকা সংগ্রহ করেছেন, ঘরবাড়ী বানিয়েছেন; পরন্তু এই অর্থেও যে, তিনি এর জন্যে শেষ পর্যন্ত পরিশ্রম করেছেন; এর কেরানীগিরি পর্যন্ত ক'রেছেন; স্বয়ং ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে অসাধারণ নৈপুণ্য ও ধৈর্য সহকারে পড়িয়েছেন; কিছুদিন গান, অভিনয়, নৃত্য শিখিয়েছেন; তাদের সভায় সভাপতিত্ব করেছেন; তাদের গল্প ব'লে চিত্তবিনোদন করেছেন; তাদের সঙ্গে খেলা করেছেন; মন্দিরে উপাসনা ও ভাষণ দ্বারা অনুপ্রাণনা দিয়েছেন; তাঁর স্বর্গগতা সহধর্মিণী প্রথম অবস্থায় নিজের অলঙ্কার এই প্রতিষ্ঠানকে দিয়েছেন এবং অধ্যাপক ও ছাত্রদেরকে দিনের পর দিন পরম সমাদরে স্বহস্তে রেঁধে খাইয়েছেন। দেহমনের অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যের অধিকারী কবির অন্য ব্যসন তো ছিলই না, পান তামাকের অভ্যাস পর্য্যন্ত না-থাকায় তিনি সকলের আদর্শ 'গুরুদেব' ছিলেন।

কবি দ্বাদশ বার পৃথিবীর নানা দেশে বেড়িয়ে ভারতের লোকদের সহিত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকদের যোগ স্থাপন ও বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। তিনি ছিলেন পৃথিবীর জাতিসমূহের অন্যতম আন্তর বন্ধনরজ্জু এবং উদ্যোগী জগৎশান্তিকামী।

তাঁকে সবাই কবি ব'লেই জানে; তিনি যে কিরূপ পণ্ডিত, কত রকমের কত বই তিনি পড়েছিলেন, তা লোকে জানে না। তাঁর কবিত্বখ্যাতি না থাক্‌লে পাণ্ডিত্যখ্যাতি র'ট্‌ত। বাংলা ও সংস্কৃত ছাড়া কত বিষয়ের বই তিনি শুধু ইংরেজীতেই পড়েছিলেন, ইংরেজীতে তার একটা ফর্দ দিচ্ছি।

> Farming; philology; history, medicine, astrophysics; geology, bio-chemistry; entomology; co-operative banking, sericulture, indoor decorations, production of hides, manures, sugarcane, and oil; pottery; weaving looms, lacquer work; tractors; village economics; recipes for cooking; lighting; drainage; calligraphy; plant-grafting; meteorology; synthetic dyes; parlour-games; Egyptology; road-making, incubators; wood-blocks; elocution; stall-feeding; jiu-jitsu; printing; etc

এ সকল ছাড়া সাহিত্য বলতে সাধারণতঃ যা বুঝায়, তা ত পড়তেনই। ১৯২৬ সালে অক্টোবর মাসে ভিয়েনাতে তিনি যখন পীড়িত ছিলেন, তখন তাঁকে শুয়ে শুয়ে কত বই-ই যে পড়তে দেখেছিলাম, বলতে পারি না।

উপরে তাঁর অধীত নানা বিষয়ের যে ইংরেজী তালিকা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে চিকিৎসা-বিদ্যা একটি। হোমিওপাথির বড় বড় বই তিনি দস্তুরমত অধ্যয়ন করেছিলেন, বায়োকেমিক্যাল চিকিৎসাও ভাল জানতেন। চিকিৎসা করতেনও ভাল। কখন কখন রহস্য ক'রে বল্‌তেন, "আমি ফী নেই না ব'লে আমার প্রশংসা বা পসার হয় নি।"

ইংরেজি ফর্দটির মধ্যে রান্নার পাঁতি ও "সুন্দর হস্তাক্ষর" (calligraphy) এর উল্লেখ আছে। তিনি নানা রকম রান্নার পরীক্ষা করতেন। নানান্ খাদ্যের গুণাগুণ পরীক্ষাও করতেন। এক সময়ে নিমপাতা তাঁর একটি প্রধান খাদ্য ছিল। চিনির চেয়ে গুড় তিনি বেশি ভালবাসতেন। ভাতের ফেন ফেলে দেওয়ার নিন্দা করতেন। এক সময় বেগুন তেলের ময়েন দেওয়া রুটি খেতেন। তাঁর অতি সুন্দর বাংলা ও ইংরেজী হাতের লেখার কথা কোন্ বাঙালী না জানে?

প্রায় ২৩ বৎসর পূর্বে আমি শান্তিনিকেতনে অনেক সময় থাকতাম। তাঁর বাড়ীর সামনেই একটা বাড়ীতে থাকতাম—মধ্যেখানে ছিল একটা মাঠ। তিনি তখন এমন পরিশ্রমী ছিলেন যে, এক দিনও রাত্রে তাঁর লেখবার পড়বার ঘরের আলো আমার শুতে যাবার আগে নিবতে দেখি নি। প্রত্যুষে বেড়াতে গিয়ে দেখেছি, হয় তিনি বারাণ্ডায় উপাসনায় বসেছেন নতুবা উপাসনা সেরে লেখা বা পড়ার কাজে লেগে গেছেন। সেকালে দুপুরে খাবার পরও তাঁকে কখনো শুতে বা হেলান দিতে দেখি নি, গ্রীষ্মে কাউকে তাঁকে পাখার বাতাস দিতে বা তাঁকে নিজে হাত-পাখা চালাতে দেখি নি। তখন শান্তিনিকেতনে বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা ছিল না। বহু বৎসর পরেও তাঁর শ্রমশীলতায় বিস্মিত হয়েছি। পরে বার্দ্ধক্যে ও ভগ্ন স্বাস্থ্যে তিনি ঠিক তেমনটি ছিলেন না বটে, কিন্তু তখনও অনেক যুবকের চেয়ে তিনি বেশী পরিশ্রম করতেন। এই সেদিনও গান্ধীজী তাঁকে দুপুরে বিশ্রাম করতে অঙ্গীকার করিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর অসামান্য মেধার ও প্রতিভার পরিচয়ও শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে।

ঋষিদের যে আধ্যাত্মিক সত্য দৃষ্টির শক্তি ছিল ব'লে আমরা পড়েছি, রবীন্দ্রনাথের তা ছিল। তাঁর বহু ধর্মোপদেশে, কবিতায় ও সঙ্গীতে তার পরিচয় আছে। বিলাসী তিনি ছিলেন না, আবার কৃচ্ছ্রসাধকও বরাবর ছিলেন না—যদিও নিজের আহার সম্বন্ধে কখন কখন অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা করতেন। জীবনকে তিনি ভালবাসতেন। তিনি বলেছেন,

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

কিন্তু মৃত্যুকেও তিনি মাতৃহস্তের মতই স্নেহময় ও নির্ভরযোগ্য মনে করতেন; তাই মৃত্যুর সম্বন্ধে বলেছেন:—

"সে যে মাতৃপাণি,
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি।
স্তন হতে তুলে নিলে শিশু কাঁদে ডরে,
মুহূর্ত্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।"

ইহলোক ও পরলোক বিশ্বজননীর দুই স্তন। মৃত্যুরূপ হাত দিয়ে তিনি মানুষকে ইহলোক-রূপ এক স্তনের পীযূষের পর পরলোক-রূপ অন্য স্তনের পীযূষ পান করান।

কবিকে আমি সাধক ব'লে জানতাম। কিন্তু বৈরাগ্য তাঁর সাধনার পথ ছিল না। তিনি লিখেছেন :—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"

কবি নারীকুলের—বিশেষ ক'রে বঙ্গনারীদের, দরদী যে কত বেশি ছিলেন, তা বলতে পারি না। তিনি তাদের জন্যে যা ক'রেছেন ও করতে চেয়েছিলেন, তা সংক্ষেপে বলা যায় না। কেবল নারীদের জন্যেই একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলবার ইচ্ছা তাঁর ছিল, অর্থাভাবে তা ঘটে ওঠে নি। বিশ্বভারতীর আর্থিক অসচ্ছলতায় তিনি যখন বড় বেশি উদ্বিগ্ন হ'তেন, তখন তাঁকে বলতে শুনেছি, আর সব তুলে দিয়ে কেবল কলাভবন, সঙ্গীত-ভবন ও নারীদের জন্যে শিক্ষাব্যবস্থাসমেত শ্রীভবনটি রাখবেন।

নারীদের সম্বন্ধে তার আদর্শ কি ছিল? তার বহু কবিতা, উপন্যাস, ছোট গল্পে এ প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। এই প্রসঙ্গে সাধারণত "চিত্রাঙ্গদা"র নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি উল্লিখিত হয়ে থাকে।

"আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সে-ও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সে-ও আমি নহি।"

"মহুয়া"র 'সবলা' কবিতায় অন্য সুরের ঝঙ্কার পাই। ঐ গ্রন্থের 'নাম্নী' কবিতাবলীতে ১৭টি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নারীচিত্র আছে।

"আরোগ্য" গ্রন্থে 'নারী তুমি ধন্যা' কবিতায় সাধারণ গৃহস্থ ঘরের অন্তঃপুরিকাদের মহনীয় বহু স্বরূপের বন্দনা কবি ক'রেছেন।

কবি তাঁর সহধর্মিণীর পরলোকযাত্রার পর "স্মরণ" শীর্ষক কবিতাগুলি লিখেছিলেন, কিন্তু তাতে তাঁর দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের কোন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাঁর অন্য কোনো গ্রন্থেও তা নাই। তাঁর কথাবার্তাতেও তিনি এ বিষয়ে নির্বাক্ থাকতেন। ১৩৪৬ সালের পৌষের "প্রবাসীতে" শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী 'সংসারী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটিতে এই বিষয়ে আলোকপাত ক'রেছেন। তাতে আমরা দেখতে পাই, সহধর্মিণীর প্রতি কবির প্রেম কী গভীর ছিল। কবির সন্তানস্নেহ, ভৃত্যদের প্রতি সদয় ব্যবহার প্রভৃতির সন্ধানও তাতে আছে। কবিকে যাঁরা বুঝতে চান, তাঁদের এই প্রবন্ধটি পড়া একান্ত আবশ্যক। এর থেকে কতকগুলি বাক্য উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি।

"বিদ্যালয় স্থাপনার পরে ছাত্রদের মধ্যে থাকবেন ব'লে শান্তিনিকেতনের বর্তমান লাইব্রেরি-বাড়ীর এক

পাশের একটি ঘরে কবি বাস করেছেন অনেক দিন, খেতেন ছাত্রদের খাওয়ার সাথে বসে—এক সঙ্গে একই খাদ্য।

" কবি-পত্নী স্বভাবত অতিরিক্ত সাজসজ্জার আদৌ অনুরাগী ছিলেন না, গহনা পরতেন নিতান্ত সামান্য। বড় ঘরের বৌ, তার তুলনায় তিনি সাধারণ বেশেই থাকতে ভালবাসতেন। উপরন্তু কবির উন্নত রুচির প্রভাব তাঁকে আরো সাদাসিধা ক'রে তুলেছিল।"

"কবি-পত্নী এক বার সাধ ক'রে সোনার বোতাম গড়িয়েছিলেন কবির জন্মদিনে কবিকে পরাবেন ব'লে। কবি দেখে বলেন, ছি ছি ছি, পুরুষে কখনো সোনা পরে—লজ্জার কথা।"

"কবি-পত্নীর রান্নার হাত ছিল চমৎকার।"

"নূতন নূতন রান্না আবিষ্কারের সখ কম ছিল না কবিরও। বোধ হয় পত্নীর রন্ধনকুশলতা এ-সম্বন্ধে তাঁর সখ বাড়িয়ে দিত বেশী। রন্ধনরতা পত্নীর পাশে মোড়া নিয়ে ব'সে নূতন রান্নার ফরমাস করেছেন কবি, দেখা গেছে অনেক বার। শুধু ফরমাস ক'রেই ক্ষান্ত হ'তেন না, নূতন মালমসলা দিয়ে নূতন প্রণালীতে পত্নীকে নূতন রান্না শিখিয়ে কবি সখ মেটাতেন। শেষে তাঁকে রাগাবার জন্যে গৌরব ক'রে বলতেন, 'দেখলে তোমাদের কাজ তোমাদেরই কেমন একটা শিখিয়ে দিলুম।' তিনি চটে গিয়ে বলতেন 'তোমাদের সঙ্গে পারবে কে ? জিতেই আছ সকল বিষয়ে।' "

"সংসারে এক উপদ্রব বাধাতেন কবি নিজের খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে। থেকে থেকে খাওয়া এত কমিয়ে ফেলতেন যে, কাছের লোকে চিন্তিত না হয়ে থাকতে পারত না। করো চিন্তা, বলো যা খুশি,—কবি নিজের ইচ্ছায় ভর ক'রেই চলেছেন। জন্ম হ'তে অটুট স্বাস্থ্য পাওয়ায় ও বয়সের জোর থাকায় শরীর তখন এই সব উপদ্রব সহ্য করেছে অনেকটা অনায়াসে। ঘরের লোকের ধারণা, খেয়ালের বশে কবি স্বল্পাহারে শরীর নষ্ট করছেন, কাজেই এই ব্যাপার তাঁরা উপদ্রব ব'লেই গণ্য করতেন। কবি যে শরীরের উপযোগী খাদ্য না খুঁজে মনের উপযোগী খাদ্য খুঁজে নিচ্ছেন, এ-কথা বোঝা যেত না তখন স্পষ্ট ক'রে। ঘরের মানুষ—যাঁদের লক্ষ্য শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁরা এমনতরো ঝোঁকালো লোক নিয়ে বেগ পেতেন সর্বদা।"

"ভৃত্যরা খুশী মনে সহজ ভাবে কবির সামনে কথা বলে, কবি সেটা ভালবাসেন চিরদিন। ভয় পেয়ে ভৃত্য কাজ করবে তিনি আদৌ পছন্দ করেন না।"

"সেই সময়কার আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কন্যা রাজবাড়ী যাবে—নিতান্ত সাধারণ সাজে সাধারণ বেশে কবি পাঠিয়েছেন তাকে সেখানে। আত্মীয়েরা বলেছেন, এমন সাজে কবি রাজবাড়ী কন্যা পাঠান যে দেখে লজ্জা করে। কবির উত্তর, 'এই বেশে কন্যা আমার স্নেহ-সম্মান যদি না পায়, তবে তেমন সম্মানে কাজ নাই। বেশভূষা যে-সম্মানের যোগ্যতা প্রমাণ করে, সে সম্মান না পাওয়াই শ্রেয়।' "

"সন্তান-স্নেহ কবির অপরিমেয়। প্রথম সন্তান, কন্যাটিকে পিতা হয়েও তিনি মাতৃস্নেহে পালন করেছিলেন ধাত্রীরূপে। পত্নীর বয়স ছিল কম, কবি যেন ভরসা পেতেন না প্রথম সন্তানের সম্যক্ যত্ন পাছে তিনি করতে না পারেন ভেবে। শিশুকে দুধ খাওয়ানো, কাপড় পরানো, বিছানা বদলানো কবি সব করতেন নিজের হাতে, এ-সবই আমাদের চোখে দেখা।"

শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী এর পর কবি কর্তৃক পত্নীর সেবার যে পবিত্র চিত্রটি দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ যদি মহাপুরুষ না হ'তেন তা হ'লেও তারই জন্যে তিনি জগজ্জনের চিরআরাধ্য হয়ে থাকতেন।

"শিক্ষাব্রতী কবি আদর্শ-শিক্ষালয় গঠনে যখন প্রবৃত্ত, কবির সহধর্মিণী তখন সহকর্মিণী হয়েছিলেন তাঁর সে কাজে। ছাত্রদের জলখাবার তৈরীর ভার নিয়েছিলেন তিনি নিজের হাতে। স্নেহ দিয়ে গড়তে চেয়েছিলেন ছাত্রগুলিকে। বিদ্যালয় আরম্ভের একটি বৎসর শেষ না হ'তেই বিদ্যালয়ের জননী কবি-পত্নীর আয়ু হ'ল শেষ। কবির সংসার ভেঙ্গে দিয়ে তিনি চলে গেলেন অকালে। মৃত্যুশয্যায় কবি নিজের হাতে তাঁর যে শুশ্রূষা করেছিলেন, তার ছাপটি মুদ্রিত হয়ে রয়েছে পরিবারের সকলের মনে আজও। প্রায় দু-মাস তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন, ভাড়া-করা নার্সদের হাতে পত্নীর শুশ্রূষার ভার কবি এক দিনের জন্যও দেন নাই।

"স্বামীর সেবা পাওয়া কত সৌভাগ্যের, সাধ্বী নারী মাত্রই জানেন। পত্নীর প্রতি স্নেহ কবির প্রকাশ পেয়েছে তাঁর শেষ শয্যায় চূড়ান্ত রূপে। তখন ইলেকট্রিক ফ্যানের সৃষ্টি হয় নাই দেশে। হাতপাখা হাতে ক'রে দিনের পর দিন রাতের পর রাত পত্নীকে কবি বাতাস দিতেন, এক মুহূর্ত হাতের পাখা না ফেলে। ভাড়াটে শুশ্রূষাকারিণীর প্রচলন তখন ঘরে ঘরে, কবির ঘরে তার ব্যত্যয় ঘটল প্রথম।"

কবি অন্যান্য বিষয়ে যেমন অসাধারণ, শোকও পেয়েছেন সেইরূপ অত্যধিক, এবং সহ্য করেছেন সেইরূপ অসাধারণ ধৈর্য্য ও সংযমের সহিত। পত্নীর মহাপ্রয়াণে তিনি মর্মন্তুদ বেদনায় "স্মরণ" গ্রন্থের প্রথম কবিতায় প্রার্থনা ক'রেছিলেন :—

"আজি মোর কাছে প্রভাত তোমার
কর গো আড়াল কর'।
এ খেলা এ মেলা এ আলো এ গীত
আজি হেথা হ'তে হ'র,
প্রভাত-জগত হতে মোরে ছিঁড়ি,
করুণ আঁধারে লহ মোরে ঘিরি',
উদাস হিয়ারে তুলিয়া বাঁধুক
তব স্নেহ বাহু ডোর।"

ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে ব্যবধানসত্ত্বেও এই দম্পতি অভিন্নাত্মা হয়েছিলেন। কবি স্বর্গগতা পত্নীকে সম্বোধন ক'রে বলেছেন :—

"আমার জীবনে তুমি বাঁচ ওগো বাঁচ।
তোমার কামনা মোর চিত্ত দিয়ে যাচ।"

চোখকান যাই বলুক, বিশ্বাস হচ্ছে না যে, তিনি নাই। এখনো মনে হচ্ছে, শান্তিনিকেতনে গেলেই আবার তাঁর বার্দ্ধক্যের সেই শুচিশুভ্র সুন্দর রূপ দেখতে পাব যার ভিতর দিয়ে তাঁর অন্তরের অনুপম শ্রী বিচ্ছুরিত হোতো। "ক্রন্দন ধ্বনিছে পথহারা পবনে,"—যদিও বুদ্ধি বলছে তিনি আছেন।

তাঁর কামনা ছিল—

"এ অস্থির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক
চৈতন্যের শুভ্রজ্যোতি
ভেদ ক'রে কুহেলিকা
সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।"

তিনি বিশ্বজনকে এত দিয়েও তৃপ্ত হন নাই। আরো কিছু দিতে চেয়েছিলেন—নিশ্চয় দিযেও গেছেন, নেবাব যোগ্য হ'লেই, নিতে জান্‌লেই জগজ্জন পাবে।

"যে জীবনলক্ষ্মী মোবে সাজায়েছে নব নব সাজে
তাব সাথে বিচ্ছেদেব দিনে নিভায়ে উৎসবদীপ
* * *
ললাটে আঁকিবে শুভ্র তিলকেব বেখা,
তোমরাও যোগ দিয়ো জীবনেব পূর্ণ ঘট নিয়ে
সে অন্তিম অনুষ্ঠানে, হয়তো শুনিবে দূব হতে
দিগন্তেব পরপারে শুভ শঙ্খধ্বনি ॥"

এই "শুভ শঙ্খধ্বনি" শুনবাব আশায় আছি--এ তো আকাশে বাতাসে মিলিযে যাবাব নয। ধ্বনি শুনে কবিব—

"কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি?"

এই প্রশ্নের উত্তবে দৃঢ বিশ্বাসেব সহিত বলতে পাব্‌ব, "সকল প্রভাতেই কবি তুমি আছ";

"সকল খেলায় ক'র্‌বে খেলা এই আমি।
নতুন নামে ডাকবে মোবে,
বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে,
আসবো যাবো চিরদিনেব সেই আমি।"

দিব্যধামবাসীদের মধ্যে কবিব শুভ আগমনেব উৎসবকলবোল মিশ্রিত সেই শঙ্খধ্বনি শুনে তখন তাঁব ঐ কথাগুলির অর্থও হৃদয়ঙ্গম হবে। তখন আব এখনকাব মত বলতে হবে না,

"ক্রন্দন ধ্বনিছে পথহাবা পবনে।"

লেখক কর্তৃক 'কবি-প্রণাম' পুস্তকেব নিমিত্ত কিঞ্চিৎ পবিবর্তিত।

[illegible]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

তাবায় যে ভরে যায় বাত
মনে হয় আশ্চর্য্য আকাশ :
এ-মনে কি নতুন প্রভাত
আন্‌বে নতুন ইতিহাস ?

আমরা নিভেছি বারবার,
জ্বলেওছি আবাব তেমন,
দিনেবে জীবিত সূর্য্য তাব
করেছিল দেহ-নিবেদন।

জীবনেব থেকে বহুদূর
জেগে' ছিল কী এক বিবাট,
নাগাল পায়নি তাব সুর
আমাদের বেচা-কেনা হাট।

তবু সে তো আছে, শুধু তাই—
আমাদের বক্ত তাব নাম
গেয়ে গেছে হয়ত সদাই,
জানায়েছি অজানা প্রণাম।

এখন দিগন্ত সীমাহীন—
অথই বাতেব শুধু ঢেউ,
তাবোপরে আছে আবো দিন
যখন আমরা নই কেউ॥

আশ্রমের পুরানো কথা

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি আশ্রমের গোড়া থেকে সংশ্লিষ্ট। আশ্রম প্রতিষ্ঠা যেদিন হোলো তার কথা বেশ সুস্পষ্ট মনে আছে। যদিও তখন আমার বয়স খুব অল্প। ১৯০১ সালের ৮ই পৌষের প্রত্যুষে এখন যে বাড়িতে লাইব্রেরি তার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—আমার মেজ জ্যেঠামহাশয় উপাসনা করে আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। তখন আমি পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে উপনিষৎ অনেকখানি মুখস্থ করেছি—উপাসনার মন্ত্রোচ্চারণে যোগ দিতে পেরেছিলুম। সেই সময় যে উদ্দেশ্য নিয়ে আশ্রম খোলা হয়েছিল তার এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। নাম দেওয়া হয়েছিল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম—উদ্দেশ্য ছিল গুটিকতক অল্প বয়সের ছাত্র নিয়ে পুরাকালের ঋষিমুনিদের আশ্রমে যে রকম শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল সেইভাবে এখানেও শিক্ষা দেওয়া হবে। ৮ই পৌষে আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হোলো বটে কিন্তু আসলে কাজ আরম্ভ করতে সময় লেগেছিল। তখন শান্তিনিকেতনে দুটি মাত্র বাড়ি ছিল, দোতলা বাড়ি যেটি এখন অতিথিসেবায় ব্যবহার হয় আর লাইব্রেরি বাড়ি। লাইব্রেরি বাড়ির নল্‌চে—খোলা সবই এখন বদলে গেছে। তখন ছোট্ট একতলা একটা বাড়ি, তিনটি মাত্র তাতে ঘর ছিল। এই অতি ক্ষুদ্রকায় বাড়ি নিয়ে তো আর ইস্কুল হয় না, কাজেই অন্ততপক্ষে একটি ছাত্রাবাস ও রান্নাঘর প্রস্তুত করা দরকার হোলো।

পিতৃদেবকে সাহায্য করবার লোক বড় বেশী কেউ ছিল না। শিলাইদা থেকে একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তারকে নিয়ে এসে বাড়ি তোলবার কাজে লাগিয়ে দেওয়া হোলো। কয়েক-মাসের মধ্যে আদিকুটীর এখন যার প্রাক্‌কুটীর নাম হয়েছে এবং লাইব্রেরির পিছনে রান্নাঘর তৈরি হয়ে গেল। ডাক্তার মানুষ ইঞ্জিনিয়ারিং করলে যা হয়, বাড়িগুলি খুব ব্যবহারোপ-যোগী হয়েছিল বলে বলতে পারি না। আমাদের সেই পুরানো রান্নাঘর পরিবর্তন করেই এখন আফিস ঘর প্রস্তুত হয়েছে। বাড়ি হতেই ছাত্র ও অধ্যাপক সংগ্রহ হোলো। দুই তিনজন অধ্যাপক ও আমরা পাঁচজন ছাত্র এই নিয়ে একদিন পড়াশুনা আরম্ভ হোলো। সেই আদিকালের অধ্যাপকদের মধ্যে কেবল জগদানন্দ রায় মহাশয়কেই বর্তমান আশ্রমবাসীরা মনে রাখতে পারেন। দু'এক বছরের মধ্যেই ছাত্র সংখ্যা বেড়ে গেল—নতুন অধ্যাপকও কয়েকজন নিযুক্ত হলেন। মনে আছে, যখন আমরা ২৫।৩০ জন হয়েছি তখনও ঐ আদিকুটীরের সংকীর্ণ স্থানে পরম সুখে বাস করেছি উপরন্তু যে কয়জন অধ্যাপক ছিলেন সকলেই আমাদের সঙ্গে ঐ ঘরে বাস করেছেন। একথা শুনলে এখনকার ছাত্রদের বিভীষিকা বলে ঠেকবে। এখনকার মতো টেবিল চেয়ার আলনা দেরাজ আসবাব পত্রের বিড়ম্বনা কিছুই ছিল না। আহার সম্বন্ধেও তাই—সকালে ছোলাভিজে, দুপুরে কলাইয়ের ডাল ভাত খেয়ে কাটাতুম তার

জন্যে কোনোদিন দুঃখ বোধ হয় নি। সে সময় রান্নাঘরে Complaint book বলে উপদ্রবের সৃষ্টি হয়নি। ব্রহ্মচর্যের আদর্শ তখন সজীব ছিল—আশ্রমে যারা আসত কৃচ্ছ্রসাধনা করতে প্রস্তুত হয়েই আসত। কিন্তু তাইজন্যে আনন্দের অভাব ছিল না। যে কয়জন অধ্যাপক ও ছাত্র একসঙ্গে থাকতুম, একসঙ্গে খেতুম, একসঙ্গে ক্লাশে যেতুম, একসঙ্গে বেড়াতে বা খেলতে যেতুম—সকলের মধ্যে একটা আত্মীয়তার ভাব ছিল, আশ্রম বলতে একটি বড়ো পরিবার বলে মনে হোত।

আশ্রমের এই জীবনধারার মধ্যে থেকেই ভবিষ্যৎ জীবনের যা কিছু খোরাক সংগ্রহ করেছি। তারই মধ্যে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা এবং বিশেষ লোকের কথা চিরদিনের জন্য মনে গাঁথা রয়ে গেছে। অধ্যাপকদের মধ্যে সকলের সঙ্গেই আমাদের অন্তরঙ্গ যোগ ছিল। কিন্তু একজনের কাছে বিশেষভাবে ঋণী রয়েছি। আমরা তাঁকে অল্পদিনের জন্যই পেয়েছিলুম কিন্তু ঐ কয়েক-মাসের মধ্যেই তাঁর অদ্ভুত প্রতিভা এবং উদার স্বভাবের যা পরিচয় পেয়েছিলুম তাতে অভিভূত করে দিয়েছিল। তখন যদিও বয়স অল্প সবে ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ছি কিন্তু সতীশবাবুকে (কবি সতীশচন্দ্র রায়) সমবয়স্ক এবং বন্ধু বলেই মনে করতুম। তাঁর ব্যক্তিপ্রকৃতি এমন মর্মগ্রাহী ছিল, শিশু থেকে প্রাচীন কেউই তাঁকে অস্বীকার করতে পারত না। তিনি সকলের আপনার ছিলেন। তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। আমাদের ইংরেজী বা সংস্কৃত বিদ্যা তখন সামান্যই কিন্তু সাহিত্য পড়াবার সময় তিনি তা খেয়ালই আনতেন না—Shakespeare, Browning, কালিদাস, অনর্গল পড়িয়ে যেতেন তাঁর কাছে এই সব উচ্চাঙ্গের সাহিত্য পড়তে একদিনও বিরক্তি বোধ হয়নি। তাঁর অসামান্য বোঝাবার ক্ষমতা আমাদের স্বল্পবিদ্যা ও বুদ্ধির বাধা অতি অনায়াসেই অতিক্রম করে যেত। সেই বছরের গ্রীষ্মাবকাশের কথা আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ম্যাট্রিক-তখনকার কালের Entrance পরীক্ষা দিয়ে আশ্রমেই গ্রীষ্মের ছুটি কাটাব স্থির করলুম। ছাত্রদের মধ্যে দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সন্তোষ মজুমদার ও আমি—অধ্যাপকদের মধ্যে সতীশবাবু, সুবোধবাবু ও জগদানন্দবাবু। আর অতিথি একটি এসে জুটলেন সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়। আমাদের আড্ডার স্থান লাইব্রেরির বাড়ি,—মাঝখানের ঘরে গুটিকতক বইয়ের আলমারি ও পাথরের চৌকি আর দুপারে দুই ছোটো ঘরে আমাদের বাসা। ছুটি আরম্ভ হোতেই সতীশবাবু সাহিত্যচর্চা সুরু করলেন। প্রথম দিনেই আমাদের সকলকে নিয়ে ছাতিমতলায় বসিয়ে মেঘনাদ বধ পড়তে লাগলেন। মাইকেলের মহাকাব্য যে উপাদেয় লাগতে পারে তা সেইদিন আমরা পরিচয় পেলুম এবং সকলে মিলে সতীশবাবুকে আমাদের সাহিত্যগুরু মেনে তাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করে নিলুম। সকালবেলায় তাঁর কাছে সাহিত্য পড়া আর বিকালে সুরেনবাবুর কাছে বিজ্ঞান আলোচনা চলল। সুরেনবাবুর মতো এমন বিজ্ঞানের শিক্ষক আর কখনো দেখিনি। বিজ্ঞানের সুকঠিন তথ্যগুলি সাধারণ ঘরোয়া জিনিষের উদাহরণ দেখিয়ে বিনা যন্ত্রের সাহায্যে প্রাঞ্জল ভাষায় অতি সহজে

তিনি বুঝিয়ে দিতেন। পরে কলেজে যখন Chemistry পড়তে হয়েছিল তখন জানতে পারলুম এই গল্পচ্ছলে সুরেনবাবুর পড়ানোর মূল্য কতখানি।

সতীশবাবুর বাংলা Classical সাহিত্য শেষ করতে বেশী দিন লাগল না, তারপরেই Shakespeare ধরলেন সঙ্গে সঙ্গে কালিদাসও পড়া হোত তুলনার-জন্য। এই একটি গ্রীষ্মাবকাশের মধ্যে মাইকেল, নবীন সেন Shakespeare ও কালিদাস পড়া শেষ করা হয়েছিল শুনে অধিকাংশ পাঠকই বিশ্বাস করতে চাইবেন না। কিন্তু কয়জন পাঠকের ভাগ্যে সতীশবাবুর মত গুরু মিলেছে? তিনি যে বই যেদিন ধরতেন শেষ না করে উঠতেন না, তাঁর পড়াবার এমনই অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, আমাদের মতো শ্রোতাদেরও কখনো ক্লান্তি বোধ হয়নি। কোনো বই পড়া শেষ হোলেই তাঁর সমালোচনা করতেন, বড়ো বড়ো সমালোচকেরা কী বলেছেন প্রথমে তা শুনিয়ে, তারপর নিজের মতামত ব্যক্ত করতেন। আমাদের কাছে তাঁর নিজের কথাটাই বেশি মূল্যবান মনে হোত। সাহিত্যআলোচনায় তিনি এত বিভোর হয়ে যেতেন যে খাওয়াদাওয়ার কথা মনে থাকত না। একদিনের ঘটনা মনে আছে। সে দিন বর্ষশেষ। বিকালের দিকে ঈশানকোণে কালো মেঘ দেখেই আমরা মাঠে বেরিয়ে পড়েছি। তুমুল ঝড় এল—ঝড়ের গতিক দেখে আমরা আর সকলেই পালিয়ে লাইব্রেরির বারান্দায় আশ্রয় নিলুম। সতীশবাবুকে কে সামলায়, তিনি হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ুচ্ছেন। এক সময়ে যখন প্রচণ্ড ঝাপটা এল, আর না পেরে একটা বটগাছ জড়িয়ে ধরে প্রাণ বাঁচালেন। ঝড় কমতে, ফিরে এলেন আমাদের কাছে, সে কি চেহারা, পাগলের মতো দূর থেকে চীৎকার করছেন—"জানো আজ বর্ষশেষ কী, করছ ঘরের ভিতর? আজ যে 'ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধ বেগে ধেয়ে চলে আসে বাধাবন্ধহারা'—বলেই অনর্গল সমস্ত কবিতা মুখস্থ বলতে লাগলেন। বাইরে সত্যই উন্মাদিনী কাল বৈশাখীর নৃত্য আর সতীশবাবুর উন্মত্তের মতো তার তালে তালে কবিতা আবৃত্তি আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলুম। যখনই কাল বৈশাখীর ঝড় আসে সতীশবাবুর বর্ষশেষ কবিতা পাঠের ধ্বনি কানে বাজতে থাকে, সে কখনো ভুলতে পারবো না।

'কীর্ত্তি যদি রেখে যাই
ধূলি তারে করে টানাটানি,
গান যদি রেখে যাই
তাহারে রাখেন বীণাপাণি।'*

---

* রবীন্দ্রনাথের এই লেখনটি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি
শ্রীযুক্ত অরুণকুমার চন্দ মহাশয়ের সৌজন্যে।

প্রণাম

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

হে কবি,—প্রণাম।

শুধু আজ মনে আসে,—স্মৃতির পূজায় শেষে লয় সবে নাম!
তোমার স্মরণ-কোণে কণামাত্র স্থান নিতে বিশ্বে ব্যাকুলতা,
ঋতুতে ঋতুতে ধরা পত্রপুষ্পভারে সেজে ডেকে কয় কথা,—
আজ সে-তোমার স্থান বিশ্বের স্মরণ-লোকে।—হোলে স্মরণীয়!
বিপরীত লীলাচ্ছলে কালের এ পরিহাস রূঢ় নয় কি ও!
পৃথিবীর ধন তুমি,—হোলো লয় পার্থিব ও-নশ্বর দেহের,-
মর্মান্তিক এই স্মৃতি; তবু দেখি এরি মাঝে পার্থিব স্নেহের
মর্ত্য-সে অমৃতে-'গাহি' বেশি ক'রে আছ বেঁচে অমরের চেয়ে,
দ্যুলোকের দেব রবি যত মহিমার তেজে থাক্ কাল ছেয়ে—
বিচ্ছেদের এ মাধুর্য, এই গূঢ় নিবিড়তা ঘিরে নাই তারে,
অন্তহীন উদয়নে সে রয়েছে চিরকাল আকাশের পারে;
শান্ত তবু আছ তুমি অন্তরে বিলীন,—
কভু এই আত্মীয়তা দেবতা কি কারো কাছে পাবে কোনোদিন।
মুক্তাপাঁতি হিমানীর বুকে বুকে দেখি আজ হেমন্তের ভোরে
রবি-সে দিয়েছে দেখা আপনারে বর্ণে বর্ণে অপরূপ ক'রে,—
অন্তরে অন্তরে আজ জীবন্ত তোমারে পাব নব পরিচয়ে
অগণিত ভক্তসাথে অন্তর মেলানো তাই; স্মৃতি-পূজা নয় এ॥

সন্ধ্যা ও প্রভাত

লীলাময় রায়

শোক অনুভব করতেও সময় লাগে। প্রথমদিন যা অনুভূত হয় তা ঠিক শোক নয়, আবেগ। আবেগের বেগ মন্থর হলে ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে শোক।

রবীন্দ্রনাথের জন্যে শোক বোধ করবার সময় উপস্থিত হয়নি। যখন হবে তখন আমরা শোকসভা করব না। ওটা আবেগের অঙ্গ, ওর প্রয়োজন আবেগের সঙ্গে সমাপ্ত হবে। তখন আমরা তাঁর সার্থকতার কথা ভাবব। কেন তিনি এসেছিলেন, কী সম্পাদন করে গেলেন, কোন কর্ত্তব্য বাকী রেখে গেলেন আমাদের জন্যে। ঐতিহাসিক পারম্পর্য্যের শৃঙ্খলে তাঁর সঙ্গে আমাদের কার কোন সম্পর্ক। কাকে তিনি কী ভাবে প্রভাবিত করেছেন, তাঁর সাধনার সঙ্গে কার সাধনার পরিপূরকতা।

এসব যেমন ভাবব, তেমনি স্মরণ রাখব যে মানুষ কেবল ইতিহাসের dramatis personæ নয়, তার আরো একটা পরিচয় আছে। সে আলো হাওয়া বিদ্যুতের মতো চির কালের। তার ইহকালের লীলা আমাদের দৃষ্টিগোচর। কিন্তু চিরকালের লীলা যদিও অপ্রত্যক্ষ তবু সমান সত্য। চিরকালের সঙ্গে ইহকালকে মিলিয়ে দেখতে জানলেই মানুষকে পূর্ণভাবে জানা যায়, নইলে সে একটুখানি জানা ও অনেকখানি অজানা। এ কথা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিশেষ করে প্রযোজ্য। কেননা তিনি ছিলেন মূর্ত্তিমান বসন্ত। বসন্তের মতো কোন দেশ থেকে এসেছিলেন, বসন্তেরই মতো কোন দেশে চলে গেলেন। যেখানে গেলেন সেখানে আজ বসন্তকাল। রবীন্দ্রনাথকে যদি তাঁর স্বরূপে না দেখি তবে ইতিহাসে দেখলে অসম্পূর্ণ দেখব।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, কিন্তু নিত্যকালের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ আছেন। "এখানে নামল সন্ধ্যা। সূর্য্যদেব, কোন দেশে কোন সমুদ্রপারে তোমার প্রভাত হলো।... সূর্য্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও।"

কবিগুরু

শ্রীরসময় দাশ

হে কবি, আমরা মিলেছি আজিকে তোমারে প্রাণের অর্ঘ্য দিতে,
হে রবি, তোমার উদার আলোকে এসেছি হৃদয়-ভরিয়া নিতে।
যশোগৌরব হিমাচল তুমি, আরতি তোমার ভুবন ভরি'
মুগ্ধহৃদয় ভক্ত আমরা ধন্য,—তোমারে প্রণাম করি'।
প্রতিভা তোমার প্রখর তপন, দীপ্তি তাহার বিশ্বময়,
মনীষা তোমার আকাশ উদার অসীমের মাঝে হয়েছে লয়।
সাগরের মত হৃদয় তোমার—বিপুল—অতল—অন্তহীন,
কত রূপ তা'র, কত তরঙ্গ,—সৃষ্টি তাহার রাত্রিদিন।
কূলে থাকি' মোরা বিস্মিত চোখে চাহি দূর পানে হে বিস্ময়।
মন ভরি' উঠে অসীমের রূপে, প্রাণ ভরি' গাহি তোমারি জয়।
ফিরে এসো এই ধরণীর মাঝে আবার জাগাও নতুন সুর,
আরো কিছুদিন ছন্দে ও গানে মোদের জীবন কর মধুর।
আমাদের মাঝে বারেক দাঁড়াও দেখিব তোমারে নয়ন ভরি';
ওগো দূরবাসী, হে চির পথিক চরণে তোমার প্রণাম করি।

রবীন্দ্র-রচনার নেপথ্যবিধান

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

কাব্যের রসোত্তীর্ণ প্রকাশের সঙ্গেই পাঠকের সম্বন্ধ কিন্তু তার নেপথ্যে কাব্যরচনার অপ্রকাশিত ইতিহাস সম্বন্ধেও আমাদের স্বাভাবিক কৌতূহল কম থাকে না। রঙ্গমঞ্চের অভিনয় দেখাই দর্শকের উদ্দেশ্য সত্য, কিন্তু সুযোগ পেলেই মঞ্চের আড়ালে কি উদ্যোগ-আয়োজন চলছে, সেদিকেও উঁকিঝুঁকি দিতে চায় সকলেই।

রবীন্দ্রনাথের রচনাসম্বন্ধেও পাঠকসাধারণের এই মনোবৃত্তি থাকা খুবই স্বাভাবিক। নিছক কৌতূহলের কথা ছেড়ে দিলেও কোন বিশেষ উপলক্ষ্য বা বাইরের তাগিদে যেখানে তাঁর রচনা উদ্বুদ্ধ হয়েছে, সেখানে সেই উপলক্ষ্যের সঙ্কেতে তাঁর কাব্য-পরিচয়ের একটি চিত্তাকর্ষক ভূমিকা অবশ্যই পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের অনেক গান ও কবিতা-রচনার পিছনে এমনিতর ইতিহাস আছে। সেগুলোর সন্ধান ও সংগ্রহ রসজ্ঞমাত্রের কাছেই উপভোগ্য হবে। এইপথে তাঁর রচনার গঙ্গোত্রীতে একবার পৌঁছতে পারলে রচনাধারা অনুসরণ করাও সুগম ও সহজ-সাধ্য হয়ে পড়বে নিঃসন্দেহে। আমরা রবীন্দ্রনাথের এই ধরণের দু'একটি গান ও কবিতা-রচনার কাহিনী এখানে বর্ণনা করব।

সকলেই জানেন শান্তিনিকেতন আশ্রম বীরভূমের এক শুষ্ক, রুক্ষ, উঁচু ডাঙা জমিতে অবস্থিত। বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গার তুলনায় বৃষ্টিপাত এখানে খুবই কম। গ্রীষ্মকালে আশ্রমের কুঁয়োগুলি যেত শুকিয়ে, অনেক সময়ই দারুণ জলকষ্ট ঘটত। সময়ে সময়ে বোলপুর অঞ্চলে জলাভাবের জন্য লোককে পয়সা দিয়ে পর্য্যাপ্ত জল কিনতে হয়েছে। আশ্রমে গ্রীষ্মকালের ছুটি নির্ভর করত জলের অবস্থার উপর। কুঁয়োর জল নিঃশেষিত হওয়ার লক্ষণ দেখলেই বিদ্যালয়ের ছুটি দিয়ে দিতে হত। 'সুজলা সুফলা' বাংলাদেশের এই প্রত্যন্তভাগে অবস্থিত আশ্রমে জলের সমস্যা একটি কঠিন সমস্যা ছিল। নলকূপ বসিয়ে এর সমাধান করার বহুবৎসরের বহুচেষ্টাও কৃতকার্য্য হয়নি, যতবার চেষ্টা হয়েছে, ততবারই নলকূপের নল খানিকটা নীচে গিয়ে কঠিন পাথরের স্তরে ব্যাহত হয়েছে। আশ্রমের এই জলকষ্টের সমস্যা নিয়ে কবির মনে বরাবরই বিশেষ উদ্বেগ ছিল। অবশেষে সদয় হলেন বরুণদেব, ১৯৩২ ইংরাজীতে ভূগর্ভের পাষাণ প্রাচীর ভেদ করে অবরুদ্ধ জলের নিত্যপ্রবাহ উৎসারিত হল নলকূপের মুখে। আশ্রমে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। সেই আনন্দানুভূতির প্রেরণায় কবি রচনা করলেন নিম্নলিখিত গানটি। মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিজয়প্রসাদ সিংহরায় মহাশয় কর্তৃক এই নলকূপবাহিত জলের কল উদ্বোধন উপলক্ষে আশ্রমে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, সেই উৎসবে এই গানটি প্রথম গীত হয়।

"হে আকাশবিহারী নীরদ-বাহন জল,
আছিল শৈল শিখরে শিখরে তোমার লীলাস্থল।
তুমি বরণে বরণে কিরণে কিরণে
প্রাতে সন্ধ্যায় অরুণে হিরণে
দিয়েছ ভাসায়ে পবনে পবনে স্বপন-তরণী-দল।
শেষে শ্যামল মাটির প্রেমে
তুমি ভুলে এসেছিলে নেমে,
বাঁধা পড়ে গেলে যেখানে ধরার গভীর তিমির তল।
আজ পাষাণ দুয়ার দিয়েছি টুটিয়া
শত যুগ পরে এসেছ ছুটিয়া
নীল আকাশের হারানো স্বপন গানেতে সমুচ্ছল॥"

১৮৯০ এবং ১৮৯৬ ইংরাজীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় কলকাতায়। ১৮৯০ ইংরাজীর ষষ্ঠ কংগ্রেসে উদ্বোধন-সঙ্গীত গেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ — 'বন্দেমাতরম' গান। ১৮৯৬ ইংরাজীর অধিবেশন উপলক্ষে তিনি 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' গানটি রচনা করে গেয়েছিলেন। কংগ্রেসের ঐ দুই অধিবেশনের কোনো একটির সময়কার কথা বলছি, খুব সম্ভব ১৮৯৬ ইংরাজীর ঘটনাই হবে। সেই যুগে কোন সভাসমিতিতে উপস্থিত থাকলেই রবীন্দ্রনাথের মুখে গান শোনার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ আসত চারদিক থেকে; দু-একটা গান না গেয়ে তাঁর নিষ্কৃতি ছিল না। কংগ্রেসের তখন একেবারে বাল্যাবস্থা। কোন সুস্পষ্ট জাতীয়তার আদর্শ অথবা জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়নি। মুখবন্ধেই রাজভক্তিজ্ঞাপক এবং ইংরেজজাতির ন্যায়নিষ্ঠার উপর প্রগাঢ় আস্থাসূচক প্রস্তাব পাশ করা তখনকার রেওয়াজ ছিল। বলা বাহুল্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার বিহার, চালচলনে তখনকার জাতীয়তার পুরোহিতবৃন্দ বিজাতীয় আদর্শ সগৌরবে অনুসরণ ও অনুকরণ করে চলতেন।

কংগ্রেসের উল্লিখিত অধিবেশনের পর শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয় তাঁর বাড়ীতে নেতৃবৃন্দকে 'ডিনারপার্টি'তে আমন্ত্রিত করেন। দেশীয় প্রধানগণের সেই সব 'ডিনারপার্টি' পানাহার ও আমোদপ্রমোদের বিদেশীয় উল্লাসধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠত। এইসব পার্টিতে যোগদান করতে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিগত রুচি, সংযম ও জাতীয়তাবোধে স্বভাবতঃই বাধত। তিনি তারক পালিতের ডিনারপার্টিতে যেতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু তারক পালিত মশায় জোরজবরদস্তি করে তাঁকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে যান। আসল কথা, রবীন্দ্রনাথের গান শোনার আকর্ষণ উৎসবের আমন্ত্রণকর্তা ও আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সকলেরই ছিল। অন্যের অনুরোধ উপরোধে পড়ে ইচ্ছাবিরুদ্ধ কাজ করার দুর্ভোগ রবীন্দ্রনাথকে জীবনে বহুক্ষেত্রে ভুগতে হয়েছে। পাছে অসম্মতি প্রকাশ করলে তারকনাথ পালিতের মনে আঘাত লাগে, এই ভয়ে তিনি নিরুপায়ের মত আত্মসমর্পণ করলেন; বিশেষতঃ তারকনাথ পালিত ছিলেন তাঁর

বয়োজ্যেষ্ঠ এবং পিতৃস্থানীয়। কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং আন্তরিক প্রতিবাদ ও বিতৃষ্ণাকে মনের মধ্যে পোষণ করে যেতে হল বলে সমস্ত রাস্তা তিনি একটি কথা না বলে গাড়ীতে গম্ভীরভাবে চুপ করে বসে রইলেন, আত্মপীড়ন এবং মনের অবরুদ্ধ তীব্র গ্লানি ও বিতৃষ্ণাবোধ, প্রকাশের পথ খুঁজে মনে মধ্যে গুমরে উঠতে লাগল। অবশেষে দুর্বার আবেগ মথিত হয়ে নীরবে সঙ্গীত সৃষ্টির কাজ চলল নিভৃত কবিচিত্তে।

'ডিনারস্যুট'শোভিত নেতৃবৃন্দের সমাগমে ডিনারপার্টি সরগরম হয়ে উঠল. কাঁটা চামচের ঝনঝনানি, কাঁচের গ্লাসে বোতলে অবিশ্রাম ঠুন্‌ঠুন্ ঝঙ্কার, শ্রাস্তিহরা উগ্র বিলাতী পানীয় সম্ভোগে অধিকাংশের অবস্থাই টলটলায়মান। সেই প্রমোদরজনীর বিলাসকক্ষে উদ্দাম হাস্যপরিহাসের উচ্চ কলরোলে উচ্চকিত হয়ে দেশজননী লজ্জায় অধোবদন হয়েছিলেন কিনা জানা নেই, কিন্তু উল্লাসচঞ্চল দলের মধ্যে নিতান্তই খাপছাড়াভাবে রবীন্দ্রনাথ একাকী এককোণে বসে ভাবছিলেন, দুর্ভিক্ষে অনশনে অত্যাচারে জর্জ্জরিত এবং অশিক্ষায় দারিদ্র্যে পীড়িত কোটি কোটি লোকের দুঃখদুর্দ্দশামোচনের কঠিন দায়িত্ব যাঁরা নিজেদের উপর নিজেরাই ন্যস্ত করছেন সেই চিন্তাশীল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পক্ষে তরল আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ার বিসদৃশ আচরণ কিরূপে সম্ভবপর হয়। অন্তরের নিগূঢ় বেদনাবোধকে তিনি রূপায়িত করে তুলছিলেন মনে মনে গান রচনা করে। হঠাৎ একজন প্রস্তাব করে উঠলেন— 'এবার রবির গান হোক'। সমস্বরে সকলেই প্রস্তাবটি অনুমোদন করলেন। তখন রবীন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়িয়ে সেই মনে মনে রচিত গানটি গাইতে আরম্ভ করলেন—

"আমায় বোলোনা গাহিতে বোলোনা।
একি শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা॥
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস,
কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে বুকফাটা দুখে গুমরিছে বুকে
গভীর মরম বেদনা।"

অন্তরের জমাট অনুভূতি কণ্ঠস্বরে অবশ্যই স্পন্দিত হচ্ছিল, গানের কথাগুলি যেন তীব্র কশাঘাতে আত্মবিস্মৃত নেতৃবৃন্দের চৈতন্যোদয় করে দিল, মুখর আনন্দের তাল গেল কেটে, শ্রোতৃবৃন্দ স্তব্ধ হয়ে শুনলেন কবির গভীর মনের পুঞ্জীভূত বেদনার কথা।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, গানটি মুখে মুখে রচিত বলে লেখনীমুখে নিঃসৃত রচনা স্বাভাবিক শৃঙ্খলাসূত্রে যে সুগঠিত আকারলাভের সুযোগ পায়, এখানে তার অভাব সুস্পষ্ট। তাই রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গানের তুলনায় এই গানটির কথা ও ছন্দের বাঁধুনি যেন একটু ঢিলেঢালা আলগা-গোছের, তেমন আঁটসাঁট নয়।

উল্লিখিত ঘটনাটি শুনেছিলাম শ্রীযুক্ত রথীন্দ্র নাথ ঠাকুরের কাছে।

একবার 'রবীন্দ্রপরিচয় পত্রিকা'র সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যের খাতিরে লেখা-সংগ্রহের জন্য বিব্রত হয়ে যখন সকলের কাছে ধর্ণা দিয়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে, তখন একদিন সকালবেলা রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম, বললাম "আপনাকে একটা কবিতা লিখে দিতে হবে।" 'রবীন্দ্রপরিচয় পত্রিকা'তে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখবেন, এ নিতান্তই স্ব-বিরোধী প্রস্তাব, এই ওজর দেখিয়ে আমাদের দাবী তিনি উড়িয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু ওজর শুনতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। কেননা, তাঁর যুক্তির বিরুদ্ধ-নজীরও ছিল আমাদের স্বপক্ষে। প্রেসিডেন্সি কলেজের 'রবীন্দ্রপরিষদে' এবং অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে অন্যত্র ও যে তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন এবং তাদের পত্রিকাতে প্রবন্ধও দিয়েছেন, আমরা তার উল্লেখ করলাম।

তখন তিনি বললেন —"দ্যাখো, তোমরা কাছে এসেছ জীবনের অপরাহ্ণবেলায়, অসময়ে। একদিন ছিল, যখন ফরমাস-মত যখন-তখন কবিতা লিখে দিয়েছি। আশ্রমে ইংরেজ কবিদের কবিতা আলোচনাচ্ছলে সঙ্গে সঙ্গে মুখে মুখে তার ছন্দোবদ্ধ তর্জ্জমা করে গিয়েছি, তার জন্য আগে থেকে কিছুমাত্র প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজনও অনুভব করিনি। লিখতে বসলেই লেখা যায়, তারও যে ব্যতিক্রম থাকতে পারে, সে-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে তখনো বাকি ছিল। এখন কি আর সে-শক্তি আছে যে, চাইলেই তোমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারব?"

শুনতে শুনতে ভাবছিলাম আশ্রমের সেই স্বর্ণযুগের কথা, যখন তিনি আরো ঘনিষ্ঠভাবে আশ্রমের কর্ম্মজীবনের সঙ্গে এবং আশ্রমিকদের সঙ্গে যোগ রেখে চলতেন। বিদায় নেওয়ার সময় পুনরায় কবিতার দাবী জানিয়ে এবং লেখার জন্য পত্রিকার নির্দ্দিষ্ট কাগজ একখণ্ড তাঁর টেবিলের উপর রেখে দিয়ে চলে এলাম।

বিকেলবেলা চর এসে উপস্থিত, ডাক পড়েছে 'শ্যামলী'তে। গিয়ে দেখলাম, দাবী পৌঁছেছে কবির চিত্তলোকের অনুভূতিতে, সদ্য রচিত হয়েছে একটি নতুন কবিতা। কবিতার মূল পাণ্ডুলিপিটি তিনি দিয়ে দিলেন আমাকে। তাঁর স্নেহের দানের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হল আর একটি সম্পদ।

উল্লিখিত কবিতাটির নাম "নিঃস্ব," বর্ত্তমানে "বীথিকা" কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

কবির একটা সাময়িক মনোভাব কিভাবে বিশ্বজনীন রস-সৃষ্টিতে উত্তীর্ণ হয়ে সর্ব্বকালের, সর্ব্বলোকের চিত্তজয়ী অনবদ্য রূপ পরিগ্রহ করে, 'নিঃস্ব' কবিতা তারই একটা প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

স্মরণ

শ্রীসাধনা কর

তোমার বাণীর 'পরে আরো বাণী রচিবারে চাই,
তোমার চরণে নমি, আরো চাই প্রণতি জানাতে;
এত যে বাণীর স্তূপ, তবু পূর্ণ বাণী কোথা পাই,
প্রণতি ব্যথায় ভরে,—স্নেহ নাই স্মিত নেত্রপাতে।

দিনশেষে শতদল ঝরে গেছে, আজ তার বার
পাপড়ি কুড়ায়ে ফিরি আপনারে ভুলাবার ছলে,
চেয়ে থাকি বীজরেণু তারি মাঝে রয়েছে যা তার
অশেষ প্রকাশ-রূপে ফুটে ফুটে ওঠে ধরাতলে॥

নারীমনের শিল্পী রবীন্দ্রনাথ

সুপ্রভা দেবী

রবীন্দ্রনাথের লোকান্তর-গমনের পর বেশীদিন অতীত হয়নি। সেই জন্যই যথাযথভাবে তাঁর সাহিত্য-বিচারের জন্যে যেটুকু দূরত্ব এবং নিরাসক্ত দৃষ্টির প্রয়োজন আজকের দিনে তা সম্ভবপর নয়।

তা সত্ত্বেও বর্তমান আলোচনার একটা মূল্য আছে। বিচার না করতে পারি কিন্তু তাঁর সাহিত্য থেকে নিজেদের সাহিত্যরসপিপাসার পরিতৃপ্তি সাধন তো করতে পারি। পাঁচজনকে সে রসোপলব্ধির ভাগটুকুও তো দিতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার যথার্থ মূল্য পাবেন ভাবীকালের সমালোচক ও পাঠকপাঠিকাদের নিকট থেকে। এ-কালের রসপিপাসু নরনারী যদি তাঁকে শুধু ভক্তি-উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য নিবেদন করেই কাটিয়ে দেয় তাতে কিছুমাত্র লোকসান নেই।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলোর কথাই বলব। "লাবণ্য" "কুমুদিনী" "বাঁশরী" সৃষ্টি হিসাবে হয়েছে কিনা সার্থক, আজকের দিনে তাই প্রধান বিবেচ্য। এ-সমস্ত চরিত্র আধুনিক পাঠকদের মনকে কিভাবে আন্দোলিত করেছে আজ সেইটেই ভেবে দেখতে হবে। চিরকাল তাঁরা বেঁচে থাকবে কিনা, কতটুকু তাদের মধ্যে নিত্যকালের সে আলোচনা না হয় ভাবীকালের জন্যেই মুলতুবী রইলো।

নারীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী বঙ্কিমচন্দ্র থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বঙ্কিম নারীর দৈহিকরূপের বর্ণনায় শতমুখ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিকট 'এহ বাহ্য,' মেয়েদের শুচিস্নিগ্ধ আন্তরিক রূপটিই তাঁর কাছে মুখ্য। বাঙলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই প্রথম মেয়েদের অসামান্যতার কল্পলোক থেকে নামিয়ে এনে বাঙালীজীবনের অতি সাধারণ পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাইরের রূপ তাদের প্রধান সম্পদ নয় তারা আপন অন্তরের আলোকে সমুজ্জ্বল। কল্পলোক থেকে কবি তাদের ওপর সম্পূর্ণ অভিনব আলোকপাত করেছেন। কুমুর হাত দু'খানি বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর গঠন-সৌষ্ঠব তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। তিনি মুগ্ধ বিস্ময়ে উচ্ছ্বসিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন হাত দু'খানির সেবাপরায়ণতার কথা, বলছেন "হাত দু'খানিতে কত সেবা, কত মঙ্গলাচরণ,"

রবীন্দ্রনাথের নারীচরিত্রগুলি উজ্জ্বল হয়েছে সে-সব জায়গাতেই যেখানে-যেখানে তারা ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত। সেইজন্যেই তাদের সহজ অনুভূতির স্বচ্ছন্দ প্রকাশ আমাদের এত মুগ্ধ করে। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অমিল লক্ষ্য করবার মত—বরং শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কতকটা সাদৃশ্য আছে। বঙ্কিমের উপন্যাসে দেখি নারীচরিত্রে actionই প্রধান; কল্পনা অনুভূতির জগত যেন তাদের কাছে রুদ্ধ। তাঁদের বহির্জীবনের কর্মিষ্ঠতার

পরিচয় আমরা অনেক পাই, কিন্তু তাদের মানসিক ঘাতপ্রতিঘাতের বিবরণ—তাদের কর্মভার পীড়িত জীবনের অবসরমুহূর্তগুলির কথা আমাদের নিকট অপরিজ্ঞাত। রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুললেন মেয়েদের অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাতের রূপ। অন্তর্জীবনের যে সব দ্বন্দ্ব বাইরের কর্মে বা ঘটনায় প্রকাশিত হয়না, "রহে যাহা মর্ম্মমাঝে রক্তময়,"—তাই পেলাম রবীন্দ্রনাথের নারী চরিত্রে। শরৎচন্দ্র ও যে নারীর এই ভাবান্তর সযত্নে ফুটিয়ে তুলেছেন সেকথা আগেই বলেছি। তবে মনে হয় যে, এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের চেয়েও রবীন্দ্রনাথ বেশী বাস্তব-পন্থী। শরৎচন্দ্রের 'নারী"রা প্রায়ই এমন সব পরিবেশের মধ্যে দেখা দিয়েছে যে, নারীচরিত্রের সাধারণ মাপকাঠিতে তাদের বিচার চলেনা, তাই সাধারণ মেয়ে হলেও বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের দরুণ তাদের জীবন স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারেনি। সেইজন্যেই এদের সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলে মনে হয়। স্বাভাবিক খাতে তাদের জীবনধারা প্রবাহিত হতে পারেনি। রাজলক্ষ্মী, অভয়া, অন্নদাদিদি, সাবিত্রী, কিরণময়ী, বড়দিদি, রমা, কমলা যে কোন চরিত্র এর সাক্ষ্য দেবে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য ছোট গল্প ও উপন্যাসে যে সব মেয়েদের আমরা দেখতে পাই তারা সকলেই স্বাভাবিক ও সাধারণ, একান্তই বাস্তব, এই ধরণীর ধূলিতেই তাদের আসন। তবু তাদের মনের যে রূপ আকাশপ্রান্তে অনাবৃত হয়ে পড়ে, যে-মন কখনো দিবাস্বপ্ন রচনায় বিভোর, কখনো বা আকাশকুসুম চয়নে তন্ময়, নারী মনের সেই চিরন্তন রূপটিই নূতন করে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাদের অন্তরের রূপের মহিমার নিকট তাদের বাহ্যিক রূপ, কর্মজীবনের গৌরব সব কিছুই ম্লান। দেশনায়িকা এলার তেজোদৃপ্ত মূর্ত্তিকে ছাপিয়ে উঠেছে অতীনের প্রিয়া এলা, নবচেতনার অরুণোদয়ে অপগত হয়েছে লাবণ্যের দৃপ্ত অহঙ্কার। কেতকীর ভিতরের "নারী" যে অস্বাভাবিক প্রতিবেশে বন্দিত হয়েও মরে যায়নি তার প্রমাণ পাই যখন দেখি শিলঙ শৈলে অমিতর সন্ধানে গিয়ে খসে গেল তার কৃত্রিম মুখোস, 'এনামেল করা গালের উপর দিয়ে টস্ টস্ করে চোখের জল পড়তে লাগলো। বুঝতে পারি বাইরে যাই হোক্ অন্তরে তার নারীত্বের চিরন্তন মহিমা ম্লান হয়নি। বাঁশরীর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-পরিহাসের ভিতর দিয়ে সহসা আত্মপ্রকাশ করে সোমপ্রকাশের প্রতি তার গভীর অভিমান। নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখে ও জীবনের স্বত্ব ত্যাগ করে যেতে পারে না নীরজা, অভিশাপ দিয়ে যায়। এমনিধারা অতি বাস্তব, অত্যন্ত অবগুণ্ঠিত পরিচিত মেয়েদের মনের দুর্লভ অমর ছবিটি নিপুণ তুলিকায় এঁকেছেন শিল্পী রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত নারীচরিত্র সৃষ্টি করেছেন সেগুলি বাস্তব-অভিজ্ঞতা মূলক, দরদী হৃদয়ের সহানুভূতিনিষিক্ত ও ভাবাবেগমণ্ডিত অথচ পরিমাণ ও মাত্রাবোধে সুসমঞ্জস। এদিক দিয়েও তাঁর জুড়ি নেই। বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই নারীমনের শ্রেষ্ঠতম শিল্পী।

রবি-প্রণাম

গোপাল ভৌমিক

তোমারে হারাতে হবে ছিল নাত জানা।
মানুষের রাজ্যে তুমি ছিলে রূপ-কথা
তবু দেখি মৃত্যু শেষে দিল এসে হানা
আমাদের যত মোহ, কামনা অযথা!

জানি তবু মৃত্যু নাই তোমার জগতে
অমৃতের সাধনায় পেয়েছে যে-বর
তারি শুভ-কামনায় মর্ত্যলোক হ'তে
তোমার এ অভিযান তুরীয় ভাস্বর।

মাটির মানুষ হ'য়ে ছিলে নভশ্চারী
চেয়েছিলে পৃথিবীতে শান্তির প্রকাশ--
তবু পৃথিবীতে চলে দ্বন্দ্ব মহামারী
ক্ষীণকায় মানবক করে না বিশ্বাস।

তুমি নাই, কাব্য তব রয়েছে অমর
কালের বুকের পরে পদচিহ্ন এঁকে —
তুমি চ'লে গেছ দূরে, স্মৃতি-কুহু-স্বর
কে সরাবে হৃদয়ের কুঞ্জবন থেকে?

প্রাচ্যের প্রতীক তুমি হে প্রমিথিয়ুস!
একদা সফল হবে তব মনস্কাম,
অবিশ্বাসী মানবক যদিও বেহুঁশ —
সেই শুভলগ্ন স্মরি' রাখি এ প্রণাম।

যোগাযোগ

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

কিশোর বয়স থেকেই একান্ত মনের কামনা ছিল, জীবনে অন্তত একবার কিছুক্ষণের জন্যে হলেও রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য-লাভ।

আকাঙ্ক্ষা অবশ্য অপূর্ণ থাকেনি। কিন্তু, তার জন্যে প্রতীক্ষা করতে হয়েছিল সুদীর্ঘকাল।

প্রথম কবিগুরুব দর্শন-লাভ করি তাঁব সপ্ততিতম জযন্তী-উৎসবে। সুদূব মফস্বল থেকে আকুল আগ্রহে ছুটে গিযেছিলাম সে-অনুষ্ঠানে যোগদান করবাব জন্যে। ধন্য হয়েছিলাম সমগ্র দেশের বিদগ্ধ-মণ্ডলীর সম্মিলিত কবি-সম্বর্দ্ধনা দেখে।

সেদিন দেখেছিলাম 'বিপুল জন-সঙ্ঘেব বাণী-সঙ্গমে স্তব্ধ' কবিকে। অন্তরেব সবটুকু ভক্তি ও ভালবাসা উজাড করে ঢেলে দিযে দূবেব থেকে কবিকে জানিযেছিলাম মৌন প্রণতি।

আচার্য্য সি, ভি, রমণ সেদিন সভায বক্তৃতা করেছিলেন। সভা শেষে তরুণদল আমরা তাঁর কাছে গিযে সনির্বন্ধ অনুবোধ জানালাম, আমাদের খাতায রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু লিখে দিবার জন্যে। আমাব খাতায় আচার্য্য লিখলেন,—"Rabindranath stands as the symbol of India her great past and her possibilities for future"

বর্ত্তমান যুগেব সর্বশ্রেষ্ঠ কবিব সম্বন্ধে প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেব এ উক্তি শ্রদ্ধাব সঙ্গে স্মবণ বাখবাব যোগ্য।

ছয বছর পরে।......জীবনেব স্মৃতির পটে থাকবে অক্ষয হয়ে সেই রৌদ্রদীপ্ত প্রভাতটির কথা, যেদিন বর্তমান জগতের সর্বোত্তম বিস্ময কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে যাবাব দুর্লভতম সুযোগ আমার হয। আমার এ সৌভাগ্যেব জন্যে ঋণী আমি শ্রদ্ধেয শ্রীযুক্ত বামানন্দ চট্টোপাধ্যায মহাশযের কাছে।

তেরোশ তেতাল্লিশ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন (১৯৩৬ ইং, ১৭ই জুন) সকাল-বেলা আটটাব সময রামানন্দবাবুর পরিচয়পত্রসহ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম। চিঠিখানা কবিগুরুর নিকট পাঠিযে দিযে উৎকণ্ঠভাবে বহিঃপ্রাঙ্গণে দাঁড়িযে অপেক্ষা কবতে লাগলাম। প্রধান সমস্যা হ'ল যে, গিয়ে আলাপ করব কী নিয়ে! একবার একথাও মনে হল যে, দেখা না ক'রে ফিরে যেতে পারলেই ভালো হোতো।

খানিক পরে যখন খবব এল যে, কবিগুরু দেখা করবার অনুমতি দিয়েছেন তখন ভয়-সংকোচ-আনন্দ ইত্যাদি পরস্পরবিবোধী নানা অনুভূতি যুগপৎ মনেব মধ্যে খেলে

যেতে লাগলো। বহু কষ্টে কুণ্ঠা কাটিয়ে নিঃশব্দ পদক্ষেপে কবিগুরুর কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলাম।—"বোসো" ব'লে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে আমার পানে তাকিয়ে রইলেন। আমি সে অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সমক্ষে নিজেকে বিব্রত বোধ করতে লাগলাম।

কবি একখানা ইজি চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত, গায়ে গৈরিক আলখাল্লা, পরনে গেরুয়া বসন, পায়ে একজোড়া চটি। হাতে বিজ্ঞানবিষয়ক কি একখানা বিরাট গ্রন্থ। কবির কক্ষটি বলতে গেলে একপ্রকার নিরাসবাব। পায়ের কাছে একটি মোড়া, একধারে একটি সোফা অন্যদিকে টেবিলের উপর ছু'চারখানা বই, একটি ফাউণ্টেন পেন। কবি অনেকবার বলেছেন, গৃহসজ্জায় উপকরণ-বাহুল্য তাঁর মনকে পীড়া দেয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু আমার সঙ্কোচ দূর হয়ে গেল। নীরবতা ভঙ্গ করে অত্যন্ত সহজভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনি আর ক'দিন কলকাতায় আছেন?" বললেন—"আরো ছু' তিন দিন।" —কিন্তু তার পরেই আর আমার কথা জোগায় না। কী নিয়ে যে আলাপ করব তাই ভেবে পাচ্ছিলাম না। এ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে বললাম—"গুরুদেব, আমি শুধু আপনাকে প্রণাম করতে এসেছি। আপনার সঙ্গে সাহিত্য বা শিল্পকলা নিয়ে আলাপ করবার যোগ্যতা আমার নেই।"

আমার কথা শুনে কবি মৃদু হাসলেন।

সে হাসি অবজ্ঞার নয়,—দাক্ষিণ্যের।···খানিক পরে বল্লেন,—"রামানন্দ বাবুর চিঠিতে দেখলাম তুমি মণিপুর সম্বন্ধে লিখেছ।"—একটু চুপ করে থেকে বিশেষ আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞেস করলেন,—"মণিপুরের নৃত্যকলা সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা আছে?"

বললাম—"অভিজ্ঞতা কিছুটা আছে, খাস মণিপুর রাজ্যেই আমি মণিপুরী কুমারীদের রাস-নৃত্য দেখেছি, কার্ত্তিকী পূর্ণিমার রাত্রে। সেদিন এ অপূর্বমনোহর নৃত্যকলা দেখে আমার মনে হয়েছিল এ যেন যথার্থই "সঙ্গীতে ও ভঙ্গীতে" জীবনদেবতার বন্দনা।"

"তুমি কি নিজে নাচ শিখেছ?"—কবি প্রশ্ন করলেন।

"না সে সুযোগ আমার হয় নি, আর এ বিষয়ে আমার যোগ্যতা কতটুকু সে-সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে।"

আমার কথা শুনে কবি মৃদু হেসে বললেন—"তুমি তো সিলেট থেকে আসচ। চৌদ্দ পোনের বছর আগে যখন সিলেটে যাই তখন দেখেছিলাম মণিপুরী নাচ। সে নাচ আমার মনকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সুদূর কল্পলোকে, মনে জেগেছিল নৃত্যনাট্যের পরিকল্পনা, সে যেন আমার মনকে পেয়ে বসেছিল। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের মণিপুরী নাচ শেখাবার উদ্দেশ্যে ১৩২৬ সন থেকে ১৩৩৬ সন এই দশ বছরের মধ্যে তিন তিনবারে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সবশুদ্ধ ছয়জন মণিপুরী নৃত্যশিক্ষককে আনিয়েছি শান্তিনিকেতনে। সম্প্রতি আছেন মণিপুরী নৃত্যশিক্ষক নবকুমার। "নটরাজ" অভিনয়ে প্রথম সংযোজনা

করলাম একটু অদলবদল করে মণিপুরী নাচ। মণিপুরী নৃত্যকেই ভিত্তি করে নৃত্য-নাট্যগুলোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। নৃত্যনাট্যে যে বিশেষ রস-সৃষ্টি করতে চাই তার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী হচ্চে মণিপুরী নাচ *

আরো কিছু সময় কথাবার্তা চলল মণিপুরী নৃত্য সম্বন্ধেই। মণিপুর প্রবাসকালে 'মইরাং'-এ মণিপুরী মেয়েদের 'লাইহরওবা' নৃত্য আমি দেখেছিলাম, সে-সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলাম। কবি বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। রবীন্দ্রনাথের মণিপুরী নৃত্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার বৃত্তান্ত তাঁরই মুখে শুনে আমি গর্ব অনুভব করলাম এই ভেবে যে, আমাদের শ্রীহট্টেরই উপকণ্ঠস্থ মণিপুরী পল্লীর অখ্যাত, অবজ্ঞাত নৃত্যকলা একদা কবিগুরুর মনে জাগিয়েছিল নৃত্য-নাট্য রচনার প্রেরণা।

কথার শেষে খানিকক্ষণ গভীর নীরবতা। কবিকে দেখে মনে হল, যেন তিনি আত্মস্থ, সমাহিত। কবিগুরুকে নিভৃতির মধ্যে দেখবার আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হোলো। আমি দেখলাম নিভৃত নির্জনতায় নিঃসঙ্গ কবিকে, দেখলাম অপূর্বসুন্দর জ্যোতির্ময় ঋষি রবীন্দ্রনাথকে, অঙ্গে যাঁর গৈরিকবাস, চোখে যাঁর ধ্যানস্তিমিত দৃষ্টি, প্রতিভাদীপ্ত প্রশস্তোন্নত ললাটে যাঁর স্বর্গীয় মহিমার রশ্মিচ্ছটা।

আমার তৃতীয়বার কবি-সন্দর্শন কলকাতা টাউনহলে। 'কমুন্যাল এওয়ার্ডের' প্রতিবাদে বিরাট জন-সভা। শুনলাম রবীন্দ্রনাথ করবেন সে-সভায় পৌরোহিত্য। যথাসময়ে সভায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেদিনকার কবি দর্শনপ্রার্থী জনতার বিপুল ভিড়ের কথা জীবনে ভুলবার নয়। কবিকে যখন সভামঞ্চের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল,

---

*শ্রীহট্টে রবীন্দ্রনাথের মণিপুরী নৃত্য-দর্শন ও শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্যের প্রবর্তন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় আমাকে এক পত্রে লিখেছেন * * * * "সিলেটে গিয়ে তিনি মণিপুরী নাচ দেখবারও সুযোগ পেয়েছিলেন। * * * ১৩৩১ বাংলাতে গুরুদেব একবার আমাকে সিলেটে পাঠিয়েছিলেন মণিপুরী নাচের শিক্ষক সংগ্রহ করতে। সিলেটে উপযুক্ত লোক না পেয়ে পরে আমি শিলচর থেকে রাজকুমার সেনারিস ও মহিম সিং নামক দু'জন নাচিয়েকে নিয়ে যাই শান্তিনিকেতনে। রাজকুমার কিছুদিন পরেই চলে আসেন। তার জায়গায় "নীলেশ্বর" নামক সিলেটের আর একজন মণিপুরী নাচের শিক্ষক শান্তিনিকেতনে যান। এই নীলেশ্বর ও মহিম সিং বোধ হয় শান্তিনিকেতনে বছর দুয়েক মণিপুরী নাচ শিক্ষা দিয়েছেন।" * * *

*শ্রীযুক্ত সমরেশ সিংহ নামক মাছিমপুরের একজন শিক্ষিত মণিপুরী এ সম্বন্ধে আমাদের লিখেছেন "মাছিমপুরের মনিপুরী বালকবালিকাদের নৃত্য দেখেই শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্য-শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্কল্প রবীন্দ্রনাথের মনে জাগে, তিনি প্রথমে মাছিমপুর থেকেই মণিপুরী নৃত্য-শিক্ষক নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু মাছিমপুরের মণিপুরীরা শান্তিনিকেতনের মত দূরবর্তী স্থানে যেতে রাজি না হওয়ায় তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসী মণিপুরীদের মধ্য থেকে শান্তিনিকেতনে নৃত্য শিক্ষক নিয়েছিলেন।"

তখন তাঁর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব জনমণ্ডলীর মধ্যে এমনি ঠেলাঠেলি, হুড়োহুড়ি সুরু হল যে, বেঞ্চ, চেয়ার, টেবল ইত্যাদি সশব্দে উল্টে পড়তে লাগলো। এক ক্ষীণকায় ভদ্রলোক উৎসাহের আতিশয্যে "কবিকে একবার শেষ দেখা দেখে নিই।—বলেই একেবারে তাঁর ঘাড়ের উপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়েন আর কি! ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বললাম—"আপনাদের অনুরাগের যা উৎকট অভিব্যক্তি দেখছি তাতে এই দেখাই যে শেষ দেখা হবে তাতে সন্দেহ নেই, আর তার বেশী দেরিও নেই।" ভদ্রলোক কটমট করে তাকালেন। কবির জরা-জীর্ণ দেহের পানে তাকিয়ে ভাবলাম এ-বয়সে এত ধকল সহ্য করা তাঁর পক্ষে কত কষ্টকর। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল, জাতির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার কারণ উপস্থিত হ'লে চুপ করে ব'সে থাকার ধাত তো রবীন্দ্রনাথের নয়।

সেদিনকার সভার দৃশ্যটি আজো যেন আমার চোখের সুমুখে ভাসছে। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগম হ'য়েছিল। ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় অসুস্থ কবিকে মাঝে মাঝে দিচ্ছিলেন অক্সিজেন। কবির উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষণ পাঠ করেছিলেন ভূতপূর্ব মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু, অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রও ছিলেন সভায় উপস্থিত। সভামঞ্চের মধ্যখানে বসেছিলেন কবি শান্ত, স্তব্ধ, সমাহিত হিমাদ্রির মত অভ্রভেদী বিরাট মহিমায় গরীয়ান।

সেদিন দেখেছিলাম বার্দ্ধক্যভারে অবনতদেহ, জাতীয় আত্মার অবমাননায় বেদনায় মুহ্যমান রবীন্দ্রনাথকে। প্রণতি জানিয়েছিলাম জাতির দুর্গতি, সভ্যতার সঙ্কট চিরকাল যাঁকে বিচলিত করেছে, সেই মানবতার পূজারী কবিকে।—সেই তাঁকে আমার শেষ দেখা।

কবিগুরুকে তাঁর প্রাত্যহিকতার মধ্যে দেখবার সুযোগ আমার হয়নি। কিন্তু তাই বলে যে, তাঁকে আমি কম করে পেয়েছি সে কথা সত্য নাও হ'তে পারে। আমার সান্ত্বনা এই যে, 'মহৎকে প্রণাম করবার' সৌভাগ্য তো লাভ করেছিলাম। জীবনে মাত্র একবার যে তাঁর চরণোপান্তে শ্রদ্ধাবনত শিরে উপবেশন করে তাঁর সঙ্গে আলাপআলোচনা করবার সৌভাগ্য হয়েছিল, হয় তো সে শুধু 'অনুরাগ বৃদ্ধির জন্যেই'।

"হেলা ভরে ধূলার পরে
ছড়াই কথা গুলো
পায়ের তলে পলে পলে
গুঁড়িয়ে সে হয় ধূলো॥"*

* ১৩৪১, পৌষ মাসে শ্রীযুক্ত অরুণকুমার চন্দ মহাশয়ের কন্যা জয়শ্রীর খাতায় লিখিত। রবীন্দ্রনাথের এই লেখনটি ইতিপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্র

(পরলোকগত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে লিখিত। ঠাকুরদাস এককালে ঠাকুর-বাড়ীর জমিদারীতে চাকুরী করতেন। তখনকার দিনে সাহিত্যিক হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছিলেন)

ওঁ

যোড়াসাঁকো

সাদর নমস্কার নিবেদন

আমি সম্ভবতঃ আগামী শনিবার বোলপুরে যাইব। এ কয়দিন আমাকে বড়ই ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া একটা সময় নির্দ্দেশ করিয়া এখানে আসিতে পারেন তবে বড় সুবিধা হয়। আশা করি আপনি ভাল আছেন। যদি আপনার শরীর অপটু থাকে আমাকে লিখিবেন, আমি আপনার ওখানে যাইবার ব্যবস্থা করিব। ইতি। মঙ্গলবার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

যোড়াসাঁকো
১৫ মার্চ্চ
১৮৯৫

সাদর নমস্কার সম্ভাষণমিদং

কলিকাতার খবর সমস্তই ভাল—এ পর্য্যন্ত মারীভয় আমাদের যোড়াসাঁকোর গলি পার হয় নাই। কয়দিন সুখে আলস্যভোগ করিতেছি—বেশ গরমটিও পড়িয়াছে—এই গরমে কেবল জীবন ধারণের যোগ্য নিতান্ত কর্ত্তব্য কাজগুলি ছাড়া আর কিছুতেই প্রবৃত্তি হয় না। সকল কাজেই গড়িমসি করিতেছি।

আপনাদের দেশের খবর কি? ফিরিবেন কবে? বৃষ্টি কবে হইবে তাহার কোন সঠিক খবর পাইয়াছেন কি?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সাদর সম্ভাষণ মিদং

আপনাদের সংবাদ জানাইবেন। আপনার স্ত্রীর অবস্থা এক্ষণে কিরূপ?

আমাদের এদিকে ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিয়াছে—গগনদের বাড়ির প্রায় সকল ছেলেই শয্যাগত। আপনি কেমন আছেন?

আগামীকল্য সাহিত্য-পরিষদ সভার বার্ষিক উৎসব—তদুপলক্ষ্যে আমাকে এক প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইবে—তাহারই আয়োজনে কিছু ব্যস্ত আছি—চারিদিকে এই রোগ তাপ আশঙ্কার মধ্যে প্রবন্ধ লিখিবার মত মনের অবস্থা পাওয়া কঠিন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ

আপনার চিঠি পাইয়া উত্তর লিখিতে দেরি হইল, তাহার কারণ আলস্য নহে। যদিচ, আলস্যে আমি কাহারো চেয়ে ন্যূনতা স্বীকার করিনা—কিন্তু এবারে ভাল কৈফিয়ৎ ছিল। কয়েক দিন একটি শিশু রোগীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষা লইয়া আমি অহোরাত্র উদ্বিগ্ন ও ব্যাপৃত ছিলাম। এখন সে সুস্থ হইয়াছে আমিও অবকাশ পাইয়াছি।

আপনাকে চিনিয়াছি ও সম্ভাষণ করিয়াছি ইহাতে আপনি এতদূর বিচলিত হইবেন না—অন্ততঃ এতটুকু পরিমাণে হৃদয় ভদ্রলোক মাত্রেরই কাছে দাবী করা যায়।

আপনার সাংসারিক দুর্গতির সংবাদে আমি আন্তরিক উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। ত্রিপুরা অঞ্চলে কিছুই প্রত্যাশা করিবেন না। আমি অন্যত্র চেষ্টা করিব।

এবারে আমি দীর্ঘকাল বোলপুরে থাকিব। একটু নির্জ্জন হইলেই এখানে আপনাকে ডাকিয়া লইব। এখন এখানকার প্রত্যেক গৃহই পরিপূর্ণ। আমিও অতিথি অভ্যাগতগণকে লইয়া নিরতিশয় ব্যস্ত হইয়া আছি। একটু শান্তি ও অবসর লাভ করিলেই আপনার সহিত আলোচনার সুযোগ করিয়া লইব। ইতি ২৯শে আশ্বিন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শনিবার

নমস্কার সম্ভাষণমিদং

আমার একটি রুগ্না ভ্রাতুষ্পুত্রীকে লইয়া আজই আমাকে দার্জ্জিলিং যাইতে হইতেছে।

শীঘ্র বাড়ি বদল করা আপনার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক সন্দেহ নাই। যোড়াসাঁকোর কাছে হইলেই ভাল।

বড় তাড়াতাড়ি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শুক্রবার

সাদর সম্ভাষণ মিদং

কাল বৈকালে আপনার পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ ডাক্তার সহ লোক পাঠাইয়া ছিলাম। আপনার স্ত্রীর বসন্ত হইয়াছে। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন বসন্ত পাকিয়াছে, আট ন দিন হইয়া গিয়াছে, এই জন্য আশঙ্কার কারণ বিশেষ নাই। টীকাদার তাঁহাকে দেখিতেছে এবং চিকিৎসাও ঠিক হইতেছে কেবল রোগিণীকে অধিক পরিমাণে দুধ খাওয়াইয়া বল রক্ষা আবশ্যক হইয়াছে। আপনার ছেলেমেয়েদের অবিলম্বে টীকা দেওয়া আবশ্যক—ডাক্তার ও তাঁহাদিগকে সেই কথা বলিয়া আসিয়াছেন। আপনি আর বিলম্ব করিবেন না—কলিকাতায় আসিয়াই তৎক্ষণাৎ টীকা লইবেন। ডাক্তার সিম্পসন্ লিখিয়াছে যাহাদের অল্পকাল টীকা হইয়াছে তাহারা কেহই বসন্তে আক্রান্ত হয় নাই—সতীশ বলিতেছিলেন টীকা লইয়া রোগীর সহিত একত্রে শয়ন করিলেও কোন ভাবনা নাই। অতএব আপনি শীঘ্র আসিয়া টীকা লইবেন। আপনাকে এই উপলক্ষ্যে ছুটির অতিরিক্ত আরও পনেরো দিন ছুটি মঞ্জুর করিয়া দিলাম। যাহা হউক আপনার শীঘ্রই আসা উচিত।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

মাতঃ, তোমার পিতার যন্ত্রণার কথা শুনিয়া আমি পরম দুঃখিত হইয়াছি। তোমাদের সাহায্যের জন্য আমি বিস্তর চেষ্টা করিয়াও একটি লোক সংগ্রহ করিতে পারিলাম না ;—বসন্ত রোগীর সেবায় কোন লোক অগ্রসর হইতে চাহে না। যদি কোন ডাক্তারকে সম্মত করাইতে পারি তবে তোমাদের বাড়িতে পাঠাইবার চেষ্টা করিব।

ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া থাকা ব্যতীত এক্ষণে তোমাদের অন্য উপায় দেখিতেছি না—প্রার্থনা করি ভগবান তোমাদের শান্তি বিধান করুন। ইতি। বুধবার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের কন্যার নিকট লিখিত)

কবি-প্রণাম

ওঁ

বিনযসম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন—

ইংরেজি অনুবাদে আমাব ছোটগল্প ইংবেজি পাঠকেব ঠিক রুচিকর হয় না তার প্রমাণ পেয়েছি। আধুনিক ইংবেজি সাহিত্যে গল্প লেখার যে ঠাট প্রচলিত হয়েচে তাব সঙ্গে এ সব গল্পের একটুও মিল হয় না—তাই এগুলির ইংবেজি করবার চেষ্টা করা বৃথা বলে আমি মনে করি। ইতি ৩রা জানুয়াবী, ১৯৩০ইং।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুব

(শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেনের নিকট লিখিত)

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

তোমাব পিতার মৃত্যু সংবাদে ব্যথিত হইলাম। তাঁহার সহিত আমাদেব দীর্ঘকালেব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিনি অন্তর্ধান করিযাছেন কিন্তু তাঁহাব সেই স্মৃতি বিদ্যমান রহিল। শোকেব আঘাত অতিক্রম করিয়া তোমরা শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ কর এই কামনা করি। ইতি ২ মাঘ, ১৩৪৬বাং।

শুভার্থী—
ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব

(শ্রীযুক্ত রাধানন্দ দেবশর্ম্মার নিকট লিখিত)

(পরলোকগত ডক্টর পি, কে, রায় মহাশয়ের নিকট লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র)

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু —

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

যিনি এই পত্র লইয়া আপনার কাছে যাইতেছেন তিনি আমার বিশেষ পরিচিত ও স্নেহভাজন। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী—ইঁহার পিতা শ্রীচরণবাবুকে নিঃসন্দেহ আপনি জানিতেন। অজিত বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ইঁহার দর্শন বিষয়ক প্রশ্নোত্তরে পরীক্ষকগণ বিশেষভাবে বিস্ময়বোধ করিয়াছিলেন। সেবার মোহিতবাবু চরিত্রনীতি সম্বন্ধে পরীক্ষাকর্ত্তা ছিলেন, তিনি অজিতের কাগজ দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং ইঁহাকে বোলপুর বিদ্যালয়ের কাজে নিযুক্ত করিবার জন্য আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধ বশতই আমি অজিতকে আমার বিদ্যালয়ে গ্রহণ করি। সেই অবধি ৫।৬ বৎসরকাল ইঁহার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় চলিতেছে। একথা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি বোধশক্তি ধারণাশক্তি কল্পনাবৃত্তি এবং প্রকাশক্ষমতায় ইঁহার অসামান্যতা আছে। যথোচিত সুযোগ পাইলে ইনি যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।

শিক্ষকতায় ইনি সুদক্ষ, বক্তৃতা করিবার ক্ষমতাও ইঁহার সুন্দর আছে এবং প্রবন্ধ রচনায় ইনি স্বাধীন চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়া থাকেন।

ম্যাঞ্চেষ্টারে তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য যে বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই বৃত্তি পাইবার জন্য ইনি যেরূপ উপযুক্ত এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কাহাকেও আমি জানি না, ইতিপূর্ব্বে সমিতির নিকট আমি কাহারও জন্য অনুরোধ করি নাই—সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিবার উপযুক্ত কাহাকেও আমি জানিতাম না, কিন্তু আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অজিতের জন্য আপনাদের নিকট অনুরোধ প্রেরণ করা কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করিতেছি। অজিত যদি বৃত্তিলাভ করিয়া তাঁহার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ করিয়া আসিতে পারেন তবে তাঁহার দ্বারা আমরা যে বিশেষ উপকার আশা করিতে পারিব সে সম্বন্ধে আমার মনে দ্বিধামাত্র নাই।

শিক্ষাদান, বক্তৃতা ও প্রবন্ধ রচনার দ্বারা ধর্ম্মবোধের উদ্বোধনই ইনি জীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। সে কাজে যেমন তাঁহার আগ্রহ তেমনি তাঁহার ক্ষমতা রহিয়াছে —বস্তুত একত্রে এরূপ সমাবেশ দুর্লভ। আমার বিশ্বাস ম্যাঞ্চেষ্টার বৃত্তির জন্য এরূপ যোগ্য পাত্র পাওয়া কঠিন এবং ইনি সেখানকার কলেজে গিয়া সেই বৃত্তির সম্মান রক্ষা করিতে পারিবেন। এ সম্বন্ধে আপনি যদি ইঁহার আনুকূল্য করেন তবে তাহা কদাচ ব্যর্থ হইবে না।

আপনি আমার নববর্ষের সাদর অভিবাদন গ্রহণ করিবেন। যদি অবকাশ পাই তবে সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি— ১৫ই বৈশাখ ১৩১৭

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের সৌজন্যে)

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রীতিভাজনেষু

আপনার কথা আমি ভুলি নাই। আশা রহিল কোন এক অবকাশে আশ্রমে আপনার সহিত দেখা হইবে। বিশ্ব-ভারতীর কাজ আরম্ভ হইয়াছে এ সম্বন্ধে আপনাদের সঙ্গে যোগ রাখিতে ইচ্ছা করি।

বুধবারে মন্দিরে সপ্তাহে সপ্তাহে আমি কিছু বলিয়া থাকি। ছেলেরা তাহা টুকিয়া লয়। ছেলেদের সেই খাতা হইতে কোন লেখা সেবকে পাঠাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু তাহারা এখান হইতে একটী মাসিক পত্র বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছে। ফাল্গুন মাস হইতে বাহির হইবে। এই কারণে তাহাদের কাছ হইতে কোন লেখা আদায় করা সহজ হইবে না। এক কাজ করিবেন, তাহাদের কাগজ হইতে আপনারা যে লেখা পছন্দ করিবেন তুলিয়া লইতে পারিবেন। এ কাগজের পাঠকসংখ্যা এত অল্প যে, তাহা হইতে যাহা সংগ্রহ করিবেন তাহা নূতন লেখারই পদবী গ্রহণ করিতে পারিবে। Meyer-Benfey সাহেবের বইখানি পাইয়াছি কিন্তু ভাষার অনভিজ্ঞতাবশতঃ আমার পক্ষে তাহার দ্বার রুদ্ধ।
ইতি— ১৩ মাঘ ১৩২৮

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়কে লিখিত)

ওঁ

কলিকাতা

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে। আশ্রমে আপনাকে পাওয়া আমাদের পক্ষে বিশেষ লাভ সন্দেহ নাই। বিশ্বভারতীর পরিচালনাভার এক্ষণে কমিটির হাতে, পূর্ব্বের ন্যায় আমার হাতে কর্ত্তৃত্বভার থাকিলে আপনাকে গ্রহণ করিতে আমি মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিতাম না। কমিটির নিকট আপনার প্রস্তাবটী প্রেরণ করিব। তাঁহারা অনুমোদন করিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমি আজই শান্তিনিকেতনে যাইতেছি। আশা করি সংসদের সদস্যেরা সত্বরই আপনা[illegible] অভিমত জানাইবেন। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়কে লিখিত)

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রীতিসম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার পত্রখানি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। বিশ্বভারতীর সুরটুকু আপনি ঠিক ধরিয়াছেন—তার কারণ, তার সঙ্গে আপনার মনের মিল আছে। আমার দুঃখ এই যে, আমার দেশের লোক বিশ্বভারতীকে আপন জিনিষ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে—তাহারা ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র করিয়া নিজের ঘরের কোণে তালাবন্ধ করিয়া রাখিতে চায়। কৃপণ আপন সম্পদকে যেমন একান্তে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া তাহাকে বন্ধ্যা করিয়া তুলে এবং নিজেকেও বঞ্চিত করে—আমাদের দেশ সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের সেই ভাব। নিখিল মানবের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগস্থাপন কামনা তাহার চিত্তকে মুক্তিদান করিব এই সঙ্কল্প করিয়াই য়ুরোপে কিছু কাজ করিয়াছিলাম। সেখানকার মনস্বীদিগকে আমাদের বিদ্যাসাধনার ক্ষেত্রে আমন্ত্রণ করিয়া আনিতে পারিব এরূপ সুযোগ আছে। এখনি সেখান হইতে যে কয়জন আসিয়া যোগ দিয়াছেন তাঁহাদের আত্মোৎসর্গের দ্বারা আমাদের আশ্রম পরম উপকৃত হইয়াছে। আরো অনেকেই

আসিবার জন্য উৎসুক হইয়া পত্র লিখিয়াছেন। ক্রমে পশ্চিম মহাদেশ হইতে এই সকল সাধকের সংখ্যা বাড়িয়া চলিবে। এমন অবস্থায় আপনার মত লোকের আনুকূল্য ও উৎসাহ আমি বিশেষভাবে আকাঙ্ক্ষা করি—কারণ আপনি ইহার গৌরব বুঝিবেন। ইহার Constitution শীঘ্রই ছাপা হইয়া আসিবে। আপনাকে একখণ্ড পাঠাইয়া দিব। আপনি ইহার সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইলে আনন্দিত হইব। ইহার পরে কোন এক সময়ে যখন কর্ম্ম হইতে অবকাশ কামনা করিয়া স্বাধীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইবেন তখন যদি আশ্রমে আসিয়া যোগ দিতে পারেন তবে আমার পক্ষে বড় আনন্দের বিষয় হইবে। ইতি—২৪ বৈশাখ ১৩২৯

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়কে লিখিত)

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

গ্রামে শিল্পশিক্ষা প্রবর্ত্তন ও বিস্তারের জন্য তোমরা যে চেষ্টা করিতেছ আমি একান্ত মনে তাহার সফলতা কামনা করি। এ পর্য্যন্ত দেশের জন্য আমাদের সমস্ত চেষ্টা সহরে বদ্ধ ছিল। এখন এই চেষ্টার স্রোত পল্লীতে গিয়া প্রবেশ করিতেছে, ইহাতেই আমরা যথার্থ শুভফল লাভ করিবার আশা করিতে পারি। দেশের যে সকল যুবক নিঃস্বার্থ উদ্যমের সহিত এই কল্যাণ সাধনের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা ধন্য—তাঁহারা সমস্ত দেশের আশীর্ব্বাদের পাত্র—সমস্ত বাধা বিপত্তিতে তাঁহাদের নিষ্ঠা অবিচলিত থাকে ঈশ্বর তাঁহাদিগকে এমন শক্তি দিন। ইতি— ১০ই পৌষ ১৩২৬ বাং

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ দত্তকে লিখিত)

* ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের নিকট লিখিত পত্রগুলো অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বিজয়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিছে ডাকো, মন বলে আজ না,
গেল উৎসব রাতি,
ম্লান হয়ে এল বাতি
বাজিল বিসর্জ্জন বাজনা।

সংসারে যা দেবার
মিটিয়ে দিনু এবার,
চুকিয়ে দিয়েছি তার খাজনা।

শেষ আলো শেষ গান
জগতের শেষ দান
নিয়ে যাক, আজ কোন কাজ না।
বাজিল বিসর্জ্জন বাজনা॥

দশমী, ১৩৪৩
শান্তিনিকেতন

অপ্রকাশিত কবিতা।
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের সৌজন্যে

বাণীচক্রের কথা

'বাণীচক্র' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মূলে রয়েছে জনকয়েক সাহিত্যসেবীর খেয়াল। জামতলার তরুচ্ছায়া-প্রচ্ছন্ন নিভৃত নিকেতনই এর সূতিকাগার।

১৩৪৬ সনে (১৯৩৯ইং) পূজার ছুটির অনতিপূর্বে একদিন জামতলার সান্ধ্যবৈঠকে বন্ধুবর মন্মথকুমার চৌধুরী রীতিমত সাহিত্যালোচনার উদ্দেশ্যে শ্রীহট্টে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়বার প্রস্তাব করলেন। নিত্যকার মত সেদিনকার বৈঠকেও শ্রীযুক্ত অমিযাংশু এন্দ এবং শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি দাশ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাও এ প্রস্তাবে সায় দিলেন। এমনিভাবে এই ত্রয়ীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রবন্ধ-লেখককে সম্পাদক নির্বাচিত করে বাণীচক্রের গোড়াপত্তন হোলো। মন্মথ প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করলেন।

দিন কতকের মধ্যেই সুরু হোলো কাজ। শ্রীহট্টে লেখকগোষ্ঠী সৃষ্টির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে 'বাণীচক্রে'র সভ্যেরা নিভৃতে নির্জ্জনে প্রতিষ্ঠানের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। বাণীচক্রে হোলো নবীন ও প্রবীণের সম্মিলন। বয়সে প্রবীণ হলেও মনের দিক দিয়ে যাঁরা তারুণ্যধর্মী তাঁরা তরুণদের এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করে সক্রিয় সহযোগিতায় এঁদের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

১৯৩৯ ইংরেজীর অক্টোবরের মাঝামাঝি 'বাণীচক্রে'র প্রথম বৈঠকে আলোচনা করে স্থির হোলো যে, বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন শ্রীভূমির সকল সাহিত্যিকের সমবেত প্রচেষ্টায় ব্যাপকভাবে যাতে সাহিত্যচর্চা চলতে পারে সেইটেই হবে এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য।

প্রথম বৎসরে সবসুদ্ধ তিনটি মাত্র অধিবেশন হয়। সেগুলোতে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি পঠিত হয় এবং সেগুলো সম্বন্ধে বিচার-বিতর্কও হয়।

১৯৪০ ইংরেজীতে নানা প্রতিবন্ধকতার দরুন বাণীচক্রের কাজ বেশীদূর অগ্রসর হ'তে পারে নি।

১৯৪১ ইংরেজির বৈশাখ মাসে 'বাণীচক্র ভবনে' সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশন হয়। পারস্পরিক সহযোগিতা দ্বারা যাতে শ্রীহট্টের সাহিত্যিক আন্দোলনের স্রোতোধারাকে বিচিত্র ও বহুমুখী করা যায় সে-উদ্দেশ্যে শ্রীহট্টের সকল সাহিত্য-সেবীকেই সে-আসরে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল।

বাণীচক্রের তৃতীয় বৎসরের প্রথম প্রচেষ্টা মহাসমারোহে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একাশী-তিতম জন্মউৎসব উদ্‌যাপন। এই উৎসবের দিন হতেই বিশ্বভারতীর সঙ্গে বাণীচক্রের যোগসূত্র স্থাপিত হোলো। বাণীচক্রের প্রতি বাংলার কোনো কোনো মনীষীর মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ার সূত্রপাতও তখন থেকেই।

শ্রাবণ মাসে কবিগুরুর আকস্মিক তিরোধান বাণীচক্রের সভ্যদের কাছে নিদারুণ দুঃসংবাদ বহন করে আনে। ১৮ই আগষ্ট তারিখে শোক-সভায় কবিগুরুর শ্রদ্ধাতর্পণ করা হয়।

৬ই সেপ্টেম্বর শরৎ-জন্মতিথি উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। সভায় শরৎ-প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

১৮ই সেপ্টেম্বর 'বাণীচক্র ভবনে' বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও মনীষী শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর জয়ন্তী-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। মফস্বলে বাণীচক্র কর্তৃকই প্রথম প্রমথ-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী কর্তৃক বাংলা গদ্যে নূতন ধারার প্রবর্তন, বাংলা দেশে মনন-সাহিত্য সৃষ্টিতে 'সবুজ পত্রে'র প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে সভায় আলোচনা করা হয়।

২৯শে সেপ্টেম্বর বাণীচক্রে প্রাচ্য-রীতি অনুসারে শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জয়ন্তী-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এ ব্যাপারেও মফস্বলে 'বাণীচক্র'ই অগ্রণী। অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-প্রতিভা, তাঁর গদ্যের নিজস্ব ভঙ্গী, এবং তাঁর গদ্য-কবিতা ও শিশু-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

বাণীচক্র সংস্কৃতির অখণ্ড সমগ্র রূপের উপাসক। সেই উদ্দেশ্যে এ বছর, গ্রন্থ-বিভাগ, বীথিকা, (Study Circle) রবিচক্র, এবং নবনাট্যচক্র—এই চারটী নূতন বিভাগ খোলা হয়েছে।

"বাণীচক্র ভবনে"র প্রকাশিত প্রথম পুস্তক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি দাশের "আকাশ"। এই কাব্য-গ্রন্থখানা বাংলা দেশের বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রশংসিত হয়েছে এবং কাব্যরসিকদের বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। "কবি-প্রণাম" 'বাণীচক্র ভবন' থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় পুস্তক। শীঘ্রই আরো খানকয়েক পুস্তক প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

নভেম্বর মাসে "বীথিকার" সম্পাদক মৃণালকান্তি দাশের বাসভবনে "বীথিকার" উদ্বোধন উপলক্ষে বাণীচক্র সম্পাদককে বাংলা-সাহিত্যে কল্লোলের যুগ সম্বন্ধে আলোচনা করতে হয়। আধুনিক সাহিত্য-প্রগতির ধারাটি অনুসরণই 'বীথিকা' প্রতিষ্ঠিত করার মূল উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা এবং মর্মবাণী প্রচার রবিচক্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রীযুক্ত অমিয়াংশু এন্দ এর সম্পাদক। শীঘ্রই "রবিচক্রের" উদ্যোগে শ্রীহট্টে একটি রবীন্দ্র গ্রন্থাগার খোলা হবে। রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত সকল রচনাই যাতে রবিচক্রে সংগৃহীত হয় সে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কবিগুরুর অপ্রকাশিত চিঠি পত্র এবং কবিতা ইত্যাদি সংগ্রহের করবার চেষ্টাও "রবিচক্র" থেকে হবে।

বাংলার গতানুগতিক অভিনয়-কলা, নাটক রচনা এবং প্রযোগ পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তনের সংকল্প নিয়ে মন্মথকুমার চৌধুরীর সম্পাদকত্বে নব-নাট্যচক্রের ভিত্তি পত্তন করা হয়েছে। নাট্য-শ্রী নামে শ্রীহট্টে জাতীয় রঙ্গমঞ্চ (National Theatre) স্থাপনের আয়োজনও করা হচ্ছে।

"বাণীচক্র" এখন শুধু আর মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাহিত্যিকের ঘরোয়া বৈঠক নয়। এই

প্রতিষ্ঠানটি এখন দশজনের সম্পত্তি। এর অজ্ঞাতবাসের মেয়াদ ফুরিয়েছে; এখন জনতার হাতে এর কারবার। এর শ্রীবৃদ্ধির দায়িত্ব এখন শুধু আমাদের নয়,—সকলের।

বিগত তিন বৎসর যাবৎ "বাণীচক্র" অনমনীয় দৃঢ়তায় তার লক্ষ্য-পথে এগিয়ে চলেছে। "বাণীচক্র" সাহিত্যে কোন 'ইজমের' প্রচার করতে বা সাহিত্যিক উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে চায় না। একটি [illegible] প্রগতিশীল সাহিত্যিক আন্দোলনের ধারা প্রবর্তনই তার মূল উদ্দেশ্য। আশার কথা, বাংলার প্রত্যন্তপ্রদেশের এই সাহিত্যিক আন্দোলনের বার্তা শ্রীভূমির প্রান্ত-সীমা অতিক্রম করে বাংলাদেশে গিয়ে পৌঁছেছে এবং এর প্রতি বাংলার সুধীসমাজের দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকৃষ্ট হয়েছে।

নলিনীকুমার ভদ্র

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

হে বিধাতা
রেখো না আমারে
বাক্যহীনা,
রক্তে মোর জাগে
রুদ্রবীণা॥
রবীন্দ্রনাথ

পরিশিষ্ট

শ্রীহট্টে রবীন্দ্রনাথ

সুধীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ

তেরোশ ছাব্বিশ বাংলার কার্তিক মাসের মাঝামাঝি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তখন বেড়াতে এসেছেন শিলঙে। আমার পিতা, ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন সম্পাদক, পরলোকগত গোবিন্দনারায়ণ সিংহ মহাশয় ছিলেন কবির একান্ত অনুরাগী। কবি শিলঙে এসেছেন একথা শুনবামাত্রই তাঁকে সিলেটে আনবার জন্যে পিতার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হ'ল। চটপট তিনি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে কবিকে সিলেটে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে 'তার' করলেন। কবি জবাবে জানালেন, সিলেটে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। কেননা, দীর্ঘ পথ-ভ্রমণ বিরক্তিকর—("Journey long and tedious")। বাবা কবির অসম্মতি-জ্ঞাপক 'তার' পেয়েও নিরস্ত হলেন না, 'আঞ্জুমান ইসলাম' 'মহিলা সমিতি' ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও টেলিগ্রাম করবার ব্যবস্থা করালেন। এমনি ভাবে যখন তাঁর কাছে আহ্বানের পর আহ্বান পৌঁছতে লাগলো তখন অগত্যা তাঁকে সম্মতি জানাতে হ'ল।

তখন সিলেট-শিলঙ মোটর রাস্তা খোলা হয়নি। সাধারণত আসাম বেঙ্গল রেল পথেই শিলং থেকে লোকেরা যাতায়াত করত। চেরাপুঞ্জী দিয়ে থাবায় করে খাসিয়াদের পিঠে চড়ে আসবারও ব্যবস্থা ছিল। কবি কিন্তু মানুষের পিঠে চড়তে কিছুতেই রাজি হলেন না। তিনি নাকি বলেছিলেন "বরং দশ মাইল হেঁটে পাহাড় উৎরাই করতে পারি তবু মানুষের কাঁধে চড়তে পারবো না।" সেই জন্যে চেরাপুঞ্জীর রাস্তা দিয়ে না এসে আসাম-বেঙ্গল রেলপথ দিয়েই তিনি শ্রীহট্ট অভিমুখে রওনা হলেন। কবি সিলেটে আসছেন এ সংবাদ প্রচারিত হবামাত্রই সারাটা শহরে যেন জীবন-চাঞ্চল্য জাগল। স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী এবং অভ্যর্থনা সমিতি গঠনের তোড়জোড় সুরু হ'ল।

কবিকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্যে আমাকে বদরপুর পর্যন্ত যেতে হয়। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ৺হরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, ৺ক্ষীরোদচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত ধর্মদাস দত্ত প্রভৃতি কুলাউড়া পর্যন্ত অগ্রসর হলেন।

তখন বদরপুর রেলওয়ে জংশনের কোয়ার্টারে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র, আমার আত্মীয় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরী সপরিবারে থাকতেন। শ্রীযুক্তা চৌধুরী-জায়াও পড়াশুনা করেছিলেন শান্তিনিকেতনেই। সুগায়িকা বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁরাও উভয়ে বদরপুর থেকে কবির সহযাত্রী হলেন। কবির সঙ্গে ছিলেন তাঁর পুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী। কবি-পরিবারের সঙ্গে আমি পরিচিত হলাম পিতার প্রতিনিধিরূপে। আরো একটি মানসিক যোগসূত্রের পরিচয় কথা প্রসঙ্গে বেরিয়ে গেল। আমি ছিলাম শান্তিনিকেতন পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক। তখন কিন্তু, উক্ত পত্রিকার প্রচার শুধু আশ্রমিকদের এবং প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

বদরপুরে কবিদর্শন-প্রার্থী জনতার ভিড় দেখে রবীন্দ্রনাথ ট্রেনের কামরা থেকে নীচে নেমে এসে স্তব্ধ, শান্তভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন,— দর্শকমণ্ডলী মুগ্ধ বিস্ময়ে নির্বাক। তখন পশ্চিম আকাশের অস্ত

সূর্যের সোনালি সমারোহ। দূরে সুনীল শৈলমালা দিগন্তের কোলে গিয়ে মিশেছে, আশেপাশে টিলার উপরকার কৃষ্ণচূড়া গাছের মসৃণ চিক্কণ পাতার ফাঁকে ফাঁকে অস্ত সূর্যের তির্যক রশ্মিজাল কবি রবির শ্বেত কেশশ্মশ্রু, শুভ্র পরিচ্ছদ এবং সুগৌর দেহকে সোনালি আভায় মণ্ডিত করে তুলল। এই পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে কবিকে দেখে মনে হল, তিনি যেন কোন অমর্তালোকের অধিবাসী, দিব্য দেহধারী। কবির গানের দুটি ছত্র মনের মধ্যে গুঞ্জরণ করতে লাগলো "মোর সন্ধ্যায় সুন্দর বেশে এসেছ তোমায় কবি গো নমস্কার।"

কুলাউড়াতে কবি রাত্রিবাস করলেন্ ট্রেণে। পরদিন প্রাতে সিলেটের 'প্রেসবিটেরিয়ান চার্চে'র মিসেস ইথেল রবার্টস ট্রেণে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর খ্যাতি শুনে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছেন একথা বলায় কবি জবাব দিয়েছিলেন যে, এইটেই তাঁর পক্ষে মস্ত একটা 'পেনাল্‌টি' যাকে বলা চলে খ্যাতির বিড়ম্বনা।

মাইজগাঁও, বরমচাল, ফেঞ্চুগঞ্জ প্রভৃতি ষ্টেশনেও কবিকে সমাদরে অভ্যর্থনা করা হয়। ১৯শে কার্ত্তিক বুধবার* প্রাতে সিলেট ষ্টেশনে কবির শুভ পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই পোড়ানো হ'ল অনেকগুলো আতসবাজি, সমবেত জনতার তুমুল হর্ষধ্বনিতে মুখরিত হ'য়ে উঠলো চারিদিক। কবিকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে মুানিসিপ্যালিটীর তদানীন্তন চেয়ারম্যান রায়বাহাদুর সুখময় চৌধুরী, শ্রীহট্টের কৃতী সন্তান কবির পূর্ব্ব-পরিচিত আব্দুল করিম সাহেব, প্রাক্তন মন্ত্রী খান বাহাদুর আবদুল মজিদ, রায় বাহাদুর প্রমোদচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সকলেই সমবেত হয়েছিলেন ষ্টেশনে। মহিলাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে গিয়েছিলেন শ্রীযুক্তা নলিনীবালা চৌধুরী।

সুরমা নদীর ঘাটে ছিল সুসজ্জিত মোটরবোট ও বজরা। কবি উঠলেন বোটে আর তাঁর পুত্র, পুত্রবধূ প্রভৃতি উঠলেন বজরাতে। বোট সুরমার জলে ভাসল। বোটেই পিতা কবির সঙ্গে পরিচিত হলেন। বোট ধীরে ধীরে তীরে এসে ভিড়তে লাগল। নদীতীরে কাজিরবাজার থেকে ডাকবাংলো অবধি আন্দাজ মাইলখানেক বিস্তৃত বিশাল জনতা। নদীর উভয় তীরে সমবেত বিপুল জনসঙ্ঘের কণ্ঠনিঃসৃত 'বন্দেমাতরম', 'রবীন্দ্রনাথকী জয়', "আল্লা হো আকবর" ইত্যাদি আনন্দধ্বনিতে কানে তালা লাগবার উপক্রম হ'ল।

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান— বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী, ইংরাজ প্রভৃতি সকল জাতীয় লোকেরাই নদীতীরে সমবেত হয়েছিল কবির পুণ্যদর্শন লাভ করে ধন্য হবার উদ্দেশ্যে। এই রাজোচিত সম্বর্দ্ধনা কবির অন্তর স্পর্শ করল। মফঃস্বলে যে সব জায়গায় তিনি সম্বর্দ্ধনা লাভ করেছিলেন তার মধ্যে শ্রীহট্টের এই কবি সম্বর্দ্ধনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন সুদূর শ্রীহট্টেও যে তাঁর প্রভাব এত বেশী কবি বোধ করি তা জানতেন না। এই সর্ববর্ণ সর্বধর্ম সর্বজাতির লোকদের সম্মিলিত কবিসম্বর্দ্ধনা শ্রীহট্টের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা।

ধীরে ধীরে বজরা এসে চাঁদনিঘাটে ভিড়ল। চাঁদনিঘাট পত্র-পুষ্প-পতাকা মঙ্গলঘটে সুসজ্জিত, ঘাটের সবগুলো সিঁড়ি লাল শালুতে মোড়া। মৌলবী আব্দুল্লা সাহেবের অধিনায়কত্বে স্বেচ্ছাসেবকের দল সারবন্দীভাবে দাঁড়িয়ে। মজুমদারবাড়ী, দস্তিদারবাড়ী, আহিয়া সাহেবের বাড়ীর প্রতিনিধিরা এসেছিলেন অশ্বারোহণ করে, কবিকে অভ্যর্থনা করবার জন্য।

* বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত Tagore Birthday number-এ তারিখটি ঠিকমত দেওয়া হয়নি।

কবি বজরা থেকে অবতরণ করবামাত্র সমবেত জনমণ্ডলী তাঁকে জানাল অভিবাদন। কবিও স্মিতমুখে সবাইকে প্রত্যভিবাদন করলেন। ভাগ্যবান যাঁরা তারা কবির পায়ের ধূলো মাথায় মেখে, তাঁর সঙ্গে দু'চারটে কথা বলে কৃতার্থ হলেন। শ্রীভূমি বর্তমান যুগের সবশ্রেষ্ঠ কবির পদরেণু-কণা লাভ করে কৃতার্থ হ'ল। আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে কবি উপরে উঠতে লাগলেন। মৌলবী আবদুল করিম সাহেবকে নিয়ে কবি ফুলের মালা ও পাতাবাহারে সুসজ্জিত একখানা ফিটনে এসে উঠলেন। কবি শকটে আরোহণ করবামাত্রই স্কুল কলেজের ছাত্রেরা অশ্বগুলোকে নিবৃত্তি দিয়ে নিজেরাই গাড়ী টেনে নিয়ে চললো। কবি ত প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতেই পারেননি। শেষে যখন ঘটনাটা হৃদয়ঙ্গম করলেন, তখন বারণ করতে লাগলেন। কিন্তু, ছাত্রেরা তখন উৎসাহের আতিশয্যে গাড়ী টেনে নিয়ে প্রাণপণে ছুটেছে, কে কার কথা শোনে। কবি নাকি এজন্যে শেষে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন।

শহরের উত্তর পূর্বাংশে ছোট একটি টিলার ওপর ছিল পাদ্রী টমাস সাহেবের বাংলো। জায়গাটির প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। টিলার উপর দাঁড়িয়ে উত্তর দিকে তাকালে নজরে পড়ে ছেদহীন, নিবিড়শ্যাম বনরাজি দিগন্তে গিয়ে মিশেছে, আর সেই বন-ভূমির পশ্চাতে সুনীল আকাশ দিগন্তে পাঁচিল রচনা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। টমাস সাহেব তার বাংলোর পাশের বাড়ীখানি কবির অবস্থানের জন্য ছেড়ে দিলেন। কবি সেখানে পৌছলে পুরোপুরি প্রাচ্য-রীতি অনুসারে তাকে অভ্যর্থনা করা হ'ল। ধূপগন্ধে দিক্ আমোদিত। কবি-বরণ করবার জন্যে মাল্য-চন্দন হাতে নিয়ে মেয়েরা দাঁড়িয়ে দোরগোড়ায়। কবি সোপানে পদার্পণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই যুগপৎ বেজে উঠলো কতকগুলো শাঁখ। আমাদের পরিবারের দুটি মেয়ে লালা ও সুরো কবির ললাটে চন্দন-তিলক এঁকে দিলেন আর কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন পুষ্পমাল্য। তারপর তাঁরা গাইলেন *

"তোমারি নাম বলব আমি
বলব নানা ছলে।"— কবির এই গানটি।

কবির পুত্র, পুত্রবধু এবং শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রটি সস্ত্রীক আগেই এসে পৌছেছিলেন। কবির থাকবার জায়গা নির্দিষ্ট হয়েছিল পূর্বদিকের কামরায়। বাংলোয় শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন দু'জন ছাত্র এসে কবির সঙ্গে দেখা করলেন।

বাংলোর বহির্দ্বারে টাঙানো ছিল মণিপুরীদের তৈরী প্রায় পঞ্চাশ বছরের পুরনো একখানা আচ্ছাদন বস্ত্র। স্থানান্তর থেকে পর্দাখানা আনীত হয়েছিল। ঐ আচ্ছাদন-বস্ত্রে মণিপুরীদের শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় পেলে কবি মুগ্ধ হলেন। ইচ্ছে হলে পর্দাটি শান্তিনিকেতনের জন্যে নিয়ে যেতে পারেন একথা বলায় কবি বললেন—"এ যে দিনে দুপুরে ডাকাতি।" ঐ দিন সন্ধ্যা সাতটায় ব্রাহ্ম সমাজের কর্তৃপক্ষ ব্রহ্মমন্দিরে কবির উপাসনার ব্যবস্থা করলেন। বেলা পাঁচটা বাজতে না বাজতেই মন্দিরে জনসমাগম হতে লাগলো। দেখতে দেখতে মন্দির অভ্যন্তর এবং মন্দির-প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হ'য়ে গেল।

সাতটা বাজবার কয়েক মিনিট আগে গৈরিক বসনে আবৃত-দেহ, ঋষি-কবি মন্দিরে এসে পৌছলেন। তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই যেন জনতার তুমুল-কোলাহল এক মুহূর্তে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

* লীলা (শ্রীমতী লীলাবতী সিংহ মজুমদার) কয়েক বৎসর পরে ঠাকুরবাড়ীতে পাগলাঝোরা উৎসবে একা সমস্ত solo গান করে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। —সম্পাদক কবি প্রণাম।

প্রথমেই ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক কবিকে একটি সঙ্গীত করবার জন্যে অনুরোধ করলেন। কবি গাইলেন—

"বীণা বাজাও হে মম অন্তরে।
সজনে, বিজনে, বন্ধু, সুখে দুঃখে বিপদে,
আনন্দিত তান শুনাও হে মম অন্তরে।"

তারপর বৈদিক ঋষির মতোই উদাত্ত গম্ভীর স্বরে তিনি "সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি শান্তম শিবমদ্বৈতম্" উপনিষদের এই মন্ত্র উচ্চারণ করে উপাসনা আরম্ভ করলেন। কবির শিষ্যা শ্রীযুক্তা ইন্দু দেবী গাইলেন "মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ—" এই গানটি।

পরদিন, ২০শে কার্তিক বৃহস্পতিবার সকালে আটটার সময় কবিকে টাউনহলের প্রাঙ্গণে শ্রীহট্টবাসী জন-সাধারণের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা করা হল। সভায় প্রায় পাঁচহাজার নরনারীর সমাগম হয়েছিল। প্রথমে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দেব চোধুরী, উকীল অম্বিকাবাবুর রচিত কবি-প্রশস্তিমূলক একটি গান গাইলে পর সঙ্গীতজ্ঞ ৺যামিনীকান্ত রায় দস্তিদার মহাশয় বেহালা বাজিয়ে কবির চিত্ত বিনোদন করলেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সৈয়দ আব্দুল মজিদ সাহেব উর্দু ভাষায় প্রায় দশ মিনিটকাল কবির শুভ উপস্থিতিতে শ্রীহট্টবাসীরা কতদূর আনন্দিত হয়েছেন তা বর্ণনা করলেন। অভিনন্দন পত্র পাঠ করেছিলেন ৺নগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়। তারপর কবি বক্তৃতা দেবার জন্যে দণ্ডায়মান হবামাত্রই ঘন ঘন হর্ষধ্বনি উত্থিত হতে লাগলো। জনসঙ্ঘের আনন্দোচ্ছ্বাস প্রশমিত হ'লে পর কবি প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল 'বাঙ্গালীর সাধনা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করলেন।"

ঐ দিন দুপুরবেলা তিনি অধ্যাপক নলিনীমোহন শাস্ত্রী মহাশয়ের আমন্ত্রণে তাঁর বাস-ভবনে যান। বেলা দুটোর সময় ব্রাহ্মসমাজ গৃহে মহিলা সমিতি কর্তৃক অভিনন্দিত হন। মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা অভিনন্দন পত্র পাঠ করলে পর কবি সময়োপযোগী বক্তৃতা করেন। মহিলা সমিতি কর্তৃক বাঁশের চোঙের মত আকৃতিবিশিষ্ট একটি রৌপ্যাধারে কবিকে মানপত্র দেওয়া হয়। শ্রীযুক্তা কমলাক্ষী চৌধুরী (বর্তমানে বিশ্বাস)—

"তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম্ম মুছায়ে"

কান্তকবির এই গানটী গাইলেন। তাঁর সুললিত কণ্ঠের মধুর সঙ্গীত কবিকে আনন্দ দান করেছিল।

মণিপুরীদের বস্ত্র শিল্পে নৈপুণ্যের পরিচয় পাবার পর থেকেই মণিপুরী তাঁত এবং তাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী দেখবার জন্যে কবির প্রবল ইচ্ছা হয়েছিল। মহিলা-সমিতি থেকেই মণিপুরী পল্লী পরিদর্শন করবার উদ্দেশ্যে তিনি মাছিমপুর গিয়ে পৌছলেন। কলানিপুণ মণিপুরীরা তাদের পল্লীর প্রবেশপথে সারি সারি কলাগাছ পুঁতে সুন্দর একটি তোরণ তৈরি করেছিল। গেটটি কাগজ-কাটা ফুল-লতা-পাতা দিয়ে সুশোভিত, তোরণদ্বার থেকে রাস্তার উভয়পার্শ্বে অনেকগুলো সপত্র আম্রশাখা মাটিতে প্রোথিত করে রাখা হয়েছিল। মণিপুরীদের সহজাত সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় পেয়ে কবি খুসি হয়েছিলেন। মণিপুরী মেয়েদের তাঁতে-বোনা কাপড় দেখে পছন্দ হওয়ায় কিছু কিনে আনলেন। মাছিমপুরে মণিপুরী ছেলেরা কবিকে রাখাল-নৃত্য দেখালো। মেয়েদের নাচ রাত্রে দেখবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেলা তিনটার সময় বাংলোয় ফিরে এলেন।

সন্ধ্যা সাতটার সময় টাউনহলে কবির বক্তৃতা হবার কথা। কিন্তু বেলা চারটা থেকেই জনসমাগম হতে লাগল। শেষে আর সভাস্থলে তিলধারণের জায়গাও রইল না। ভিতরে জায়গা

শ্রীহট্টে রবীন্দ্রনাথ (১৩২৬ বাংলা, ২১শে কার্ত্তিক)

মহিলাগণ সহ রবীন্দ্রনাথ। কবির বামদিকে প্রতিমা দেবী।

(শ্রীযুক্তা মালতী সিংহ মজুমদারের সৌজন্যে।
ছবিটি ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নি)

না পেয়ে অনেকে বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলেন। সাতটার সময় একখানা সিটনে করে কবি সভায় এসে পৌছলেন। সঙ্গে সঙ্গেই সহস্রকণ্ঠনিঃসৃত বন্দেমাতরম ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হ'য়ে উঠল।

সেদিন কবিকে যাঁরা দেখেছিলেন এবং তাঁর বক্তৃতা শুনেছিলেন, তাঁরা পরম ভাগ্যবান্। কেন না, সিলেটে কবি যে সমস্ত বক্তৃতা করেছিলেন তন্মধ্যে এইটিই সবচেয়ে উদ্দীপনাপূর্ণ এবং প্রাণস্পর্শী হয়েছিল। দুঃখের বিষয় অনুলিখিত না হওয়ার দরুণ কবির এই অমূল্য বক্তৃতাটি চিরস্থায়ীরূপে রক্ষিত হ'লনা।

আজো আমার সেদিনকার কথা সুস্পষ্টরূপে মনে আছে। বক্তৃতা সুরু হ'ল প্রথমে খুব ধীরে ধীরে, কণ্ঠস্বর কানে পৌছায় না। তারপর আস্তে আস্তে কণ্ঠ তাঁর উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠতে লাগল। কবি সে-বক্তৃতায় আমাদের দেশের দুর্দশার যথার্থ হেতু বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন যে, নিম্ন বর্ণের লোকদের প্রতি উচ্চ বর্ণের অবজ্ঞা ও অপ্রীতিই ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ। ভারতবর্ষের পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে একতাসূত্রে আবদ্ধ হওয়া। তিনি আশা করেন যে, একদিন পৃথিবীর এক ধর্ম হবে। সেদিন স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত বাধবে না। বিভেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার পাদপীঠ হবে ভারতবর্ষ। কেন না, এখানে যত ভাষা, ধর্ম, আচার-ব্যবহার-বর্ণগত পার্থক্য বিশিষ্ট নরনারীর বাস পৃথিবীর আর কোথাও তত নয়। উপসংহারে বল্লেন—"সূর্য্য পূর্ব্বদিকেই উদিত হয়। বাংলা দেশ ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত, সমগ্র ভারতবর্ষ তাই আজ বাংলার দিকে আশা করে চেয়ে আছে। বাঙালীকেই আজ ভারতের এই জনজাগরণযজ্ঞে পৌরোহিত্য করতে হবে।" মনে আছে এই বক্তৃতায় এক জায়গায় কবি বলেছিলেন—"এক নয়, দুই নয়, বহু বহু রাজা আমাদের শোষণ করছেন।" তা ছাড়া একথাও বলেছিলেন—"কাগজের নৌকোতে ক'রে ভবসমুদ্র পার হওয়া যায় না।" মানে দরখাস্ত পেশ ক'রে স্বরাজ মেলে না। "অধর্ম্মেন এধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি ততঃ সপত্নান জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি"—তাঁর প্রিয় এই শ্লোকটি আবৃত্তি করে তার তাৎপর্য্য বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

পরদিন ভোরবেলা পুত্র এবং পুত্রবধূ সহ কবি আমাদের বাড়ীতে শুভ-পদার্পণ করলেন। আমার অগ্রজ শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনারায়ণ সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র ও ভগিনী শ্রীমতী সুরবালার কন্যার নামকরণ করলেন দক্ষিণের ভিটের নবনির্মিত গৃহে। ছেলের নাম রাখলেন শুভব্রত আর মেয়েটি খুব ফর্সা হয়েছিল বলে তার নাম রাখলেন দীপ্তি।

নামকরণের অনুষ্ঠান শেষ হ'লে পর বহির্বাটীতে উত্তর দিকবার ঘরটিতে এসে বসলেন এবং কিঞ্চিৎ জলযোগ করলেন। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বে পিতৃব্য পরলোকগত শম্ভুনারায়ণ সিংহ যেখানে শ্রীহট্ট হিন্দু সংরক্ষিণী সমিতি স্থাপন করেছিলেন কবির পদ-রেণুকণাস্পর্শে সে-স্থান পবিত্র হ'ল। মহর্ষি এবং রবীন্দ্রনাথের একত্রে তোলা একখানা ফটো ঘরের দেয়ালে টাঙানো ছিল। পিতা ছবিটি কবির হাতে দিলেন, কবি মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন—"আপনি মহর্ষিকে দেখেছেন?" পিতা সম্মতিসূচক ভাবে ঘাড় নাড়লে কবি আনন্দিত হলেন। একটু পরে বারান্দায় কবি এবং কবি-পরিবারের ছবি তোলার উদ্যোগ আয়োজন সুরু হ'ল। পিতা কবির পাশের আসনটি ছেড়ে দিয়ে নীচে বসবার উদ্যোগ করতেই তিনি বললেন—"দেখুন, এ আসনে যে আপনারই বসবার দাবী, host and guest পাশাপাশি বসাই নিয়ম।"

বাংলোয় ফিরে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরেই কবিকে আবার কলেজ হোষ্টেলে রওনা হ'তে হ'ল বক্তৃতা দেবার জন্যে। ছাত্রেরা একটি ক্ষুদ্র শোভাযাত্রা গঠন করে, কবিকে নিয়ে এল গীতবাদ্যসহকারে পত্রপুষ্পমাল্যপতাকা ও মঙ্গলঘট সুসজ্জিত সভামণ্ডপে। সবসুদ্ধ প্রায় চার হাজার লোক সমবেত হয়েছিল কবির বক্তৃতা শুনবার জন্যে, তন্মধ্যে প্রায় হাজার দু'য়েকই হবে ছাত্র। ছাত্রদের অভিনন্দন-পত্র পাঠান্তে কবি প্রায় এক ঘন্টাব্যাপী দীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

সভা শেষ হ'লে কবি অধ্যক্ষ অপূর্ব চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আমন্ত্রণে তাঁর বাড়ীতে বেড়াতে যান। আজ সে বাড়ীটির চিহ্নমাত্র নেই। ইদানীং সেখানে সরকারী হাসপাতালের প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে।

সন্ধ্যাকালে কবি রায় বাহাদুর ৺নগেন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাসভবনে এক প্রীতি-সম্মেলনে যোগদান করলেন। শ্রীহট্টের বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ সেদিন তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবার সুযোগ লাভ করে কৃতার্থ হয়েছিলেন। কলেজের অধ্যাপকরাও প্রায় সকলেই ছিলেন সে আসরে উপস্থিত। কবি বেশ প্রসন্নচিত্তে আলোচনায় যোগদান করেছিলেন।

রাত্রে মণিপুরী বালক বালিকারা বাংলোতে এসে উপস্থিত হ'ল কবিকে নাচ দেখাবার উদ্দেশ্যে। নৃত্য আরম্ভ হবার পূর্বে একজন মণিপুরী হারমোনিয়মে সুর ধরবার উদ্যোগ করতেই কবি তাকে বারণ করলেন। নয়নাভিরাম জাঁকালো পরিচ্ছদ-পরিহিত অপূর্ব লাবণ্য শ্রীমণ্ডিত মণিপুরী বালিকারা তাদের বাহুগুলো নৃত্যচ্ছন্দে দোলায়িত করে, বলয়াকারে ঘুরে ঘুরে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং কলারসজ্ঞকে তাদের জাতীয় নৃত্য দেখিয়ে তাঁর প্রশংসা অর্জ্জন করল। কবি তাদের নৃত্যে মুগ্ধ হয়ে বিশ টাকা পুরস্কার দিলেন। কথাপ্রসঙ্গে এ নৃত্য সম্বন্ধে বললেন,--"graceful best form of physical exercise"

কবি যে কয়দিন শ্রীহট্টে ছিলেন সে কয়দিন তাঁর আহারের সময় শ্রীযুক্তা নলিনীবালা চৌধুরী প্রমুখ মহিলারা খাবার টেবিলের চারপাশে ঘিরে বসতেন। মেয়েদের নিকট কবি বেশ রসাল গল্প বলতেন। শ্রীহট্টের 'ডিঙামাণিক' নামক এক প্রকার সুদৃশ্য কদলী দেখে বলেছিলেন, 'হাঁ, মাণিককে ডিঙিয়েছে বটে।'

কবির জন্যে একখানি এগারো হাত গরদের বস্ত্র কিনে আনা হয়। দেখে তিনি সহাস্যে বলেন--"আমার মতো ঢেঙা লোকও সিলেটে আছে না কি?" সেই দারুণ শীতেও দেখেছি রাতে তাঁর শোবার ঘরের দরজা জানালা খোলা থাকত। রাতে চৌকি দিতে হবে না বলে তিনি সরোজকুমার সেন (বর্তমানে আনন্দবাজারের সহকারী সম্পাদক) প্রভৃতি স্বেচ্ছাসেবকদের রেহাই দিলেন।

বাংলোতে কবিকে নিয়ে তিনখানা 'গ্রুপ ফটো' তোলা হয়। একটিতে শুধু পুত্র ও পুত্রবধূ সহ কবির ছবি তোলা হয়েছিল।

এমনিভাবে কবির বহুবাঞ্ছিত সান্নিধ্য উপভোগ করে কয়েকটি দিন কাটলো। এ কয়দিন সিলেট শহরটি যেন উৎসবানন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সভাসমিতিতে অগণিত জনসমাগম, কবিদর্শনপ্রার্থী জনতার অধীর ঔৎসুক্য, ছাত্রদের মধ্যে অসীম উৎসাহ এর পূর্বে এমনভাবে সিলেটে আর কখনো দেখা যায়নি। কবির বিদায়ের মুহূর্ত যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল, ততই সকলের মন যেন গভীর বিষাদে

ছাত্রছাত্রী ছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারে শ্রীযুক্ত অনাদি দস্তিদার, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রমোদ দত্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী অমলা রায় (কৃষ্ণা) প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র সমরেশ চৌধুরী বর্তমানে কলকাতায় রবীন্দ্র-সঙ্গীতে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। রেডিয়ো এবং গ্রামোফোন রেকর্ডে তিনি প্রায়ই গেয়ে থাকেন। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "গীতাঞ্জলি" নামক কলকাতার সঙ্গীত বিদ্যালয়ে তিনি একজন শিক্ষক। শ্রীহট্টের শ্রীমতী রেবা রায় * নৃত্যাভিনয়ে পারদর্শিতার জন্যে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

সুনামগঞ্জের পল্লীকবি দেওয়ান হাছন রজা'র লেখা কতকগুলো পল্লীগীতি ঘটনাচক্রে রবীন্দ্রনাথের হাতে পৌঁছেছিল। প্রাদেশিক ভাষার বাধাসত্ত্বেও সেগুলোর অন্তর্নিহিত সহজ, সরল, অথচ উচ্চভাবের মর্মকথা রবীন্দ্রনাথের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। পাশ্চাত্যে হিবার্ট লেকচারে তিনি সিলেটের এই পল্লীকবির উল্লেখ করেছিলেন।

বাইশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ আমাদের এই শ্রীহট্ট সহরে শুভাগমন করে আমাদের কৃতার্থ করেছিলেন। কিন্তু, সিলেটকে তিনি ভোলেননি। শ্রীহট্ট প্রবাসের আনন্দময় স্মৃতি দীর্ঘকালান্তরে তাঁর মনে উজ্জ্বল হ'য়েই ছিল। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত আমাদের জানিয়েছেন যে, সিলেটের মহিলারা যে ললাটে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে কবি-বরণ করেছিলেন সে-সম্বন্ধে কবির সঙ্গে বহুবার তাঁর আলাপ হয়েছে। এই অনুষ্ঠানটি নাকি তাঁহার খুব ভালো লেগেছিল। তাতে যে আন্তরিকতার স্পর্শ ছিল এবং সমগ্র পরিকল্পনাটিতে যে সহজ ও শোভন রুচিজ্ঞানের পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন তা নাকি তাকে মুগ্ধ করেছিল। আজ এ কথা স্মরণ করে আমরা আনন্দমিশ্রিত গর্ব অনুভব করছি।

রবীন্দ্রনাথ ও পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব

শ্রীরাধানন্দ ভট্টাচার্য্য

পরলোকগত পিতৃদেব শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয়ের সঙ্গে অমরকবি রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু লিখবার জন্যে 'বাণীচক্রে'র বন্ধুগণ আমায় অনুরোধ করেছেন। পিতার মুখে মহর্ষিদেব, রবীন্দ্রনাথ এবং ঠাকুর-পরিবার সম্বন্ধে কত কথাই না শুনেছি। কিন্তু, সেগুলো তখন লিখে রাখিনি বলে আজ আপশোষের আর অন্ত নেই। রবীন্দ্রনাথের কথা ভাবতেই আমার সর্বাগ্রে মনে পড়ে একটি দিনের স্মৃতি। একদিন রথীদার‡ ঘরে বসে আছি হঠাৎ দোতালার বারান্দা থেকে মধুরকণ্ঠের আহ্বানধ্বনি কানে ভেসে এল,

---

* রবীন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যা প্রবাসীতে এঁর নিকট লেখা রবীন্দ্রনাথের দু'খানা চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখছেন—"এবার রক্তকরবী অভিনয় করা স্থির। নন্দিনীর ভূমিকা নেবার উপযুক্ত আমি কাউকে দেখছিনে।" তুমি যদি এই দায় নিতে রাজি হও তা হলে অভিনয় সম্ভব হবে, নইলে হবে কি না সন্দেহ।

† এই প্রবন্ধের কোনো কোনো তথ্য ১৯২৯ ইংরাজীর শ্রীহট্ট 'মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিনে' প্রকাশিত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার পাল চৌধুরী মহাশয়ের 'শ্রীহট্টে রবীন্দ্রনাথ' নামক প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত।

‡ শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তাকিয়ে দেখি সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছেন কি-একটা বাদ্যযন্ত্র হাতে দেবর্ষির মত জ্যোতির্ময়কান্তি ঋষি-কবি। বোধকরি যন্ত্রটা সারাবার জন্যেই রথীদার ডাক পড়েছিল।

বাবা মহাশয়ের বয়স যখন সতেরো বৎসর মাত্র তখন এক সাহিত্য সভায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন সাতাশ বৎসরের যুবক।

সেদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে পিতৃদেবের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল। কিন্তু, জনতার ভিড়ে সুবিধে হোলো না। দিনকতক পরে করে দেখা হওয়া সম্ভব তা জানতে চেয়ে বাবা কবিকে পত্র লিখলেন, কিন্তু সে চিঠির জবাব এলো না। বাবার নিকেট শুনেছি যে, তাতে তাঁর মনে খুব লেগেছিল।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাবার প্রথম পরিচয়ের কাহিনী তাঁর কাছে যেমনটি শুনেছি, তাই বলছি।

পূর্বোক্ত ঘটনার সাত বছর পরের কথা। সেদিন ঠাকুর-পরিবারের কোনো এক আত্মীয়-ভবনে, খুব সম্ভব জ্যোতিপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে বিবাহ-উৎসব। স্থির হয়েছিল যে, সত্যব্রত সামশ্রী মহাশয় সামগান করবেন। বিবাহ বাসরে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত। অকস্মাৎ এক ব্রাহ্মণ যুবক এসে বললেন যে, অধ্যাপক সামশ্রী মহাশয় তাঁকে পাঠিয়েছেন সামগান করবার জন্যে, অসুস্থতা-নিবন্ধন তিনি নিজে আসতে পারবেন না। পিতৃদেব ছিলেন তখন অখ্যাত, অজ্ঞাত সুতরাং প্রথম ত তাঁকে কেউ আমলই দিতে চান না। শেষে যখন বোঝা গেল যে, সামশ্রী মহাশয় একান্তই আসবেন না তখন অগত্যা পিতৃদেবকেই সামগান গাইতে হ'ল। সমবেত জনমণ্ডলী তাঁর সে মধুর সামগান শুনে মুগ্ধ হলেন। তাঁর সুললিত কণ্ঠোচ্চারিত বেদমন্ত্রগানে রবীন্দ্রনাথ নাকি মুগ্ধ হয়েছিলেন। বাবা বলতেন যে, ঐ দিনটিই তাঁর জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয়।

সে-রাত্রেই রবীন্দ্রনাথ এক রকম জোর করেই পিতৃদেবকে নিয়ে গেলেন মহর্ষির কাছে। রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন, পিতার বেদগান মহর্ষির বিশ্রামের ব্যাঘাত জন্মাবে না বরং তাঁকে আনন্দ দানই করবে।

মহর্ষির সুমুখে পিতৃদেব আবার গাইলেন বেদ-গাথা। মহর্ষি মুগ্ধ হয়ে পরদিন তাঁকে আবার আসবার জন্যে বারবার করে বলে দিলেন। তার পর থেকেই তিনি মহর্ষির সভা-পণ্ডিত নিযুক্ত হলেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বাবার মুখে শোনা গল্পের মধ্যে যে গুলো স্পষ্ট ক'রে মনে আছে সে-গুলো বলছি। রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভা এবং সাহিত্যিক জীবন আমাদের কল্পনাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে আছে যে, তাঁরও যে একটা পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ছি।, মানুষের সঙ্গে যে তাঁর প্রাত্যাহিক প্রীতির সম্পর্ক ছিল, তিনিও যে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ[illegible]ন, পরের দুঃখের কাহিনী শুনলে করুণায় বিগলিত হতেন, সে কথা আমরা ভাবতেই পারিনা।

যাক্ সে কথা। বাবার দাঁড়ি সম্বন্ধে কবির রসিকতা পূর্ণ একটি চিঠির কথা মনে আছে। কবির আগ্রহাতিশয্যেই পিতৃদেবকে দাঁড়ি রাখতে হয়েছিল। পাশাপাশি উপবিষ্ট অবস্থায় তোলা কবি ও পিতৃদেবের একটি ছবি ছোটবেলায় বাড়ীতে দেখেছি, দু'জনের কোলে দুটি শিশু, বোধ করি রথীদা ও বেলা দেবী। দাঁড়ি, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং বোধকরি কতকটা ফটোগ্রাফির কেরামতিতে সে-ছবিতে দু'জনের চেহারায় বিশেষ পার্থক্য বুঝবার জো ছিলনা। দেশের বাড়ীতে থেকে যখন স্কুলে পড়তাম তখন বাবার নিকট মাঝে মাঝে কবির চিঠি আসত। একটি সরস চিঠির কথা বেশ মনে আছে। তাতে ছিল পিতৃদেবের

দাঁড়িলোপের জন্য দীর্ঘবিলাপ এবং অবিলম্বে আবার দাঁড়িধারী হবার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ। মনে পড়ে সর্বশেষ লাইনটি ছিল— "দাঁড়ির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।"

রবীন্দ্রনাথের সন্তানদের সংস্কৃত শেখাবার ভার ছিল পিতৃদেবের উপর।* রথীদার উপনয়নে আচার্যের কাজ তাঁকেই করতে হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন তখন মহর্ষির অনুমতিক্রমে পিতৃদেবকে সেখানে নিয়ে গেলেন।† শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় তখন রবীন্দ্রনাথের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হ'য়ে উঠেছিল। কবি বলতেন— "শান্তিনিকেতন আমাকে পেয়ে বসেছে বিদ্যার্ণব মশায়, ষ্টেট্ থেকে আরো টাকা না পেলে আমার সব সঙ্কল্প মাটী হবে।" এ নিয়ে পিতৃদেবকে মাঝে মাঝে মহর্ষির নিকট যেতে হ'ত।

রবীন্দ্রনাথ ও পিতৃদেবের মধ্যে ছিল গভীর সখ্য। পরস্পরের সাময়িক বিচ্ছেদ তাঁদের উভয়ের মনেই বেদনার সঞ্চার করত।

শিলাইদহে পিতৃদেব একবার জ্বরে শয্যাগত হ'য়ে পড়েন। রবীন্দ্রনাথের যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্র খুব ভালো ক'রেই পড়া ছিল, সে কথা সকলেই জানেন। তিনি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দ্বারা নিজেই চিকিৎসা সুরু করেন। সারারাত বাবার শিয়রে জেগে বসে তিনি তাঁর সেবাশুশ্রূষা করতেন।

শ্রীহট্টগৌরব রাজা গিরীশচন্দ্রের চেষ্টায় পিতৃদেবের মহামহোপাধ্যায় উপাধি পাওয়া যখন এক-প্রকার স্থির হোলো তখন তাঁকে দেখলেই কবি কৌতুক করে "মহামহোপদ্রব" বলে ডাকতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। বাবাও শেষ পর্য্যন্ত উপাধি নিতে রাজি হলেন না। রাজা গিরীশচন্দ্র বাবাকে উপাধি নিতে সম্মত করাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু শেষে ব্যর্থকাম হয়ে ঠাকুরদা মহাশয়কে লিখে জানান যে, বাবার মতিগতি দেখে মনে হচ্ছে তিনি অচিরেই ব্রাহ্ম-ধর্ম গ্রহণ করবেন। রাজা পিতৃদেবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাই ছিলেন, তাই তাঁর কল্যাণ হবে ভেবেই তিনি একাজ করেছিলেন। রাজার পত্র পেয়ে ঠাকুরদা অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে পড়লেন এবং এ কাহিনীর সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করবার জন্যে নৌকাযোগে কলকাতা যাত্রা করলেন।

কলকাতা পৌঁছে একদিন নিজেই খোঁজ করে ঠাকুর বাড়ীতে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন দোতালার বারান্দায় অন্যমনস্কভাবে পায়চারি করছিলেন। হঠাৎ দেখিলেন দূরে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল

---

* ১৩০৮ সালের মাঝামাঝি সময় হইতে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শান্তিনিকেতনে বসবাস করেন। * * *

এইখানে আসিবার পূর্বে ১৩০৭ সালে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা বা বেলার বিবাহ হয়। * * * বিবাহের পর রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শান্তিনিকেতনে আসেন ও দ্বিতল গৃহে বাস করিতে থাকেন, ইতিমধ্যে 'নূতন বাড়ি'র পত্তন হইল। ইতিপূর্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথের শিক্ষার জন্য শিবধন বিদ্যার্ণব, জগদানন্দ রায় ও লরেন্স নামে এক সাহেব নিযুক্ত হইয়াছিলেন।—রবীন্দ্র-জীবনী (১ম খণ্ড) ৭৭৫—৭৬ পৃঃ। (শনিবারের চিঠি কার্ত্তিক ১৩৪৮ হইতে উদ্ধৃত)—সম্পাদক, কঃ প্রঃ

† ১৯০১ সালের ২২শে ডিসেম্বর, ১৩০৭ সালের ৭ই পৌষ সেই জমিদারী পরিদর্শনের কাজ হইতে অবসর পাইয়া রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বোলপুর ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার মূলে ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা * * * মহর্ষি মাসিক দুই শত টাকা ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ করিয়া দেন।

শান্তিনিকেতনে (প্রথম) রবীন্দ্রনাথ নিজ আত্মীয়স্বজনের কয়েকটি বালককে শিক্ষা দিবার জন্য প্রচলিত করেন। প্রথম শিক্ষকদলের মধ্যে ছিলেন জগদানন্দ রায়, লরেন্স সাহেব, রেওচাঁদ সিদ্ধি এবং পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব। পরে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন।

রবীন্দ্রনাথের কথা— শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ, বঙ্গলক্ষ্মী— আশ্বিন, ১৩৪৮

গৌরকান্তি, দীর্ঘকায়, নগ্নপদ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। হাতে তাঁর বাঁশের ছাতা, পরনে মোটা থানের ধুতি, রবীন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি ত্বরিতপদে নীচে নেমে এলেন এবং ঠাকুরদার মুখে তার পরিচয় পেয়ে বললেন—"বিদ্যার্ণবমশায় বাবামশায়ের ঘরে আছেন—আপনি আসুন" বাবা তখন মহর্ষিদেবের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় রত। রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির কানের কাছে মুখ নিয়ে কি বললেন। মহর্ষিদেব তখন ওঠে দাঁড়ালেন এবং ঠাকুরদামশায়কে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করলেন। খানিকক্ষণ দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা হোলো, তারপর ঠাকুরদামশায় মহর্ষির নিকট বিদায় নিয়ে চলে এলেন।

তারপর আরো কয়েকদিন তিনি মহর্ষির সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন এবং মহর্ষির মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে পিতৃদেব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'য়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। বাবা ঠাকুরদামশায়ের মত দীর্ঘকায় ছিলেন না বলে রবীন্দ্রনাথ নাকি খুব দুঃখ করতেন। রবীন্দ্রনাথের রঙ্গরসিকতার কথা বলতে গিয়ে বাবা একবার গল্প করেন যে, আমার বয়স যখন মাত্র দশ মাস তখন নাকি তিনি একটি মোহর দিয়ে আমায় আশীর্বাদ করে বলেন — "ছেলের পদগৌরব দেখছি আমার মতই হবে।" দশ মাসের শিশুর পক্ষে একটু বেমানান রকমের বড় আমার পদযুগলই নাকি তাঁর এ সরস উক্তির হেতু।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বাবার নিকট শোনা এবং আমার ব্যক্তিগত স্মৃতিমূলক যে-সমস্ত কাহিনী মনে আছে তারি দু'চারটি বর্ণনা করলাম।

প্রায় একযুগ রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে থেকে পিতৃদেব অবশেষে ঠাকুর্দা মশায়ের আদেশে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। কিন্তু দেশে ফিরে আসবার পরও পিতৃদেবের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর ছিন্ন হয়নি। দু'জনের মধ্যে প্রায়ই পত্র-বিনিময় চলত। পরবর্তী জীবনে যখনি বাবার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে তখনি নাকি প্রথম যৌবনের সেই আনন্দপূর্ণ দিনগুলোর কথা নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হ'ত।

পিতৃদেবের মৃত্যুর পর অসুস্থ অবস্থায়ও আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে গুরুদেব পত্র লেখেন।* পিতৃদেবের পরলোকগমনের পর শান্তিনিকেতনে যে শোক-সভা হয় তাতে রবীন্দ্রনাথ মর্মস্পর্শী ভাষায় তার স্মৃতি-তর্পণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সংশ্রব ছেড়ে আসবার পর পিতৃদেব প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে শান্তিনিকেতন এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আত্মিকযোগ ছিন্ন হয়নি। আজ মৃত্যুর পরপারে এই দুই সুহৃদ হয়ত আবার দীর্ঘ বিচ্ছেদের অবসানে পুনর্মিলিত হয়েছেন।

---

* চিঠিখানা 'কবি-প্রণামে' প্রকাশিত হয়েছে।—সম্পাদক, কবি প্রণাম।

বাঙ্গালীর সাধনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ আপনাদের কাছ থেকে এই যে অভ্যর্থনা লাভ করলেম সে জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাচ্চি। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি কথা না বলে থাকতে পারিনে যে, উচ্চমঞ্চে স্বতন্ত্র হয়ে বসে জনসঙ্ঘের কাছে নিজের যশোগান স্থির হয়ে শোনা বড় কঠিন পরীক্ষা। এই পরীক্ষার হাত হতে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা অনেকবার অনেক স্থলে করেছি, সে চেষ্টা অনেকবারই নিষ্ফল হয়েচে। আজও আপনাদের এই অভ্যর্থনা অগ্রাহ্য করতে পারলেম না। যে অর্ঘ্য অনেক লোকের দান, একজনের পক্ষে তা বহন করা দুষ্কর, তেমনি তা প্রত্যাখ্যান করাও দুঃসাধ্য। অনেকের পক্ষে এরূপ সম্মান-লাভ দৈবক্রমে ঘটে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সম্মান স্থায়ী হয় না। প্রবল বন্যার মতই প্রবল খ্যাতি প্রায়ই ক্ষণিক, ইতিহাসে তার বিস্তর প্রমাণ আছে। আমার ভাগ্যেই যে তার অন্যথা হবে অন্তত এমন কথা আশা করবার সময় এখনো হয় নি। তা হোক্, তবু দেশবাসীর প্রীতি উদ্বোধিত করবার একটা গৌরব আছে। সে গৌরব যা পেলুম তার মূল্য নিয়ে নয়, যার কাছ থেকে পেলুম তারই মূল্য নিয়ে। তাই তাতে গর্ব্বের উদ্রেক করে না, হৃদয়কে নম্রতায় অভিষিক্ত করে। এইটুকু মনে করেই আপনাদের হাত হতে সম্মান আমি নম্রচিত্তে গ্রহণ করব।

আমার এ সম্মান মজুরীর জন্য নয়, মজুরী হিসাবে এর কোন দরকার নেই। আপনারা যা দিলেন এটা হয় ত আমার প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু মা যা সন্তানকে দেন সে তাঁর নিজের উদ্বেল হৃদয়কে চরিতার্থ করবার জন্যে, সন্তানের পাওনা মেটাবার জন্যে নয়। আজ আমি যা পাচ্চি সে আমার দেশমাতার দান। দেশ তাঁর এই প্রীতি দেবার উপলক্ষ্য খুঁজে বেড়ান, কেন না তাতে তাঁর নিজেরই পরিপূর্ণ হৃদয়ের পরিতৃপ্তি হয়।

তাই বলচি, আজ এই সভাতে আপনাদের সঙ্গে আমার এই যে যোগ হল সে কেবলমাত্র সাহিত্যের যশ নিয়ে নয়। এর ভিতরে একটি গূঢ় কথা আছে যা খ্যাতির চেয়ে অনে বড়। সে কথাটি এই যে বাংলাদেশের লোক আপনার মধ্যে একটি শক্তির জাগরণ অনুভব করচে।

সেই শক্তিকে সে বাইরে মূর্ত্তিমতী করে দেখতে চায়। এই দেখার যে আনন্দ, সে কেবল আপনাকেই উপলব্ধি করবার আনন্দ। যখনি যে-কোনো আকারে বাঙালী আপনার সেই প্রকাশ বাইরে অনুভব করে তখনি তার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। আমি যদি তার সেই উপলব্ধির উপলক্ষ্য হয়ে থাকি তবে সে আমার সৌভাগ্যের কথা। ভূগর্ভে যে জলধারা নিরন্তর প্রবাহিত হয়, মাটির নিম্নদেশে তার কোনো এক ক্ষীণস্তরের ছিদ্রপথে সে উৎস-আকারে উৎসারিত হয়ে ওঠে, কিন্তু সে ধারা ত ভূগর্ভেরই, সে ত সমস্ত পৃথিবীর অন্তরের রসধারা। তেমনি মানবচিত্তের রসপ্রবাহ বিশেষ কোনো একটা স্থান হতে উৎসারিত হতে পারে, কিন্তু সে রস সমস্ত দেশের। তাই সমস্ত দেশ নিজেরই রুদ্ধ সত্তাকে উন্মুক্ত দেখে নিজে আনন্দিত হয়। আপনারা যদি আমার কথাকে আপনাদেরই সকলের কথা বলে মনে করে নিয়ে থাকেন তা হলে আমাকে অভিনন্দন করা আপনাদের সকলের সম্মিলিত রূপকেই অভিনন্দন করা।

আপনারা আমার সম্বন্ধে যা মনে করছেন তা যদি সম্পূর্ণ অমূলক না হয় তার চেয়ে গৌরবের কথা আমার কি হতে পারে? আর যদি আপনারা ভুলই করে থাকেন, তাতেই বা ক্ষতি কি? নব উদ্বোধনের চাঞ্চল্য এমন সব ভুল ঘটেই থাকে। কিন্তু সেই ভুলের ক্ষতির চেয়ে উদ্বোধনের লাভটাই বড়। বড় যজ্ঞে বেহিসাবী খরচ হয়ে থাকে। বসন্ত কালে যখন দখিন-হাওয়া দেয় তখন গাছে পালায় হিসাবের ঠিক থাকে না, তখন যে মুকুল ঝরে পড়বে সে মুকুলও মলয়সমীরণের দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হয় না। দেশময় সেই বসন্তের হাওয়া দিয়েচে, তাই সমাদরের হিসাবে পদে পদে ভুলচুক হবারই কথা। আবার একদা কার্পণ্যের দিন আসবে, তখন সমস্ত ভুল সংশোধন হতেই বা কতক্ষণ?

আমি এটা অনুভব করি যে, ভারতে বাঙালীর একটি বিশেষ সাধনা আছে। নব্যবঙ্গের আরম্ভকাল থেকেই তার একটি অপরূপ নব্যতা দেখা দিয়েচে। এই নূতন বাংলার সকল মহাপুরুষই নূতনকে অভ্যর্থনা করে নিতে ভয় পাননি। এই নূতন আশার, এই নূতন প্রাণের প্রবল সঞ্চার এদেশের সাহিত্যে সমাজে শিক্ষায় দীক্ষায় প্রবেশ করেচে। যে মানুষ পুরাতনকেই একান্ত আঁকড়ে থাকে সে নিজেকে অবিশ্বাস করে। যে নিজেকে অবিশ্বাস করে, সে আপন চিত্তক্ষেত্রে ভালো করে চাষ দেয় না, পুরো ফসল ফলায় না। বাঙালী আপনাকে বিশ্বাস করেচে, সে আপন ফসল ফলাচ্চে। তাই তার প্রতি ভারতের অন্য জাতিরও বিশ্বাস জন্মাচ্চে। বাঙালীর কাছ থেকে তারা কিছু পাবে একথা তারা স্বীকার করে।

কিন্তু বাঙালীর এই যে আত্মশক্তির উপলব্ধি এটা অহঙ্কার করবার জন্যে নয়, অন্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করবার জন্যে নয়। এর মস্ত একটা দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্বের ভারেই এ'কে যেন নম্র করে।

সেই শক্তিই শ্রেষ্ঠ শক্তি যে শক্তি থেকে সৃষ্টি হয়। যে শক্তি কেবল আপনার দিকেই টানে, আপনার দিকেই ছাড়ে সে ভাঙনের শক্তি, বিরোধ বিবাদ তার ফল। আর যে শক্তি সৃষ্টি করে, সে আপনাকেই দান করে। সৃষ্টি শব্দের ধাতুগত অর্থই আপনাকে দেওয়া, আত্মোৎসর্জ্জন। ঈশ্বরের যে শক্তি সৃষ্টিতে প্রকাশ পাচ্চে, সে কাঙালকে একমুঠো চাল দেওয়ার শক্তির মত নয়। জানলা থেকে ফেলে দেওয়া পয়সার মত তাঁর দান যদি উপর থেকে আমাদের উপর এসে পড়ত সে আমরা সহ্য করতে পারতেম না। কিন্তু আনন্দময় পুরুষ আনন্দে সৃষ্টির মধ্যে নিজেকেই দিয়েছেন। তিনি সৃষ্টি করে সৃষ্টকে আলাদা করে দিচ্চেন না। তার মধ্যে আপনাকেই প্রকাশ করচেন। এই জন্যে তাঁর সৃষ্টি সেই সৃষ্টিকর্ত্তার গৌরবেই মহিমান্বিত। এইজন্যে এই বিপুল বিশ্বে আমরা অতি ছোট হয়েও মাথা হেট করে নেই। যে-সকল শক্তি সৃষ্টির উপকরণ, তাদের যখন সৃষ্টিকর্ত্তার আনন্দময় শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখি তখন দেখতে পাই তারা ভয়ঙ্কর, তারা পরস্পর বিরোধী, তাদের মধ্যে শান্তি নেই, সৌন্দর্য্য নেই, নম্রতা নেই।

সে-দিন একজন বৈজ্ঞানিক বলেচেন একমুঠো ধূলোর মধ্যে এমন শক্তি বাঁধা পড়ে আছে যে ছাড়া পেলেই লণ্ডনের সেন্টপলের গির্জ্জাকে স্কটলণ্ডের পাহাড়ের উপর চড়িয়ে দিতে পারে। প্রকৃতির পরস্পর-বিরুদ্ধ প্রচণ্ডশক্তির মধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তা যেই আপন আনন্দকে স্পর্শ করালেন অমনি সর্ব্বদাহকারী তেজ এক মুহূর্ত্তে জল হয়ে গেল। যারা বিরুদ্ধ তাদেরই মধ্যে যোগ, তাদেরই মধ্যে সামঞ্জস্য, সেই ত সৃষ্টিকর্ত্তার আত্মদানের ঐক্য। নতুবা এই যে মাটিতে নিঃসংশয়ে বসে আছি, সে আমাদের উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত করে দিত।

তেমনি বাঙালীর শক্তি যদি সৃষ্টিশক্তি, যদি আত্মোৎসর্জ্জনের শক্তিই হয়, তা হলেই নানা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন জাতির উগ্রবিরোধের সমাধান করে এক বিরাট সত্তাকে সে গড়ে তুলতে পারবে।

এই যে এ জিলায় হিন্দুমুসলমান পাশাপাশি বাস করচে এরা বাঙালী জাতিরচনার বিচ্ছিন্ন উপকরণ ভাবে পরস্পরের বিরুদ্ধ। সেই বিচ্ছেদ যতদিন থাকবে অর্থাৎ যতদিন তাদের মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্বের অভাব থাকবে ততদিন তারা পরস্পরকে আঘাত করবে। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অহঙ্কারকে উগ্র করে তুলে, পার্থক্যকে সর্ব্বতোভাবে দুর্লঙ্ঘ্য করে দিয়ে এই বিচিত্র শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধতার সমাধান হবে না। কেবলমাত্র আত্মত্যাগের যে নম্রতা, যে আনন্দ তার দ্বারাই এই মহৎ সাধনা সফল হতে পারে। বাঙালীর মধ্যে, আত্মাভিমান নয়, কিন্তু আত্মোৎসর্গের সেই শক্তি যদি থাকে তবেই বাঙালী ভিন্ন ভিন্ন বিরুদ্ধ উপকরণ নিয়ে আপনাকেই বড় করে সৃষ্টি করতে পারবে। আমরা তখনি দেবতার বর পাই যখনি দেবতার মত হতে পারি, নইলে দৈত্যের প্রলয়লীলা কিছুতে ঠেকানো যেতে পারে না।

আমাদের দেশে জাপান ও ইংলণ্ডের মত জাতিগত সহজ ঐক্য নেই। এখানে ভাষার ধর্ম্মের আচারের বৈচিত্র্য এবং বিরোধ রয়েচে। যে দেশে আত্মীয়তার ঐক্য আছেই সে দেশে স্বার্থের বন্ধন একটা অতিরিক্ত ব্যাপার। যারা সহোদর ভাই তারা ভাই বলেই এক, তার উপরে তারা যদি একই ব্যবসায়ে কোমর বাঁধে তা হলে তাদের এমন পাকা নিয়ম করতে হয় যাতে স্বার্থের সামঞ্জস্যদ্বারাও তারা প্রবল হতে পারে। স্বাজাত্যের সহজ ঐক্যের উপরেও যারা আর-একটা আর্থিক ঐক্য মিলিয়ে দেয়, তারা এতে করে ধর্ম্মের সঙ্গে অর্থের যোগ করে। ভারতে আমাদের জনসমূহের মধ্যে আত্মীয়তার সেই ধর্ম্ম নেই যে-ধর্ম্ম মূলে সকলকে এক করে দেয়। সুতরাং স্বার্থের বন্ধনে এদের বাঁধবার চেষ্টা করা জল দিয়ে বালির পিণ্ড বাঁধবার চেষ্টার মত। এই আত্মীয়তার ধর্ম্মকে স্থাপন করবার একমাত্র উপায় আত্মাকে দেওয়া। আত্মাই আপন আনন্দে আপন প্রেমে সমস্ত বিভিন্নতা ও বিচ্ছেদকে অতিক্রম করে। বস্তুত সমস্ত বিচ্ছেদকে অতিক্রম করার দ্বারাই আত্মা আপনাকে প্রমাণ করে।) বিভেদ যেখানে বিভেদ-রূপেই রয়ে গেছে বোঝা যায় আত্মা সেখানে আপন সিংহাসন গ্রহণ করে নি। সেখানে বাহ্য আচার ও ব্যবস্থার জড়যন্ত্রের কাজ চলতে পারে, কিন্তু সেখানে চৈতন্যময় জ্ঞানময় আনন্দময় সৃষ্টির কাজ চলবে না।

আমাদের দেশকে আমরা যদি মাতৃভূমি বলেই মানি তা হলে সর্ব্বত্র মাতাকে উপলব্ধি করা ত চাই। সেই মাতা পলিটিক্সে নেই, বাণিজ্যে নেই, তিনি আছেন সেই জাগ্রত প্রেমে যে প্রেম আত্মদানের দ্বারাই আপনাকে সার্থক করে, যে-প্রেম সুযোগ-সুবিধার হিসাব করে না, যে-প্রেম ভেদ-পার্থক্যকে একান্ত করে দেখে না।

প্রত্যেক দেশের সামনে এক-একটি প্রশ্ন আছে। সেই প্রশ্নটির উত্তর যে-দেশ ঠিকমত দিতে পারচে সেই দেশই উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হচ্চে। যারা পারচে না, তারা হয় একই শ্রেণীতে আটকা পড়ে আছে, নয় তারা নেমে যাচ্চে। কিন্তু মনে রাখতে হবে সকল দেশের একই প্রশ্ন নয়, অতএব সামনের বেঞ্চিতে যে ছেলে বসে আছে তার পরীক্ষার কাগজ নকল করে পাস হবার কোনো আশা নেই। ইংলণ্ড যে উত্তর দিয়ে পরীক্ষা পাস করচে, আমরা মনে করি সেই উত্তরে আমরাও পাস হব। কিন্তু পরীক্ষাকর্ত্তা ত ইংলণ্ড নন, ইংলণ্ডের হাততালি নিয়ে ত আমরা উদ্ধার পাব না। ফাঁকি দিয়ে বাহবা পেতে পারি, কিন্তু ফল পেতে পারি নে। আসল পরীক্ষকের কাছে ধরা পড়তে দেরি হবে না।

জাতিধর্ম্মভাষার নানা বৈচিত্র্য নিয়েও কেমন করে দেশ এক হতে পারে ভারতের সামনে এই প্রশ্নই রয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার যুগব্যাপী প্রণালীই হচ্চে আমাদের ইতিহাস।

ভারতের যে-সব মহাপুরুষ এর উত্তর দেবার সাধনা করেচেন তাঁরা বড় সেনাপতি না, বড় রাষ্ট্রনীতিক বা বড় বাণিজ্যবীরও না। তাঁরা ভক্ত তাঁরা তপস্বী, তাঁরা সকল ভেদের মূলে গিয়ে অভেদকে দেখেচেন, তাঁরা জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলকে অধ্যাত্মধামে প্রেমের যজ্ঞে আহ্বান করেচেন। ভারতের পরীক্ষায় এই যে উত্তরটি তাঁরা ধ্যান করে পেয়েচেন এই উত্তরটিকে আমাদের সমাজের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রমাণ কর্‌তে পার্‌লে তবেই আমরা উত্তীর্ণ হব।

অনেকে বলেন ব্যবসাবাণিজ্যের মিলনে কিম্বা রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে আমাদের দেশে একতা ঘট্‌বে। বস্তুতঃ বিষয়বুদ্ধির দ্বারা যে মিলন ঘটে সে ক্ষণস্থায়ী। মিলনের দর্‌কার চলে গেলেই সম্বন্ধ ছুটে যায়।

আজ জাপানী ইংরেজে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব, আর এক সময়ে এই দুই জাতের মধ্যে ঘোর শত্রুতা হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। য়ুরোপের ইতিহাসে এই রকম গরজের বন্ধুত্ব একবার গড়্‌চে, একবার ভাঙ্‌চে এ ত বারম্বার দেখা গেছে।

তাই আর একবার আমাকে বল্‌তে হবে—সকলে মিলে আমরা পাব সেই হিসাবের উপর আমাদের পাকা মিলন হবে না। পরস্পর পরস্পরের জন্যে দেব এই বেহিসাবী প্রেমের সম্বন্ধেই আমরা মিল্‌তে পারব।

যতদিন দেশের অভাব দূর করবার জন্য প্রধানত বিদেশী গবর্ণমেণ্টের দিকে করুণ দৃষ্টিতে বা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাক্‌ব ততদিন আমাদের সেই দেওয়ার চর্চ্চাটা বন্ধ থাক্‌বে যে-দেওয়ার দ্বারা জাতির সৃষ্টি হয়। বিদেশী গবর্ণমেণ্ট যা তৈরি কর্‌তে পারে তা কলের জিনিষ, তাতে ব্যবস্থামাত্র তৈরি হয়। কিন্তু জাতি প্রাণবান পদার্থ—তাকে মানুষ কর্‌তে গেলে প্রেম চাই। বহু উপকরণের চেয়েও অল্প প্রেম বড়।

আমাদের ছেলেরা ইতিহাসের পাতায় এটা পড়েচে যে, সকল বড়জাতিরই মহিমা বড় বড় ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীর জ্ঞানবীরের আত্মসর্জ্জনের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সেই আত্মসর্জ্জনের চেহারা নিজের দেশে চারিদিকে প্রতিদিন তারা যদি না দেখে তা হলে তাদের ইতিহাস পড়া ব্যর্থ হবে। তা হলে তারা এই ভুল কর্‌বে, অন্যদেশে মানুষ যেটা আপনাকে দিয়ে পেয়েচে সেটা বুঝি চেয়ে পাওয়া যায়। অন্যদেশের ফলটাকে উজ্জ্বল করে দেখ্‌তে পাচ্চি বলেই আমরা মনে কর্‌ব ফলটা বুঝি ঝুড়ির মধ্যেই মেলে, গাছের দর্‌কার নেই।

কিন্তু বড় জাতির ইতিহাস আমাদের ছেলেদের সত্য করে দেখাতে গেলে, আর কিছুই নয়, ছোট বড় সকল বিষয়েই দেওয়ার চেহারাটা নিয়ত দেখানো চাই। যেখানে দুঃখদারিদ্র্য সেখানে দেশকে দিচ্চি, যেখানে রোগ তাপ সেখানে দেশকে দিচ্চি, যেখানে অজ্ঞান সেখানে দেশকে দিচ্চি, যেখানে অন্যায় সেখানে দেশকে দিচ্চি। এই দেওয়ার রূপকে সত্য করে তুল্‌তে পার্‌লেই নিরক্ষর যে তারও বুদ্ধিতে ঠেক্‌বে দেশ কি, পাষাণহৃদয় যে তারও হৃদয়ে বাজ্‌বে দেশ কি। যেমন সূর্য্যের আলো দেশের ছোট বড় সকল লোকেরই উপর সমান ভাবে পড়চে, যেমন নদীর ধারা দেশের উচ্চনীচ সকলের তৃষ্ণা দূর করচে এবং যেমন এমনি করেই প্রকৃতির এক দানযজ্ঞে একদেশের সকলকে বাহিরের দিকে মিলিয়ে দিচ্চে তেমনি মানুষের আত্মদানও যখন দেশের দূর নিকট ছোট বড় সকলেরই এক আত্মীয়তার যজ্ঞে নিরন্তর আহ্বান কর্‌তে থাক্‌বে তখনই সকল ভেদ এক অভেদকে প্রমাণ করবে এবং স্বাতন্ত্র্য বিরুদ্ধতার কারণ হয়ে উঠ্‌বে না।

তখনি আমাদের জাতি সৃষ্টির প্রভূত উপকরণস্তূপ আপন বিশ্লিষ্টতা ত্যাগ করে' অপরূপ মহিমার বৈচিত্র্য-মণ্ডিত ঐক্যকে ভারতভাগ্যদেবতার মন্দিরচূড়ারূপে অভ্রভেদী করে তুলবে।*
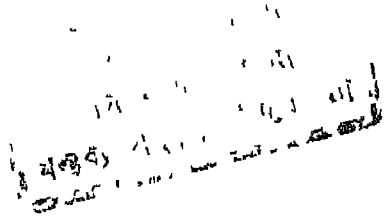
"যূথিকা,

এসেছিলে জীবনের আনন্দদূতিকা,
সহসা তোমারে যবে করিল হরণ
নির্মম মরণ
পারেনি করিতে তবু চুরি
তরুণ প্রাণের তব করুণ মাধুরী,
আজো রেখে গেছে তার চরম সৌরভ
চিত্তলোকে স্মৃতির গৌরব।"†

---

* ১৯১৯ ইংরাজীর ৬ই নভেম্বর তারিখে (১৩২৬ বাংলা, ২০শে কার্ত্তিক) শ্রীহট্ট শহরের টাউনহলের প্রাঙ্গণে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা। বক্তৃতাটি অনুলিখন করেছিলেন শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এবং শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরী।

†১৩৪৪ পৌষে, রায়বাহাদুর হেমচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কন্যার স্মরণে লিখিত। অনার্স সহ বি, এ, উপাধি গ্রহণ করিয়া শান্তিনিকেতনে এম, এ অধ্যয়নকালে যূথিকার মৃত্যু হয়।

—সম্পাদক, কবি প্রণাম।

শ্রীহট্টে রবীন্দ্রনাথ (১৩২৬ বাংলা, ২০শে কার্ত্তিক)

পরলোকগত গোবিন্দনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের বাসভবনে প্রতিমাদেবী ও রথীন্দ্রনাথ সহ রবীন্দ্রনাথ।

[শ্রীযুক্তা মালতী সিংহ মজুমদারের সৌজন্যে।
ছবিটি ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নি।

আকাঙ্ক্ষা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই যে ছাত্রেরা এখানে আমাকে আহ্বান করেছে এটা আমার আনন্দের কথা। ছাত্রদের মধ্যে আমার আসন আমি সহজে গ্রহণ করতে পারি। সে কিন্তু গুরুরূপে নয়, তাদের কাছে এসে, তাদের মধ্যে বসে।

কিন্তু আমার বিপদ এই যে, হঠাৎ আমাকে বাইরে থেকে বৃদ্ধ বলে ভ্রম হয়, তাই যাদের বয়স অল্প তারা যখন আমাকে ডাকে, কাছে ডাকে না, আমার জন্যে তফাতে উচ্চ করে মঞ্চ বাঁধে। এই বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্যেই লোকালয়ের বাইরে আমি একটা জায়গা করেছি সেখানে ছেলেদের আমিই কাছে ডেকেচি। সে কেবল ছেলেদের উপকারের জন্যে নয়, আমার নিজের উপকারের জন্যে। উপকারটা কি একটু বুঝিয়ে বলি।

মানুষের মনে অহঙ্কার পদার্থ প্রবল। সেইজন্যে যখন তার বয়স বাড়ে তখন সে মনে করে সেই বয়স বাড়ার মধ্যেই বুঝি তার অহঙ্কার করবার কারণ আছে। বিশেষতঃ তখন যদি সে বুড়োদেরই সঙ্গ ধরে থাকে তাহলে তার সেই অহঙ্কারটা আরো বেড়ে ওঠে। তখন সে একটা মস্ত কথা ভুলে যায় যে যেটাকে সে বড়ো বলছে সেইটাই তার হ্রাস হয়ে যাওয়া। যার ভবিষ্যৎ কমে এলো অতীতের বাড়তির বড়াই করে তার ফল কি? বৃদ্ধই যদি সংসারের গৌরব করবার জিনিষ তা হলে বৃদ্ধকে বরখাস্ত করবার জন্যে ভগবান এত তাড়া করতেন না।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, বুড়োদের ওপর বাঁধা হুকুম রয়েছে জায়গা ছেড়ে দেবার জন্যে। নকীব হাঁকছে, সরে যাও, সরে যাও। কেনরে বাবু বাট্‌, পঁয়ষট্টি বছরের পাকা আসন ছাড়ব কেন? ঐ যে আসচেন মহারাজা, ঐ যে কুমার, ঐ যে কিশোর। ভগবান কেবলি ফিরে ফিরে তরুণকে মর্ত্যের সিংহাসনে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর কি কোনো মানে নেই? তার মানে এই যে, তিনি তাঁর সৃষ্টিকে পিছনে বাঁধা পড়ে থাকতে দেবেন না। নূতন মন নূতন শক্তি বারে বারে নূতন করে তাঁর কাজ যদি না আরম্ভ করে, তাহলে অসীমের প্রকাশ বাধা পাবে। অসীমের ত জরা নেই। এই জন্যে বুদ্‌বুদের মত জরা কেবলি ফেটে মিলিয়ে যায়, আর পৃথিবীর কোল জুড়ে তরুণ ফুলের মধ্যে তরুণ প্রভাতের আলোয় দেখা দেয় তরুণের দল। ভগবান কেবলি নূতনকে বাঁশী বাজিয়ে ডাকছেন, আর তারা দলে দলে আসচে, আর সমস্ত জগৎ আদর করে তাদের জন্যে দ্বার খুলে দিচ্চে।

ভগবানের সেই আহ্বান শোনবার জন্যেই শিশুদের মধ্যে, বালকদের মধ্যে আমি বসি। তাতে আমার একটা মস্ত উপকার হয়, অন্যান্য বৃদ্ধদের মত আমি নবীনকে অশ্রদ্ধা করিনে, ভাবীকালের আশার উপর আমার অতীতকালের আশঙ্কার বোঝা চাপিয়ে দিইনে। আমি বলি, 'ভয় নেই। পরীক্ষা কর, প্রশ্ন কর, বিচার কর, সত্যকে ভেঙে দেখতে চাও আচ্ছা আঘাত কর। কিন্তু সামনের দিকে এগোও।" ভগবানের বাঁশীর ডাক আমারো বুকের মধ্যে বেজে ওঠে। তখন আমি বুঝতে পারি যে, বৃদ্ধের সতর্ক বিজ্ঞতা বড় সত্য নয়, নবীনের দুঃসাহসিক অনভিজ্ঞতা

তার চেয়ে বড় সত্য। কেন না এই অনভিজ্ঞতার ঔৎসুক্যের কাছেই সত্য বারে বারে আপন নূতন শক্তিতে নূতন মূর্ত্তিতে প্রকাশ পান, এই অনভিজ্ঞতার অক্ষুণ্ণ বলেই পুরাতনের পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা ভাঙে এবং অসাধ্য সাধন হতে থাকে।

বৃদ্ধ সেজে আমি তোমাদের উপদেশ দিতে চাইনে। আমি কেবলমাত্র তোমাদের এই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে তোমরা নবীন। তোমরা যে বার্ত্তা বহন করে এনেছ সেই বার্ত্তা তোমরা ভুললে চলবে না। এই পৃথিবী থেকে সকল প্রকার জীর্ণতাকে তোমরা সরিয়ে দিতে এসেছ, কেন না জীর্ণতাই আবর্জ্জনা, জীর্ণতা যাত্রাপথের বাধা। এই জীর্ণতাকে যারা আপন বলে মমতা করে তারাই সত্যকার বৃদ্ধ। পৃথিবীতে তাদের কাজ ফুরিয়েচে, মনিব তাদের জবাব দিয়েচেন। তারা সরে পড়বে। কিন্তু তোমরা নবীন, তোমাদেরই হাতে পৃথিবীর ভার নূতন করে পড়েচে, তোমাদের ভবিষ্যৎকে আচ্ছন্ন হতে দিয়ো না, পথ পরিষ্কার কর।

কোন্ পাথেয় নিয়ে তোমরা এসেচ? মহৎ আকাঙ্ক্ষা। তোমরা বিদ্যালয়ে শিখবে বলে ভর্ত্তি হয়েচ। কি শিখতে হবে ভেবে দেখ। পাখী তার বাপ মায়ের কাছে কি শেখে? পাখা মেলতে শেখে, উড়তে শেখে। মানুষকেও তার অন্তরের পাখা মেলাতে শিখতে হবে, তাকে শিখতে হবে কি করে বড় করে আকাঙ্ক্ষা করতে হয়। পেট ভরাতে হবে। এ শেখাবার জন্যে বেশী সাধনার দরকার নেই, কিন্তু পুরোপুরি মানুষ হতে হবে এই শিক্ষার জন্যে যে অপরিমিত আকাঙ্ক্ষার দরকার তাকেই শেষ পর্য্যন্ত জাগিয়ে রাখবার জন্যে মানুষের শিক্ষা।

এই যুগে সমস্ত পৃথিবীতে য়ুরোপ শিক্ষকতার ভার পেয়েচে। কেন পেয়েচে? গায়ের জোরে আর সব হতে পারে কিন্তু গায়ের জোরে গুরু হওয়া যায় না। যে মানুষ গৌরব পায় সেই গুরু হয়। যার আকাঙ্ক্ষা বড় সেই ত গৌরব পায়। য়ুরোপ বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধে বেশী খবর রেখেচে বলেই আজকের দিনে মানুষের গুরু হয়েচে একথা সত্য নয়। তার আকাঙ্ক্ষা বৃহৎ, তার আকাঙ্ক্ষা কোনো বাধাকে মানতে চায় না, মৃত্যুকেও না। মানুষের যে বাসনা ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্যে, সেটাকে বড় করে তুলে মানুষ বড় হয় না, ছোটই হয়ে যায়, সে যেন খাঁচার ভেতরে পাখীর ওড়া, তাতে পাখার সার্থকতা হয় না। কিন্তু জ্ঞানের জন্যে আকাঙ্ক্ষা প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে আবিষ্কার করে, তাকে মানুষের অধিকারে আনবার জন্যে আকাঙ্ক্ষা, যাতে মানুষ মরুকে জয় করে ফসল পায় রোগকে জয় করে স্বাস্থ্য পায় দূরত্বকে জয় করে নিজের গতিপথ অবারিত করে, তাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায়। তাতেই প্রমাণ হয় যে, মানুষের জাগ্রত আত্মা পরাভবকে বিশ্বাস করে না, কোনো অভাব দুঃখ দুর্গতিকেই সে অদৃষ্টের হাতের চরম মার মনে করে মাথা পেতে নিতে অপমান বোধ করে, সে জানে যে তার দুঃখ মোচন তার নিজেরই হাতে, তার অধিকার প্রভুত্বের অধিকার। য়ুরোপ এমনি করে আকাঙ্ক্ষার 'পাখা' বড় করে মেলতে পেরেচে বলেই আজ পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে শিক্ষা দেবার অধিকার সে পেয়েচে। সেই শিক্ষাকে আমরা যদি পুঁথির বুলি শিক্ষা, কতকগুলি বিষয় শিক্ষা বলে ক্ষুদ্র করে দেখি তাহলে নিজেকে বঞ্চিত করলুম। মনুষ্যত্বের শিক্ষাটাই চরম শিক্ষা আর সমস্তই তার অধীনে। এই মনুষ্যত্ব হচ্চে আকাঙ্ক্ষার ঔদার্য্য আকাঙ্ক্ষার দুঃসাধ্য অধ্যবসায়, মহৎ সংকল্পের দুর্জ্জয়তা।

য়ুরোপের লোকালয়ে য়ুরোপের মানুষ বিপুল আকাঙ্ক্ষাকে নিয়তই নানাক্ষেত্রে প্রকাশ করচে এবং জয়ী করচে, সেই দেশব্যাপী মহৎ উদ্যমের সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিক্ষা। তাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং

তাদের জীবনের শিক্ষা পাশাপাশি সংলগ্ন। এমন কি যে বিদ্যা তারা শিক্ষকদের হাত থেকে গ্রহণ করেচে সে বিদ্যা তাদের আপন দেশেরই সাধনার ধন, তার মধ্যে শুধু ছাপার অক্ষর নেই। তাদের আপন দেশের লোকের কঠিন তপস্যা আছে। এই কারণে সেখানকার ছাত্র শুধু যে কেবল শিক্ষার বিষয়কে বইয়ের পাতায় দেখচে আর গ্রহণ করেচে তা নয়, মানবাত্মার কর্তৃত্ব, তার দাসত্ব, স্রষ্টৃত্ব চারিদিকেই দেখেচে। এতেই মানুষ আপনাকে চেনে এবং মানুষ হতে শেখে।"

যে দেশে বিদ্যালয়ে কেবল দেখতে পাই, ছাত্র নোটবুকের পত্রপুট মেলে ধরে বিদ্যার মুষ্টিভিক্ষা করচে, কিংবা পরীক্ষার পাশের দিকে তাকিয়ে টেক্সট্ বইয়ের পাতায় পাতায় বিদ্যার উঞ্ছবৃত্তিতে নিযুক্ত, যে দেশে মানুষের বড় প্রয়োজনের সামগ্রী মাত্রেই পরের কাছে ভিক্ষা করে সংগ্রহ করা হচ্চে, নিজের হাতে লোকে দেশকে কিছুই দিচ্চে না—না স্বাস্থ্য, না অন্ন, না জ্ঞান, না শক্তি, যে দেশে কর্ম্মের ক্ষেত্র সংকীর্ণ কর্ম্মের চেষ্টা দুর্ব্বল, যে দেশে শিল্পকলায় মানুষ আপন প্রাণমন আত্মার আনন্দকে নব নব রূপে সৃষ্টি করচে না, যে দেশে অভ্যাসে বন্ধনে সংস্কারের জালে মানুষের মন এবং অনুষ্ঠান বদ্ধ বিজড়িত, যে দেশে প্রশ্ন করা, বিচার করা নূতন করে চিন্তা করা ও সেই চিন্তা ব্যবহারে প্রয়োগ করা কেবল যে নেই তা নয় সেটা নিষিদ্ধ এবং নিন্দনীয়, সেই দেশে মানুষ আপন সমাজে আত্মাকে দেখ্তে পায় না, কেবল হাতের হাতকড়া, পায়ের বেড়ি এবং মৃতযুগের আবর্জ্জনারাশিকেই চারদিকে দেখ্তে পায়, জড় বিধিকেই দেখে, জাগ্রত বিধাতাকে দেখে না।

যদি মূলের দিকে তাকিয়ে দেখি তা' হলে দেখ্‌ব আমাদের যে দারিদ্র্য সে আত্মারই দারিদ্র্য। মানবাত্মারই অপমান চারিদিকে নানা অভাব নানা দুঃখরূপে ছড়িয়ে রয়েচে। নদী যখন মরে যায় তখন দেখ্‌তে পাই গর্ত্ত এবং বালি, সেই শূন্যতার সেই শুষ্কতার অস্তিত্ব নিয়ে বিলাপ করবার কথা নেই, আসল বিলাপের কারণ নদীর সচল ধারার অভাব নিয়ে। আত্মার সচল প্রবাহ যখন শুষ্ক তখন আচারের নীরস নিশ্চলতা।

সৃষ্টিকে যে সত্য বহন করচে সে সত্য সচল। সে নিরন্তর অভিব্যক্তির ভিতর দিয়ে বিকাশের নব নব পর্ব্বে উত্তীর্ণ হচ্চে। তার কারণ, সত্য অসীমকে প্রকাশের জন্যই। যেখানেই তাকে কোন একটা সীমার বাঁধ বেধে চিরকালের মত বদ্ধ করবার চেষ্টা করা হয় সেখানেই তাকে ব্যর্থ করা হয়। মানবাত্মার ধারা নিয়ত এই অসীমের দিকে ধাবিত হচ্চে বলেই কেবলই নব নব রূপে সৃষ্টি বিকাশ কর্‌তে সে অগ্রসর হচ্চে। আত্মার পক্ষে "স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ;" জ্ঞানের পথে বলের পথে নিত্য সক্রিয়তাই তার স্বভাব। বদ্ধ সংসারের বেড়ি হাতে পায়ে পরিয়ে দিয়ে তার এই ক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়াই তাকে তার স্বভাব থেকে বিচ্যুত করা। এই নিষ্ক্রিয়তাকে মুক্তি বলে না, এইটেই তার বন্ধন।

আমাদের দেশে কেবলই এই বাণী শুন্‌তে পাই, যা চলবে না সেইটেই শ্রেষ্ঠ, জীবনের চেয়ে মৃত্যুটাই বড়। এর আর কোন মানে নেই এর মানে অভ্যস্ত আচারের প্রতি, জড় ব্যবস্থার প্রতি আস্থা। সেই আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা একেবারেই চলে গিয়েচে যে আত্মার পক্ষে "স্বাভাবিকী জ্ঞান বলক্রিয়াচ।" কিন্তু সত্য শিক্ষা মানুষকে কি বল্‌চে? "আত্মানং বিদ্ধি।" আত্মাকে জান। 'নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব বিজিজ্ঞাসিতব্য।" অল্পে সুখ নেই, ভূমাকেই জান। এই আত্মাকে জান্‌তে হলে ভূমাকে জান্‌তে হলে পৈতৃক সঞ্চয়টীকে বাক্সে বন্ধ করে দিবানিদ্রা দিলে চল্‌বে না। কেবলই চল্‌তে হবে, সৃষ্টি কর্‌তে হবে।

ভগবান নিয়ত সৃষ্টি করেই আপনাকে জানচেন্, মানবাত্মাও কেবল তেম্‌নি করেই আপনাকে জান্‌তে পারে, মৃত পিতামহের কাছে কিংবা জীবিত প্রতিবেশীর কাছে ধার করে নয়, ভিক্ষা করে নয়।

অতএব, প্রকৃত শিক্ষা জ্ঞান সমুদ্রের যে বন্দরে নিয়ে যাচ্চে, সে বন্দর কোথায়? যেখানে এই উপদেশের সার্থকতা আছে— "আত্মানং বিদ্ধি, ভূমৈব বিজিজ্ঞাসিতব্য।" মানুষ যেখানে সুমহৎকে পায় অর্থাৎ মানুষ যেখানে সেই ত্যাগের শক্তি পায় যে ত্যাগের দ্বারা সে সৃষ্টি করে, যে শক্তির দ্বারা সে মৃত্যুকে অতিক্রম করে। কিন্তু আজকের দিনে ভারতবর্ষ বিদ্যা সমুদ্রে এই যে মহাভিড় করা খেয়ায় পাড়ি দিচ্চে সাম্‌নের কোন বন্দর সে দেখ্‌তে পাচ্চে বলত? দারোগাগিরি, কেরাণীগিরি, ডেপুটীগিরি। এইটুকু মাত্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এতবড় সম্পদের সামনে এসে দাঁড়িয়েচে এর লজ্জাটা এতবড় দেশ থেকে একেবারে চলে গেছে। এরা বড় করে চাইতেও শিখ্‌লে না? অন্ন দারিদ্র্যের লজ্জা নেই কিন্তু আকাঙ্ক্ষার দারিদ্র্যের মত লজ্জার কথা মানুষের পক্ষে আর কিছুই নেই। কেন না, অন্ন দারিদ্র বাহিরের, এই আকাঙ্ক্ষার দারিদ্র্য আত্মার।

এইজন্য আজ আমি তোমাদের এই কথাটুকু বল্‌তে দাঁড়িয়েচি— আকাঙ্ক্ষাকে বড় কর। শক্তি কারো বড় কারো ছোট— কিন্তু আকাঙ্ক্ষাকে আমরা ছোট করবো না। আকাঙ্ক্ষাকে বড় করার মানেই আরামকে অবজ্ঞা করা, দুঃখকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করা। এই দুঃখকে গৌরবে বহন করবার অধিকারই মানুষের। আমাদের শাস্ত্রে একটা কথা বলে, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" এই সিদ্ধিটা কিসের? শুধু বাইরের নয়— এই সিদ্ধি হচ্চে আপনাকে উপলব্ধি করা, সেই উপলব্ধি যা কর্ম্মে আপনাকে প্রকাশ করে।

আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে ছোটকাল থেকেই কোমর বেঁধে আমরা খর্ব্ব করি। অর্থাৎ সেটাকে কাজে খাটাবার আগেই তাকে খাটো করে দিই। অনেক সময়ে বড় বয়সে সংসারের ঝড়ঝাপটের মধ্যে পড়ে আমাদের আকাঙ্ক্ষার পাখা জীর্ণ হয়ে যায়, তখন আমাদের বিষয় বুদ্ধি অর্থাৎ ছোট বুদ্ধিটাই বড় হয়ে ওঠে কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, শিশুকাল থেকেই আমরা বড় রাস্তায় চল্‌বার পাথেয় ভার হাল্‌কা করে দিই। নিজের বিদ্যালয়ে ছোট ছোট বালকদের মধ্যেই সেটা আমি অনুভব করি। প্রথমে কয় বৎসর একরকম বেশ চলে কিন্তু ছেলেরা যেই থার্ডক্লাসে গিয়ে পৌঁছায় অম্‌নি বিদ্যা অর্জ্জন সম্বন্ধে তাদের বিষয় বুদ্ধি জেগে ওঠে। অম্‌নি তারা হিসাব করে শিখ্‌তে বসে। তখন থেকে তারা বল্‌তে আরম্ভ করে আমরা শিখ্‌ব না আমরা পাশ করব। অর্থাৎ যে পথে যথাসম্ভব কম জেনে যতদূর সম্ভব বেশী মার্কা পাওয়া যায় আমরা সেই পথে চল্‌বো।

এই ত দেখ্‌চি শিশুকাল থেকেই ফাঁকি দেবার বুদ্ধি অবলম্বন। যে জ্ঞান আমাদের সত্যের দিকে নিয়ে যায়, গোড়াথেকেই সেই জ্ঞানের সঙ্গে অসত্য ব্যবহার। এর কি অভিশাপ আমাদের দেশের উপর লাগ্‌চে না? এই জন্যেই কি জ্ঞানের যজ্ঞে আমরা ভিক্ষার ঝুলি হাতে বাইরে বসে নেই? আপিসের বড় বাবু হয়েই কি আমাদের এই অপমান ঘুচ্‌বে? আজকের দিনে দেশের লোকেরা—যুবকেরা পর্য্যন্ত—যে বল্‌চে যে ঋষিরা যা করে গেছেন তার উপর আমাদের আর কিছুই ভাববার নেই, কিছুই কর্‌বার নেই, এর মানে বুঝ্‌তে পেরেচ? এইটেই ঘটেচে আমাদের কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত বিদ্যাদেবীর অভিশাপে। যে সমাজে কিছুই ভাববার নেই, কিছুই কর্‌বার নেই, সমস্তই ধরা বাঁধা সে সমাজ কি বুদ্ধিমান-শক্তিমান মানুষের বাসের যোগ্য? সে সমাজ ত মৌমাছির চাক

বাঁধবার জায়গা। দশ পনেরো বছর ধরে শিক্ষা লাভ করে আপন চিত্ত শক্তির প.ক্ষ এমন অদ্ভুত অপমানকর কথা অন্য কোন দেশে এতগুলো লোক এত বড় নির্লজ্জ অহঙ্কারের সঙ্গে বল্‌তে পারেনি। সকল বড় দেশে যে বড় আকাঙ্ক্ষা মানুষকে আপন শক্তিতে আপন ভাবনায় আপন হাতেই সৃষ্টি কর্‌বারই গৌরব দান করে, আমরা সেই আকাঙ্ক্ষাকে কেবল যে বিসর্জ্জন করেচি তা নয়, দল বেঁধে লোক ডেকে বিসর্জ্জনের ঢাক পিটিয়ে সেই তালে তাণ্ডব নৃত্য করচি।

কিন্তু আপন দুর্গতি নিয়ে খুব জোরে অহঙ্কার কর্‌লেই যে সেই দুর্গতির বিষ মরে এই আশা যেন না করি। আকাঙ্ক্ষাকে ছোট করবো, সাধনাকে সংকীর্ণ করবো, কেবল অহঙ্কারকেই বড় করে তুলব এও আপনাকে তেমনি ফাঁকি দেওয়া যেমন ফাঁকি শিক্ষা এড়িয়ে পরীক্ষায় মার্কা পেয়ে নিজেকে বিদ্বান মনে করা। যেখানে ফল দেখা যায় সেখানেই চেয়ে দেখি ডিগ্রি পেলুম, চাক্‌রি কর্‌লুম টাকা হল, কিন্তু জ্ঞানের ঋণ, জ্ঞানের ক্ষেত্রে, শোধ কর্‌তে পারলুম না, সেখানে সমস্ত বিশ্বের কাছে মাথা হেঁট্‌ করে রইলুম। তোমাদের আমি দূর থেকে উপদেশ দিতে আসিনি। স্বদেশের এতদিনকার যে পুঞ্জীভূত লজ্জা, যে লজ্জাকে আমরা অহঙ্কারের গিল্‌টি করে গৌরব বলে চালাতে চেষ্টা করচি সেইটের ছদ্ম পরিচয় ঘুচিয়ে তোমাদের কাছে উৎঘাটিত করে দেখাতে চাই। তোমাদের বয়স কাঁচা, তোমাদের বয়স তাজা, তোমাদের উপর এই লজ্জা দূর কর্‌বার ভার। তোমরা ফাঁকি দেবে না ও ফাঁকিতে ভুল্‌বে না, তোমরা আকাঙ্ক্ষাকে বড় করবে, সাধনাকে সত্য করবে। তোমরা যদি উপরের দিকে তাকিয়ে সামনের দিকে পা বাড়িয়ে প্রস্তুত হও তা' হলে সকল বড় দেশ যে ব্রত নিয়ে বড় হয়েচে আমরাও সেই ব্রত নেব। কোন ব্রত ? দান ব্রত।

যখন না দিতে পারি তখন কেবল হয়ত ভিক্ষা পাই, যখন দিতে পারি তখন আপনাকে পাই। যখন দিতে পার্‌ব তখন সমস্ত পৃথিবী আগ্‌বাড়িয়ে এসে বল্‌বে, "এসো, এসো, বোস।" তখন জোড় হাত করে একথা কাউকে বলতে হবে না, "আমাকে মেরো না, আমাকে বাচিয়ে রাখো।" তখন সমস্ত মানুষ আপন গরজেই আঘাত হতে আমাদের বাঁচাবে। ছোট চিন্তা মনেও স্থান দিতে নেই ছোট প্রার্থনা মুখে ও উচ্চারণ কর্‌তে নেই। "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।" সেই ভূমাকে যদি অন্তরে ভুলি এবং বাহিরে লক্ষ্য না করি তা'হলে অন্য যে কোন সুখ সুবিধা আমরা চেয়ে চিন্তে যোগাড় করিনে কেন না, তাতে আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ হবে। *

---

* ১৩২৬ বাংলার ১৮ই কার্ত্তিক, শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজ হোষ্টেলে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা। বক্তৃতাটি অনুলিখন করেছিলেন শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ এবং শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরী। Towards the future এইনামে বক্তৃতাটির রবীন্দ্রনাথ কৃত অনুবাদ ১৯২০ ইংরাজীর জুন মাসের 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক, কবিপ্রণাম।

গৌহাটীতে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসত্যভূষণ সেন

১৯১৯ সালের ৩১শে অক্টোবর। সকাল বেলা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে গৌহাটি কার্জ্জনহলে আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করা হইয়াছে। আচার্য্য রায়কে বক্তৃতা করার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, বক্তৃতা করার যোগ্যতম ব্যক্তি যিনি, যাঁর বক্তৃতা শুনবার জন্য আপনারা আগ্রহান্বিত, তিনি আসছেন—আপনারা ততক্ষণ ধৈর্য্য ধরে থাকুন।"

সেইদিনই রবীন্দ্রনাথের শিলং হইতে গৌহাটী পৌঁছিবার কথা।

বিকাল বেলা কবিগুরু গৌহাটী আসিয়া পৌঁছেন। এবং স্থানীয় ল' কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাভিরাম বরুয়া মহাশয়ের বাড়ীতে আথিত্য গ্রহণ করিলেন। শ্রীযুক্ত বরুয়ার পত্নী ঠাকুরবাড়ীর কন্যা,—শ্রীযুক্ত অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দুহিতা।

সেদিন অফিস হইতে ফিরিবার পথে দূর হইতে দেখিতে পাইলাম, অলিন্দে দণ্ডায়মান শুভ্রপরিচ্ছদ পরিহিত, শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডিত কবিগুরু। অপরিসীম শ্রদ্ধাভরে মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।

পরদিন, পয়লা নভেম্বর। সন্ধ্যার পূর্ব্বে জুবিলী পার্কে জনসভার আয়োজন করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কখন আসিবেন—উৎসুক জন-মণ্ডলী অধীর আগ্রহে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। সন্ধ্যায় তিনি সভায় আসিলেন।

কুয়াশা-কোমল কার্ত্তিকের সন্ধ্যায় সেদিন তাঁহাকে বড় অপরূপ লাগিয়াছিল। সমবেত জনমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি একটি বক্তৃতা দেন। কি মধুর কণ্ঠস্বর, কি অপূর্ব্ব বলার ভঙ্গী, সেই ধ্বনিমাধুর্য্য যেন এক সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়া আমার মনে কি যে এক মোহ ছড়াইয়া দিয়াছিল— তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কবি যা বলিয়াছিলেন তার সারমর্ম্ম মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ প্রেমের সম্বন্ধ, প্রয়োজনের সম্বন্ধ নয়। পাশ্চাত্যের অধিবাসীদের আত্মসর্ব্বস্ব বলে অবজ্ঞা করবার মনোবৃত্তি আমাদের দেশের একদল লোকের মধ্যে প্রবল। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, তাদের দেশে এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। মানুষের প্রতি প্রীতিতে হৃদয় তাদের পরিপূর্ণ। এমন মানুষদের আত্মসর্ব্বস্ব বলে অশ্রদ্ধা করবার কোনো মানে হয় না। প্রসঙ্গক্রমে, কবি পাশ্চাত্য দেশের কোনো এক মনীষীর কথা উল্লেখ করেন। উক্ত ভদ্রলোক অনাথ অনাশ্রিত ছেলেদের উপযুক্ত শিক্ষা দান এবং চরিত্র গঠনের জন্যে একটি আশ্রম স্থাপন করেন, ভদ্রলোক নিঃসঙ্কোচ এবং নির্ভয়ে নিজের ছেলেকেও এদের সঙ্গে একত্রে মানুষ করতে লাগলেন। অসৎসংসর্গে মিশে তাঁর ছেলেও যে একেবারে বয়ে যেতে পারে সে আশঙ্কা তাঁর মনেই হল না। এটা সম্ভব হয়েছিল এই জন্যে যে, এই সব তথাকথিত অবাঞ্ছিত ছেলেদের প্রতি বাস্তবিকই ছিল তার অপরিসীম দরদ এবং এই বিশ্বাস তার মনে বদ্ধমূল ছিল যে শিক্ষা ও উপদেশের দ্বারা এইসব উন্মার্গগামী ছেলেদের চরিত্র গঠন তিনি করতে পারবেনই।*

* গৌহাটীতে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাগুলির সারাংশ লেখক কর্তৃক গৌহাটী সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা হইতে সঙ্কলিত।

২রা নভেম্বর প্রাতে কার্জ্জন হলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৌহাটী শাখার পক্ষ হইতে কবিকে অভিনন্দন দেওয়া হয়। সভার প্রারম্ভে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় স্বরচিত সঙ্গীত দ্বারা কবির অভ্যর্থনা করেন।

সেদিন রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-পরিষদের প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ মোটামুটি এই— "সাহিত্য চর্চ্চা যৌথ কারবার নয়, নির্জ্জনেই তা ভালো সম্পাদিত হয়। তবে সাহিত্য-পরিষৎ, সাহিত্য সম্মেলন প্রভৃতির সমর্থন করা যায় অন্য কারণে। সাহিত্য প্রচার ও সাহিত্য চর্চ্চার বন্দোবস্ত এই সকল সভা সমিতিতে করা যেতে পারে। সাহিত্য সৃষ্টি করা এই সকল সভা সমিতির উদ্দেশ্য নয়। এগুলির সার্থকতা অন্য দিক দিয়ে। যেমন পরিভাষা স্থিরীকরণ ইত্যাদি ব্যাপারে দশজনের পরামর্শ আলোচনা আবশ্যক। সে দিক দিয়ে এ সকল সমিতি দ্বারা অনেক কাজ হতে পারে। চারিদিকে শিক্ষা বিস্তার করে বিভিন্ন সাহিত্য পরিষৎ-শাখা সারা দেশময় যদি জ্ঞানের আলো জ্বেলে দেয়, অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত দেশবাসীর মধ্যে যদি নবজীবনের সঞ্চার করে,— তা হলেই এগুলো সকলের সমর্থন লাভ করতে পারে। সাহিত্য-পরিষদের বিভিন্ন শাখাগুলোর একটা প্রধান কাজ হবে স্থানীয় আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, ইত্যাদি সকল বিষয় সম্বন্ধে গবেষণা করা। নানা প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা। এক দিকে যেমন জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে তেমনি অন্য দিকে যাঁরা সাহিত্য-সৃষ্টি কার্য্যে ব্রতী তাঁরাও তাদের সংগৃহীত তথ্য থেকে সৃষ্টির উপকরণ সংগ্রহ করতে পারবেন। স্থানীয় লোকদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে কাজ করতে হবে, তুচ্ছ বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়ে শক্তি ও সময়ের অপচয় করা সমীচীন হবে না।

কবির বক্তৃতার পর সভাস্থ সকলের পক্ষ হইতে অন্যতম সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় কবিকে একটি গান গাহিবার জন্য অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ স্মিতমুখে তখন বলেন, "অনুরোধ একটু বিলম্বে এসে পৌঁছেছে। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরে আগে হলে না হয় একটা কথা ছিল। তখন খ্যাতি ছিল যে এই লোকটা গান গাইতে পারে। এখন সেই খ্যাতির উপর দাবী করলে হবে কি রকম ? যেন একটা লোক দেউলে হয়ে গিয়েও চেক লিখে দিচ্ছে।" সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কবিকে অবশ্য শেষে রাজি হইতে হইল। একজন হারমোনিয়ম আগাইয়া দিলে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, না ওটার দরকার নেই তা হলে আপনারা আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাবেন না।" আমি ভাবিতেছিলাম কোন্ গানটি তিনি গাহিবেন। যদি 'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী' গানটি হয় তবে বেশ হয়। আমার আকাঙ্খার প্রতিধ্বনিরূপেই কবি গাহিলেন—

"অয়ি ভুবন মনোমোহিনী
অয়ি নির্ম্মলসূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরণী।"

এই সম্বর্দ্ধনা সভা গৌহাটী সহরের পক্ষে বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইতিপূর্ব্বে এই সহরে আর কোনো সভায় এত জন সমাগম হয় নাই। লোকে লোকারণ্য। তিল ধারণেরও যেন জায়গা ছিল না।

বিকাল বেলা ২ঘটিকার সময় আবার আইন কলেজের গৃহে মহিলাদের একটি সভায় রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করেন। সেই সভায় সকলের অনুরোধে কবি তাঁর সুললিতকণ্ঠে দুইটি গান গাহিয়াছিলেন। চারটার সময় আবার ছাত্রদের এক সভায় কবিকে বক্তৃতা করিতে হয়।

সন্ধ্যার সময় (২রা নভেম্বর) ব্রাহ্মসমাজ গৃহের প্রাঙ্গনে রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্যে ৺শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতি-সভার অধিবেশন হয়। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির নিন্দা করেন এবং তিনি যে কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, সেকথা বিশেষভাবে জোর দিয়া বলেন।

* * *

কবির আগমনে গৌহাটীতে যে নবজীবনের জোয়ার আসিয়াছিল তাহা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল বলিয়া নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করি। রবীন্দ্রনাথকে লইয়া বাঙালীরা গর্ব্ব করিবে, রাজসোমারোহে তাহার অভ্যর্থনা করিবে, ইহা স্বাভাবিক।

কিন্তু গৌহাটী শহরের অসমীয়াদের মধ্যেও কবি-সম্বর্দ্ধনায় প্রবাসী বাঙালীদের চেয়ে কম উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই। গৌহাটীর অসমীয়া মহিলাগণ কবির প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাদের নিজের হাতে প্রস্তুত এণ্ডি ও মুগার কাপড় উপহার দেন। আসামে এই রাজোচিত কবি-সম্বর্দ্ধনা দেখিয়া এই কথাটাই বিশেষ ভাবে মনে জাগিয়াছিল যে, রবীন্দ্রনাথ বাঙালী হইলেও, তিনি যে দেশ-জাতি ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেরই একান্ত প্রিয় কবি। তাঁর কাছে দেশ ও বিদেশ বিভেদ ছিল না বলিয়াই তাহার উপর সকল দেশের লোকদেরই ছিল সমান দাবী। অসমীয়াদের মধ্যেও রবীন্দ্র-সাহিত্যানুরাগীর অভাব নাই।

কবি তিনটি দিন ছিলেন গৌহাটীতে। গৌহাটী শহরের ইতিহাসে এই কয়েকটি দিন "রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি"তে সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

শিলঙে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

স্কুল ছেড়ে সবে মাত্র কলেজে ঢুকেছি। গরমের ছুটিতে শিলঙে বেড়াতে এসেছিলুম। হঠাৎ একদিন বাবার মুখে শুনলুম রবীন্দ্রনাথ এসেছেন শিলঙে। সে হচ্ছে ১৩২৬ বাংলার (১৯১৯ ইং) কথা। শুনে কবি সন্দর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হ'ল। তখন তিনি উঠেছিলেন মিঃ কে, সি দে'র বাংলো 'ব্রুক সাইডে'। একদিন সকাল বেলা বাংলোর কাছে গিয়ে দূরের থেকে উঁকি মেরে দেখি কবি কি একখানা বই পড়ছেন বসে বসে। চোখের চশমাটি তুলে ফিরে চাইলেন। ত্বরিতপদে চলে এলুম। সেবার আর একদিন মাত্র দেখেছিলুম, পুলিশবাজারের ব্রাহ্মসমাজে। কবি সেখানে বক্তৃতা করেছিলেন। আরো দু'একদিন গিয়েছি ব্রুকসাইড্ (Brook side) বাংলোর পাশে কবিগুরুকে দেখবার জন্যে, বড় লোকেরাই সব সময় তখন তাঁকে ঘিরে থাকতেন। পূজা যখন আসন্ন, তখন একদিন শুনলাম কবি শিলঙ পরিত্যাগ করেছেন।

১৩৩০ সালে (১৯২৩ মে) দ্বিতীয় বার শিলঙে এসে যখন তিনি 'জিতভূমে' উঠেছিলেন তখন তাকে প্রণাম করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। একদিন ভয়ে ভয়ে কবির ভবনে গিয়ে হাজির হয়েছি। বাংলোর সংলগ্ন খোলা সবুজ ঘাসের আস্তরণের উপর একখানি আরাম কেদারায় উপবিষ্ট ছিলেন কবি। শিলঙের একজন বিশিষ্ট নাগরিক তখন তার পাশে দাঁড়িয়ে কি সব কথাবার্ত্তা বলছিলেন, কাছে যেতেই তিনি আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলেন। গুরুদেব স্মিতমুখে জিজ্ঞেস করলেন,

বোলপুরে যাওনি তুমি ?

জবাব দিলুম, না, সে সুযোগ হয়নি।

শান্তিনিকেতনের আদর্শ সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। আমি চুপ করে শুনে যেতে লাগলুম।

জিতভূমের যে বাড়ীতে কবি উঠেছিলেন, তার মালিক ছিলেন ঠাকুর পরিবারেরই কোনো আত্মীয়। বর্ত্তমানে সে বাড়ী হস্তান্তরিত হয়েছে। যতদিন গিয়েছি, দেখেছি, বাড়ীর সুমুখে উন্মুক্ত আকাশের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি চুপ করে বসে আছেন। কবিগুরুর সেই ধ্যানগম্ভীর অপরূপ রূপ কিন্তু ভুলবার নয়।

শান্তিনিকেতনের জনকয়েক প্রাক্তন ছাত্র এবং শিলঙের দু'চার জন গণ্যমান্য ভদ্রলোককে মাঝে মাঝে জিতভূমের বাংলোয় আনাগোনা করতে দেখতুম।

শিলঙের শুব্ধ নীরবতা, সুদূরপ্রসারী গিরিশ্রেণী, পাইনবনের সন্ সন্ হাওয়া কবির মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। শিলঙের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে তিনি অনর্গল কথা বলে যেতেন। 'রক্ত করবীর' কিছু কিছু লেখা আমাদের পড়ে শোনাতেন। কী যাদু ছিল সেই সুললিত কণ্ঠস্বরে, কথা শুনতে শুনতে যেন সম্মোহিত হয়ে যেতুম।

স্থানীয় কুইনটন হলে একদিন তিনি জনকয়েক ভদ্রমহোদয়ের আগ্রহে একটি বাংলা প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। শিলঙে তখন সাহিত্যের আবহাওয়া ছিলনা বললেই চলে, সাহিত্যিক আসর তো দূরের

কথা। সেই জন্যেই সভায় আশানুরূপ জনসমাগম হয়নি। প্রবন্ধ পাঠ হওয়ার পরক্ষণেই কবি সভাস্থল পরিত্যাগ করেছিলেন।

জিতভূমে আসার কালে, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী, বেণারস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণী অধিকারীর কন্যা কুমারী অধিকারী (বর্ত্তমানে মিসেস্ মুখার্জি) প্রভৃতি তাঁর সঙ্গে ছিলেন।*

পুপে (শ্রীযুক্তা নন্দিতা কৃপালনী। তখন নিতান্ত শিশু) তার মুখে ছড়া কবিগুরু খুব আনন্দ পেতেন এবং মাঝে মাঝে তাকে কবিতা ও ছড়া শেখাতেন। পুপের শিশুকণ্ঠে উচ্চারিত বড় বড় বোধ-সমৃদ্ধ কথা এমন চমৎকার লাগত আমাদের। বহুদিন সে সুখস্মৃতি আমাদের মানসপটে জাগরূক ছিল।

মনে আছে একদিন— "তোমারি অসীমে মন প্রাণ লয়ে—" এই গানটি গাওয়া হচ্ছিল, চেয়ে দেখি গুরুদেবের চোখ দু'টি জলে ভরে উঠেছে। আমরা মৌনভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলুম। মনে হল আমাদের এত কাছে থেকেও তিনি যেন কত দূরে চলে গিয়েছেন।

জিতভূমে যখনই আমরা তাঁর কাছে গিয়েছি, তখনই আমাদের সঙ্গে নানাবিষয়ে আলাপ আলোচনা ক'রে আমাদের কৃতার্থ করেছেন। শেষে তাঁর কাছে যেতে আর মোটেই ভয় বা সংকোচ হ'ত না।

১৩৩৩ সালে মিঃ আম্বালাল সরাভাই শিলঙে খান কয়েক বড়ো বড়ো বাড়ী ভাড়া করেন। তখন হঠাৎ একদিন শোনা গেল, গুরুদেব শিলঙে আসছেন। এ খবর প্রথম আমরা শুনতে পাই গুরুদেবের সকল সুরের ভাণ্ডারী, দিনুবাবুর কাছে। তিনি সস্ত্রীক এসে অবস্থান করছিলেন লাবানের উপান্তে একটি ছোট বাড়ীতে। তাঁর কাছ থেকেই দিনকতক পরে অবগত হলুম যে, গুরুদেব এসে পৌঁছেছেন এবং লাইমোখরার ধারে আপল্যাণ্ড্স্ (uplands) বাড়ীতে আছেন। পরদিন দিনুবাবুর সঙ্গে আমি ও মনীন্দ্রবাবু (অধুনা পরলোকগত) কবি সন্দর্শনে গিয়ে হাজির হলুম। গুরুদেব আমাকে দেখেই চিনতে পারলেন।

এরপর মনীন্দ্রবাবুকে নিয়ে মাঝে মাঝে কবিগুরুর কাছে যেতুম। তার্কিক হিসেবে মনীন্দ্রবাবুর একটু বদনাম ছিল। তিনি কবিগুরুর সঙ্গে যতদিন দেখা করতে গিয়েছেন, একটা না একটা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্ক না করে আসেন নি।

একদিন আমি একাই গিয়েছিলুম, কথা প্রসংগে তিনি রসিকতা করে বললেন, মাষ্টার মশায় আজ যে বড় এলেন না।

বললুম, না আজ কাজে ব্যস্ত থাকায় আসতে পারলেন না।

একটু হেসে বললেন, খুব ভালো লাগে আমার ওকে, আর একদিন আসতে বলো। আমার Education সম্বন্ধে লেখা প্রবন্ধটি ওকে একদিন পড়ে শোনাব।

কিছুদিন পরে স্থানীয় কুইনটন হলে গুরুদেবের 'শিক্ষা' সম্বন্ধে ইংরেজি প্রবন্ধটি পাঠের আয়োজন হয়েছে। হঠাৎ নজরে পড়ল 'মাষ্টার মশায়' পিছনের একটি আসনে চুপচাপ বসে আছেন। সে

---

* জিতভূমে কবির অবস্থান কালের আরো কিছু বিবরণ কবি প্রণামে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের 'রবীন্দ্র-স্মৃতি' নামক প্রবন্ধে আছে। সম্পাদক— কঃ প্রঃ।

সভায় Col L W Shakaspeare D. I G of Assam Rifles ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বহুদিন থেকে রবীন্দ্রনাথের নাম শুনে আসছেন। এবং তাঁকে দেখবার জন্যে বহুক্ষণ আগে সভায় এসে তাঁর আগমন-প্রতীক্ষা করছিলেন।

প্রবন্ধটি পাঠ করেই কবিগুরু চলে গেলেন। সেক্সপীয়ার সাহেব সে-প্রবন্ধের ভাব সম্পদে এবং ভাষার মাধুর্যে এতই মুগ্ধ হন যে একদিন কবিগুরুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবার উদ্দেশ্যে তিনি uplands বাংলোতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

* * *

আসাম বেঙ্গল থিয়েটার পার্টির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'চিরকুমার সভা' নাটকের অভিনয়ে দীনুবাবু যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন এবং কবিগুরুর উপস্থিতিতে গানগুলি শেখানো হয়েছিল। অবশ্য অভিনয়ের দিন কোন অনিবার্য্য কারণে তিনি নিজে উপস্থিত হতে পারেননি।

শেষের কবিতার পটভূমিকার পরিকল্পনার লাবান পল্লীর এবং লাইমোখরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আভাস পাওয়া যায়। "শিলঙের" চিঠির মধ্যে শিলঙের চতুষ্পার্শের দৃশ্যাবলী, ওয়ার্ডস্ লেকের ফুলের কেয়ারী এবং 'জিতভূমে'র আশেপাশের বনানীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য যেন কবিগুরুর অনিন্দ্য ভাষায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

আপল্যাণ্ডস্ বাংলোতে সব সময় দেখেছি বিদেশী, প্রবাসী ও চেনা-অচেনার ভিড়ে বাংলোখানি পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। একদিন গুরুদেবকে বলতে শুনেছি, সুন্দর এই শিলঙ পাহাড়, এমন অপরূপ সৌন্দর্য্য চোখে খুব কমই পড়েছে।

শিলঙে কবি আত্মগোপন করেই থাকবার চেষ্টাই করতেন। সামাজিক অনুষ্ঠান বা সভাসমিতিতে বড় একটা যোগ দেন নি। তার শিলঙ অবস্থানের দিনগুলো ঘটনাবহুল নয়।

শিলং পাহাড়ের অনুপম সৌন্দর্য্য, শৈলশিখরে মেঘের খেলা, পাহাড়ের কোলে আলোছায়ার লুকোচুরি, তার কবিচিত্তকে মুগ্ধ করেছিল। বহুকাল পরেও তাঁর মানসপট থেকে শিলঙের স্মৃতি মুছে যায় নি। শেষবার তাঁর সঙ্গে যখন কয়েক মিনিটের জন্য মাত্র দেখা হয়েছিল, তখন তিনি শিলঙ সম্বন্ধে দু'চারটে কথা বলেছিলেন। শিলঙের পাইন বনানী মণ্ডিত পাহাড় যে কবির কল্পনাকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। তারই ফল কবির অনবদ্য সৃষ্টি 'শেষের কবিতা'।

"জন্মদিনে নাম বইলো লেখা,
মৃত্যুপটে রবে কি তার রেখা ?"[১]

১৯৩২। শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের খাতায় লিখিত। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে লেখাটি ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নি। শ্রীযুক্ত অরুণকুমার চন্দ মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অক্সফোর্ডে রবীন্দ্রনাথ

যোগেন্দ্রকুমার চৌধুরী

ফরাসী বিপ্লবের যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া ইংরেজ-কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ (Wordsworth) সোৎসাহে লিখিয়াছিলেন—

> Bliss was it in that dawn to be alive,
> But to be young was very heaven !

আমরা যারা পৃথিবীর এই যুগসন্ধিক্ষণে জন্ম নিয়াছি, আমরাও অনায়াসেই ইংরেজ কবির কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারি এইযুগে বাঁচিয়া আছি ইহাই পরম সৌভাগ্য, তার উপর, যুবক হওয়া—সে ত হাতে স্বর্গ লাভ।' বিশেষতঃ আমরা যারা বাঙালী, আমরা এখন একজন যুগ প্রবর্ত্তকের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছি, যাঁর নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া থাকিবে।

রবীন্দ্রনাথের এই সান্নিধ্য লাভ আমার ভাগ্যেও দুই একবার ঘটিয়াছে, যদিও ক্ষণিকের জন্য। তাঁহার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের গৌরব আমি করিতে পারি না, তবুও তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছি—এ-ই বা কম কি ?

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'হিবার্ট লেক্চার' (Hibbert Lectures) দিবার জন্য ১৯২৮ সালেই রবীন্দ্রনাথ বিলাত রওয়ানা হইয়াছিলেন, কিন্তু মাদ্রাজ গিয়াই অসুস্থ হইয়া পড়ায় সেবার যাওয়া হইল না। অবশেষে ১৯৩০ সালের মার্চ্চ মাসে একাদশ বারের জন্য তিনি ইউরোপ যাত্রা করিলেন। অক্সফোর্ডে ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা তখন জন-পঞ্চাশের বেশী হইবে না। রবীন্দ্রনাথ আসিবেন, জানিবার পর হইতেই আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

এদিকে ভারতবর্ষে তখন সব প্রলয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিতেছে। গান্ধীজির ১২ই মার্চ্চের দণ্ডীযাত্রা, শোলাপুরে সামরিক আইন জারী, চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, পেশোয়ারে নিরস্ত্র পাঠান সত্যাগ্রহীদের উপর গুলি চালনা ইত্যাদি ঘটনাবলী। বিলাতের কাগজগুলিতে ফলাও করিয়া ছাপা হইতেছে— অবশ্য ভারতীয় খবর সচরাচর যেভাবে বিলাতে ছাপা হয় সে-ভাবেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমার ইউরোপের ডায়েরীতে দেখিতেছি— শ্রীহট্ট সহরের ৭ই মে'র ঘটনা পর্য্যন্ত বিলাতে পৌছিল নিম্নলিখিত আকারে—'সত্যাগ্রহীরা ('the mob') পুলিশের সঙ্গে হাঙ্গামা বাঁধাইবার জন্য আগে হইতেই প্রস্তুত হইয়া ডাক্তার ও 'এম্বুলেন্স' (ambulance) গাড়ী সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল।' ভারতবর্ষের এই রকম গরম অবস্থার জন্য অনেক ইংরেজই তখন তাহাদের স্বাভাবিক ঔদাসীন্য ছাড়িয়া খবর জানিতে প্রস্তুত। সময়ে রবীন্দ্র নাথের মত একজন ভারতবাসীর সেই দেশে উপস্থিতি আমাদের পক্ষে কতবড় ঘটনা, তাহা প্রবাসী না হইলে উপলব্ধি করা শক্ত।

অবশেষে সেই দিনটী আসিল। ১৭ই মে রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ড পৌছিলেন এবং ১৯মে বিকালে চার টার সময় ম্যান্চেষ্টার কলেজে তাঁর বক্তৃতার খবর পাইলাম। উৎসাহের আতিশয্যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগেই অবশ্য গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, শ্রোতাদের মধ্যে ছাত্র, অধ্যাপক ইত্যাদি বহুরকমের ইংরেজও

আছেন— ভারতীয়ও কতজন। ঘড়িতে ঢেংনি ঠং করিয়া ঘটা বাজিল, অমনি মঞ্চের পিছনকার পরদার অন্তরাল হইতে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে কলেজের অধ্যক্ষ জ্যাক্‌স (L P Jacks) সাহেব। রবীন্দ্রনাথের এই ধরণের প্রবেশও দেখিবার মত বটে, তার আগে কলিকাতায় 'এম্পায়ার' থিয়েটারেও এক বক্তৃতায় এমনি ভাবেই তাঁকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলাম, মনে পড়িল।

বক্তৃতার বিষয় নিয়া আমার কিছু লিখিবার নাই। এই বক্তৃতাই শেষে পরিবর্দ্ধিত আকারে Religion of man নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক ছাপা হইয়াছে। কিন্তু যখন সেখানে বসিয়া বসিয়া রবীন্দ্রনাথের মুখে ঐ বক্তৃতা শুনিতেছিলাম তখন আমার মনে যে ভাব হইয়াছিল, তাহা মোটেই পাণ্ডিত্য-প্রাচিতার নয়। আমি ভাবিতেছিলাম রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ, সুঠাম, সৌম্যমূর্ত্তির কথা, আমি ভাবিতেছিলাম, তাঁহার সুমধুর কণ্ঠস্বর, বিশুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণ ও হৃদয়গ্রাহী বলিবার ভঙ্গীর কথা, আমি ভাবিতেছিলাম রবীন্দ্রনাথের তপ্ত-কাঞ্চন গাত্রবর্ণের কথা আর তাহারি পাশাপাশি বসা ইংরেজদের সঙ্গে তুলনায় সেই বর্ণ কি রকম দেখায়। আর মনে মনে প্রায় বালক-সুলভ অহমিকার সহিত বলিতেছিলাম—'যে দেশের ছেলেপিলেরা পর্য্যন্ত রাস্তায় আমাদেরে দেখলে 'blackie' 'blackie' বলিয়া চেঁচায়, দেখে নিক্ একবার সেই দেশের লোকেরা এমন একজন ভারতবাসীকে যিনি 'whiteness'এ তাদের চেয়ে এক পোঁছও কম যান না। আর চেহারা সমগ্র ইংল্যাণ্ড খুঁজলেও এমন কয়জন লোক মিলবে?" চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, সকলেই মুগ্ধ। আর বক্তৃতার শেষে যখন বিস্ময়মিশ্রিত ঔৎসুক্যবশতঃ সাহেবরা সব রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে নানা খবর জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ভারতীয় দেখিয়া আমাদের দিকেই অগ্রসর হইল, তখন দস্তুরমত বুক ফুলাইয়া কিঞ্চিৎ কৃপা-মিশ্রিত সুরে তাহাদের সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলাম।

সেখানে রবীন্দ্রনাথের তিনদিন বক্তৃতা হয় – ১৯শে, ২১শে, ও ২৬শে মে। ২৫শে মে সন্ধ্যাবেলা সেখানকার ভারতীয় ছাত্রদের সম্মেলন 'মজলিস্' এ (Oxford majlis) রবীন্দ্রনাথের [illegible] বার ব্যবস্থা হয়। এই সভায়ও অনেক ইংরেজ উপস্থিত ছিলেন। এবং যদিও সমস্ত বিবরণ [illegible] মনে করিতে পারিতেছি না, তবুও এইটুকু স্পষ্ট মনে আছে যে, অভ্যর্থনা করিতে গিয়া জনৈক অবাঙ্গালী ছাত্র রবীন্দ্রনাথকে তখনকার উদ্বেলিত ভারতীয় রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিতে আহ্বান করায় কবিগুরু যেন কতকটা অসন্তুষ্ট হইয়াই জবাব দিয়াছিলেন—'I am a poet and nothing else than a poet' পরবর্তী যুগে অবশ্য আমরা তাঁহার মধ্যে এই ভাবেরও পরিবর্ত্তন দেখিয়াছি। কিন্তু সে অন্য কথা।

সেই সভায় কিঞ্চিৎ জলযোগ ইত্যাদিরও ব্যবস্থা ছিল। তখন সভার আড়ষ্টতা ছাড়িয়া দিয়া আমরা সকলে অনুরোধ করিলাম রবিবরকে তাঁরই একটী কবিতা আবৃত্তি করিয়া আমাদিগকে শুনাইতে হইবে। মনে আছে, মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিয়াছিলাম তাঁর আবৃত্তি—"ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর এখনই অন্ধ বন্ধ করো না পাখা।" তারপর আবহাওয়া যখন অনেকটা ঘরোয়া হইয়া উঠিল, তখন দুইচারিটী কথাবার্ত্তার পর সাহসে ভর করিয়া একখানা অতি সাধারণ নোটপেপার ও কলমটা আগাইয়া দিয়া বলিলাম নামটা লিখে দেবেন?" —'এখানেও অটোগ্রাফ দিতে হবে?' বলিয়া তিনি অতি পরিষ্কার হাতে নিজের নাম লিখিয়া দিলেন।

আমাদের সভায় যদিও রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ রাজনীতি সম্পর্কে নিজেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, তথাপি এই কথা মনে করিলে ভুল করা হইবে যে, বিলাতে তিনি কেবল তাঁর বক্তৃতা

নিয়াই ব্যস্ত ছিলেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আলোড়ন তাঁহার মনে কিরূপ গভীর রেখাপাত করিতেছিল তার প্রমাণ আমরা পাইলাম সেই বাত্রেই তার ২৪শে মে তারিখের লেখা একখানা ইস্তাহার হইতে। এর আগে (এবং পরেও) তিনি কোন কোন পত্রিকায় ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে বিবৃতি দিয়াছিলেন। ওই বাত্রে যে ইস্তাহার পাইলাম তার নাম— The Indian Situation— A message from Rabindranath Tagore (Published by Friends Service Council, Friends House, Euston Road, London) এই ইস্তাহারে তিনি ভারতের শাসন-যন্ত্র কি রকম মানবতাহীন যান্ত্রিক ভাবেই চালিত হইতেছে, এবং এর প্রতিরোধ করিতে গিয়া মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ ভারতবাসিগণ কি ভাবে নির্য্যাতিত হইতেছেন, কি করিয়া স্বাধিকারপ্রমত্ত শাসকসম্প্রদায় সমস্ত নীতিজ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়া 'ধর্ম্মের' পরিবর্ত্তে বিজ্ঞান-প্রসূত 'শক্তি'কেই সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছেন, এবং এর ফলে মানুষের উপর আস্থার অভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের আদর্শে কিরূপে বিঘ্ন ঘটিতেছে— এই কথাটী বিশ্ব-কবি পাশ্চাত্যের যন্ত্রমোহ-মুক্ত ব্যক্তিদের (individuals) নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"In the life of these individuals will be wedded East and West, their lamps of sacrifice will burn through the stormy night along the great pilgrim tract of the future, when the names of the statesmen who tighten their noose round the necks of the foreign races will be derided, and the triumphal tower of skulls heaped up in memory of war-lords will have crumbled into dust."

মৃণালকান্তি দাশের
কবিতার বই

আকাশ

বিভিন্ন সাময়িক পত্রের অভিমত ঃ—

'আকাশ' কবিতার বই। অনেকগুলি কবিতার সমষ্টি। প্রত্যেকটি কবিতাতেই কবির বলিষ্ঠ মনের ছন্দোবদ্ধ চিন্তার পরিচয় সুস্পষ্ট, উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগের অসম্বদ্ধ অভিব্যক্তি একটি কবিতাতেও নাই। কয়েকটি কবিতা, বিশেষতঃ কয়েকটি সনেট আমাদের খুবই ভাল লাগিয়াছে। ভাব, ভাষা ও ছন্দ কোথাও হোঁচট খায় নাই। সহজ সরল সাবলীল ভঙ্গিতে পাঠকের মনকে রসোপলব্ধির দিকে টানিয়া লইয়া যায়। বইখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই প্রভৃতি ভাল হইয়াছে। প্রচ্ছদপটটি মনোজ্ঞ।

(ভারত, ১লা অগ্রহায়ণ)

' ' - "আকাশের" কবি মৃণালকান্তি দাশ নবতম সৌন্দর্যের ফসল বহন করে এসেছেন। তাঁর কিছু দেবার স্পর্দ্ধা আছে যা একেবারে অবহেলা কোরে পাশ কাটিয়ে যাওয়া চলেনা। তার রূপদী সাধনা আধুনিক কবিতার বিবর্তনে নিঃসন্দেহে আপন শক্তিতে শক্তিশালী। এতো সব এবতারা বাজিয়েদের ভীড়ে 'আকাশের' সুর কবিতারসিকদেরকে আনন্দ দিতে পারবে বোলে আমরাও সুখী হতে পারি।

- ' সুদূর মফঃস্বলে থেকেও মৃণালকান্তি যে দৃষ্টিভঙ্গী অবিকৃত রাখতে পেরেছেন তাতে বহু কবি যশ প্রার্থী বিদেশী কাব্যানুকারকদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার কথা। প্রতিটি কবিতায় তাঁর কবি-মনের-পরিচয় মিলে। ' *

কবির অনুভূতির তীব্রতা ও সংবেদনের সুন্দর অভিব্যক্তি, যা মৃণালকান্তি জানাতে চেয়েছেন, 'আকাশে'র প্রতিটি কবিতাকে নিবিড় কোরে তুলেছে। 'আকাশ' ভঙ্গুর ভাবাবেগে বিশীর্যমান নয়। এর সংযত লিপি-কুশলতা কবির ভবিষ্যতকে প্রশস্ততর কোরে তুলেছে। * '

(নিরুক্ত, আশ্বিন)

The author of this book is no new entrant in the domain of Bengal poetry His poems have appeared in well konwn periodicals and have won appreciation too The poet evidently is no 'escapist'—he is emotionally quite alive to the ugly realities of the present life What is peculiar in him is that unlike most of the modern poets,he has not been overcome by despair Rather a bright hopefulness his cheered up his whole attitude towards life Like Shelley he Seems to believe

If winter comes,
Can spring be far behind ?

The author appears to be endowed with a rich poetic talent * With these words, we recommend this book to the lovers of Bengali poetry *The print, getup, and particularly the frontispiece of the book are quite attractive*

5th Oct, 41 (*Hindusthan Standard*)

মৃণালকান্তির 'আকাশ' পড়ে আমরা খুসী হয়েছি। কারণ এরও মধ্যে আছে রোমাণ্টিক স্নিগ্ধতা এবং কল্পলোকের স্পর্শ। চাঁদ এখনো বিস্ময় ছড়াতে পারে, কলের ধোঁয়া এবং ইট কাঠের অট্টহাসি এখনো মনের

পিপাসাকে মেরে ফেলতে পারে নাই। কবি এখনও চাঁদের দিকে চেয়ে কামনা করেন, 'ঝরে যাক্ কবিতার মতো কিছু জল"। মাটীর আসক্তি এ যুগের মডার্ণ কাব্যের বাঁধাধরা মানদণ্ড। এই অত্যাধুনিকতার যুগে "কোথা সরে চলে যাব দূরে রেখে এ মাটীর সীমা' বলে আকাশের স্বপ্ন দেখছেন যে কবি, তার কাব্যে কল্পনারও বলিষ্ঠতা আছে। এই কবির কাব্যভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল। মেকি চমক নেই, পালিস করা চোস্ত বুলি নাই। সংযত ভাষায় তাজা, প্রশান্ত কবিতাগুলি সরসতায় ও মাধুর্যে মনোরম। "শ্যামল শস্যের শীষে ঝরায়েছে ফসলের গান", "অন্ধকারে ভবিষ্যৎ ভ্রূণ হয়ে কাঁদে'—ইত্যাদি ছত্রের অনবদ্য ইঙ্গিত ছবি আঁকবার ক্ষমতাকে সূচিত করেছে।

(জয়শ্রী অগ্রহায়ণ)

বাংলা নাটক যাঁরা ভালোবাসেন, বাংলার মুহ্যমান মঞ্চ এবং অভিনয়-শিল্পের পুনরুজ্জীবন যাঁরা আন্তরিক ভাবে কামনা করেন, 'বাণীচক্রে'র

নাট্য-শ্রী

(NATIONAL THEATRE)

'জাতীয় বঙ্গমঞ্চ' প্রতিষ্ঠাব নির্ভীক পরিকল্পনা তাঁ'দের ঐকান্তিক সহানুভূতি ও সাহায্যের দাবি বাখে।

* * *

'নাট্য-শ্রী'র

উদ্বোধন উপলক্ষে

অভিনয-পবিকল্পনা

বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তীর

সামাজিক নাটক

বিক্ষোভ

*

মৃণালকান্তি দাশের

গীতি-নাটিকা

মণিকুন্তলার স্বপ্ন

প্রযোজনা

নব-নাট্য-চক্র

পবিচালনা

'নব-নাট্য-চক্রে'র সম্পাদক

মন্মথকুমার চৌধুরী